সানন্দা
১৫ অক্টোবর ২০২২



রান্নাঘর
দীপাবলির আঞ্চলিক মিষ্টি

বিশেষ রচনা
নোবেলজয়ী লেখক
আনি এরনো

পার্শ্ব রচনা
সেপারেশন অ্যাংজ়াইটি থেকে
মুক্তির উপায়
ভিটামিন-ডি-র প্রয়োজনীয়তা

ফ্যাশন
সাজে আলোর রোশনাই
ভাইফোঁটা স্পেশ্যাল
শাড়িতে ঔজ্জ্বল্য

মুখোমুখি
অমোল পালেকর

সানন্দা প্রচ্ছদকাহিনি

# ভাল থাকার Creative পাসওয়ার্ড

সুস্থ জীবনের উদ্দেশ্য হল শরীরে ও মনে ভাল থাকা। ক্রিয়েটিভিটি ও পারফর্মিং আর্টস কীভাবে ভাল থাকতে সাহায্য করে, বিশদে জানাল সানন্দা। সঙ্গে রইল বিশেষজ্ঞ ও মনোবিদের পরামর্শ।

# সূচিপত্র

৩৭ বর্ষ ৫ সংখ্যা। ১৫ অক্টোবর ২০২২। ২৮ আশ্বিন ১৪২৯



৪

প্রচ্ছদকাহিনি ১

**ক্রিয়েটিভ থেরাপির গোড়ার কথা**

ক্রিয়েটিভ থেরাপি কী? কিভাবেই বা রোগমুক্তি ঘটে এই প্রসেসে? আর্ট থেকে ডান্স, সিনেমা থেকে থিয়েটার... মন ভাল রাখতে সৃজনশীল নানা থেরাপির পরামর্শে বিশেষজ্ঞরা। ভাল থাকার নতুন দিক এবার সানন্দার পাতায়।



৩৪

সৌন্দর্য

**বাড়িতেই স্পা-চর্চা**

পুজোর মরসুম হোক বা আগত দীপাবলির সাজ, নিজেকে দেখানো চাই সকলের থেকে আলাদা। স্পায়ের জন্য আর পার্লার নয়, বাড়িতেই শুরু হোক রূপচর্চার প্রথম ধাপ। রইল ঘরোয়া উপায়ে স্পা-চর্চার সুলুকসন্ধান...



৭৪

রান্নাঘর

**দীপাবলির মিষ্টিমুখ**

শারদীয়া শেষ, আসছে দীপাবলি। ভারতের বিভিন্ন জায়গায় দীপাবলি উপলক্ষে তৈরি হয়ে থাকে আঞ্চলিক ট্র্যাডিশনাল মিষ্টি। তেমনই কয়েকটি মিষ্টির সন্ধান ও তার প্রস্তুতিপর্ব।




**প্রচ্ছদ:** জুহি
**মেক-আপ:** কাজু গুহ,
**ফোন:** ৮০১৭৯৪২৬৫১
**হেয়ার:** নাজ় হোসেন
**স্টাইলিং:** বম্বে বাই আয়েশা
**ফোন:** ৮৩৩৫৯৬৫৯৬৮
**সহযোগী:** অঙ্গনা সামন্ত
**পোশাক:** সাস্যা,
**ফোন:** ২২৮৯২৩২৩
**জুয়েলরি:** হর্ষিতা সুলতানিয়া জুয়েলরি
**ফোন:** ৮৩৩৫০৭৮১৮৩
**শুটিং লোকেশন:** এফিনগাট ব্রিউ পাব
২৪ পার্ক স্ট্রিট, সিলিকা পার্ক, লেভেল ৭
**ফোন:** ০৭৬২০০৩৮৮৮৮
**ছবি:** সোমনাথ রায়

**সম্পাদক:** পায়েল সেনগুপ্ত

এবিপি প্রা: লিমিটেডের পক্ষে প্রদীপ্ত বিশ্বাস কর্তৃক ৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত
এবং আনন্দ অফসেট প্রা: লিমিটেড, সিপি-৪, সেক্টর V, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০ ০৯১ থেকে মুদ্রিত।

RNI NO. 44046/86

15th October 2022, 37 years 5 Issue.




## নেপথ্যের দশভুজা

'সানন্দা'-র এই সংখ্যায় 'নেপথ্যের দশভুজা' শীর্ষক লেখাটি ভাল লাগল। পুজোর আনন্দের স্বাদ আমরা তো চেটেপুটে নিই। কিন্তু যাঁরা আড়ালে থেকে আমাদের আনন্দকে নির্ঝঞ্ঝাট করে তোলেন, সেই 'অন্য দুর্গা'দের কথা খুবই সুন্দর করে ফুটে উঠেছে সানন্দার পাতায়। সাব ইন্সপেক্টর থেকে স্ট্রিট ভেন্ডার কিংবা পেট্রল পাম্প কর্মী থেকে সমাজকর্মী, অথবা ধরা যাক, মেট্রো কর্মী থেকে অ্যাপ ক্যাব ড্রাইভার— সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে আমাদের পুজো কেটে যায় মসৃণতায়। কিন্তু তারা বাদ পড়ে যান উৎসবের আনন্দ আলো রোশনাই থেকে। তাদের নিরন্তর পরিশ্রমের কাহিনি তুলে ধরার জন্য তাদের তো বটেই, তার সঙ্গে 'সানন্দা'কেও জানাই কুর্নিশ।

কোয়েল সিংহ, দমদম
*ই-মেল মারফত*

## নানা স্বাদের গল্প

'সানন্দা' পত্রিকার এবারের সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে নানা স্বাদের চারটি গল্প। প্রত্যেকটি গল্পই তাদের নিজ নিজ পরিসরে বেশ মনোগ্রাহী। বিশেষ করে আমি বলতে চাই দুটি গল্পের কথা। একটি, পত্রলেখা নাথের 'অন্তরাগের ওপারে' এবং আর-একটি ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়ের 'লাইকাস লিপস্টিক'। অন্য দুটিও ভাল। পুজোর মরসুমে এইরকম চার-চারটি গল্প একবারে হাতে পেয়ে সত্যিই ভাল লেগেছে। গল্পগুলির সঙ্গে মানানসই অলংকরণগুলিও বেশ ভাল লেগেছে।

বৈশালী চট্টোপাধ্যায়, বাগুইহাটি
*ই-মেল মারফত*

## রান্নাবান্না

'সানন্দা' মানেই নতুন নতুন রেসিপির হদিশ। এবারের সংখ্যায় যেমন ছিল হিমাচলের রান্না। 'হিমাচলের খানা-খজ়ানা' পড়ে জানতে পারলাম হিমাচলি খাবারকে বলা হয় পঞ্জাবি ও তিব্বতি রান্নার 'ব্লেন্ড'। সব রান্নাতেই কমবেশি আটা বিভিন্ন ধরনের ডাল, সবজি, ঘি, মশলা ব্যবহৃত হয়। বেশ পছন্দ হয়েছে পাহাড়ি চিকেন, চাম্বা স্টাইল ফ্রায়েড ফিশ, চানা মাদরা, গহত কি শোরবা ইত্যাদি রেসিপিগুলি। স্বল্প উপকরণে ও সহজ পদ্ধতিতে পাহাড়ি রান্নার এমন স্বাদ সত্যিই এতদিন অজানা ছিল।

অয়ন্তিকা দে, যাদবপুর
*ই-মেল মারফত*

### গল্প-উপন্যাস-ভ্রমণ

সানন্দা-য় গল্প এবং উপন্যাস মনোনয়নের জন্য পাঠাতে চাইলে হাতে লিখে কিংবা প্রিন্টআউট করে আমাদের দফতরে পাঠাতে হবে। ইমেলে পাঠানো গল্প সানন্দা-র প্রিন্ট সংস্করণের জন্য গ্রাহ্য করা হবে না। অবশ্যই নিজের নাম, ঠিকানা এবং ফোন নম্বর যেন লেখা থাকে। গল্প বা উপন্যাস মনোনীত হলে আমরা ওয়ার্ড ফাইলটি চেয়ে নেব। গল্পের শব্দসংখ্যা ২৫০০ থেকে ৩০০০।

**ঠিকানা:**
সানন্দা গল্প বিভাগ,
এবিপি প্রাইভেট লিমিটেড,
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা ৭০০ ০০১

যাঁরা সানন্দা-র ওয়েবসাইটের জন্য গল্প পাঠাবেন, তাঁরা ১৫০০ শব্দের মধ্যে গল্প মেল করবেন, হার্ড কপি পাঠাবেন না। মেল-এর সাবজেক্টে অবশ্যই লিখবেন 'সানন্দা ওয়েব গল্প'। ভ্রমণকাহিনির ক্ষেত্রে ইউনিকোডে টাইপ করে আমাদের ইমেল করতে হবে। ছবি ভাল রেজ়লিউশনের হওয়া বাঞ্ছনীয়। এক্ষেত্রে হাতে লিখে পাঠানো ভ্রমণকাহিনি গ্রাহ্য হবে না। প্রিন্টেড ছবি পাঠাবেন না। ডিজিট্যাল ছবি পাঠাতে হবে। অন্য বিভাগে লেখা পাঠাতে হলে মেল-এ সাবজেক্ট অবশ্যই উল্লেখ করে দেবেন।

**মেল আইডি:**
sananda@abp.in

# সু দো কু

## ১৫০

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৭ | | ৩ | ৬ | | | | | |
| | ২ | | | ৭ | | | | ৮ |
| | ৮ | | ৯ | ৫ | ২ | | | ৩ |
| | ৫ | ৯ | ১ | | ৪ | | | |
| | | ৮ | ২ | | | ১ | | |
| | | | | | ৫ | ৪ | ২ | |
| ৭ | | | ২ | ৪ | ১ | | ৮ | |
| ৮ | | | | ৩ | | | ৭ | |
| | | | | | ৭ | ২ | | ১ |

উপরের ছকগুলিতে মোট ৯টি ঘর রয়েছে। প্রতিটি ঘরে ছোট ছোট বর্গক্ষেত্রে ১ থেকে ৯-এর মধ্যে কয়েকটি সংখ্যা বসানো আছে। ফাঁকা ঘরগুলিতে হিসেব করে বাকি সংখ্যাগুলো বসাতে হবে। এমনভাবে বসাতে হবে, যাতে উপরে-নীচে বা পাশাপাশি লাইনে ১ থেকে ৯-এর মধ্যে কোনও সংখ্যা দু'বার না বসে।

**সমাধান আগামী সংখ্যায়**

*৩০ সেপ্টেম্বর সংখ্যার সমাধান*

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৫ | ৪ | ৩ | ৬ | ১ | ৮ | ৭ | ৯ | ২ |
| ৯ | ২ | ৬ | ৪ | ৭ | ৩ | ৫ | ১ | ৮ |
| ১ | ৮ | ৭ | ৯ | ৫ | ২ | ৬ | ৪ | ৩ |
| ২ | ৫ | ৯ | ১ | ৬ | ৪ | ৮ | ৩ | ৭ |
| ৪ | ৩ | ৮ | ৭ | ২ | ৯ | ১ | ৬ | ৫ |
| ৬ | ৭ | ১ | ৩ | ৮ | ৫ | ৪ | ২ | ৯ |
| ৭ | ৯ | ৫ | ২ | ৪ | ১ | ৩ | ৮ | ৬ |
| ৮ | ১ | ২ | ৫ | ৩ | ৬ | ৯ | ৭ | ৪ |
| ৩ | ৬ | ৪ | ৮ | ৯ | ৭ | ২ | ৫ | ১ |



ক্রিয়েটিভ থেরাপি ও ভাল থাকা

# ক্রিয়েটিভ থেরাপির গোড়ার কথা

ক্রিয়েটিভ থেরাপি কাকে বলে? নিজের হবি বা সৃজনশীল কোনও বিষয়কে কাজে লাগিয়ে কীভাবে মন ভাল রাখা যায়? আলোচনায় কনসালট্যান্ট সায়কায়াট্রিস্ট ডা. পার্থসারথি বিশ্বাস। লিখছেন মধুরিমা সিংহ রায়।

মন খারাপ হলে গান শোনো বা বই পড়ো...এমন অনেক পরামর্শই অনেকে দিয়ে থাকেন। শুধু মন খারাপ হলে নয়, সারাদিনের ধকলের পর একটু রিল্যাক্স করতেও নিজের পছন্দমতো কাজ বেছে নেওয়া জরুরি। 'মি টাইম'-এর সঙ্গে জড়িয়ে যায় নিজের পছন্দের কোনও সৃজনশীল কাজ। কাজের ব্যস্ততায় হয়তো পিছনের সারিতে চলে গিয়েছে ছোটবেলার কোনও প্রিয় হবি। নাচ, গান, ছবি আঁকা, পটারি, রান্না করা...যা কিছু হতে পারে। একটু সময় বের করে সেগুলোকে ঘষামাজা করলেই স্ট্রেস কমতে পারে অনেকগুণ! আর এ ধরনের সৃজনশীল বিষয়গুলোকে কাজে লাগিয়ে মনোবিদরা নানা ধরনের মানসিক সমস্যা নিরাময়ের চেষ্টা করে চলেছেন প্রতিনিয়ত। ডান্স থেরাপি, আর্ট থেরাপি, ড্রামা থেরাপি, মিউজ়িক থেরাপি, ফিল্ম থেরাপির মতো একগুচ্ছ সৃজনশীল কাজকে কাজে লাগানোর পোশাকি নামই হল ক্রিয়েটিভ থেরাপি।

## ক্রিয়েটিভ থেরাপি কী ও কেন?

সৃজনশীলতার সঙ্গে মনের ভাল থাকার নিবিড় যোগাযোগ আছে।




কোনও সৃজনশীল কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকলে পজ়িটিভ ইমোশন বাড়ে। রোজকার স্ট্রেস ফ্যাক্টর কমে, উৎকণ্ঠা বা অ্যাংজ়াইটি কমে। এমনকী ক্রিয়েটিভ কাজ ইমিউনিটিও বাড়িয়ে তোলে। কারণ, আমাদের শরীরের ইমিউনিটি সিস্টেমের সঙ্গে নিউরোলজিক্যাল সিস্টেমের যোগ রয়েছে। তাই, স্নায়ুতন্ত্রের উপর পজ়িটিভ প্রভাব পড়লে ইমিউনিটিও শক্তিশালী হয়। এবার বিষয় হল, সৃজনশীল কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকা আর সৃজনশীলতাকে থেরাপি হিসেবে ব্যবহার করার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কোনও শারীরিক বা মানসিক সমস্যার উপশমে সৃজনশীলতাকে থেরাপি হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। সাধারণভাবে, দৈনন্দিন স্ট্রেস কমানোর জন্য কেউ সেলাই করেন, কেউ ছবি আঁকেন, কেউ আবার গান করেন। এভাবেও থেরাপিউটিক এফেক্ট পাওয়া সম্ভব। চিকিৎসাশাস্ত্রে এগুলোকেই কাজে লাগানো হয়। যেমন, এমন অনেক মানসিক সমস্যা (স্কিজ়োফ্রেনিয়া বা অন্যান্য সিভিয়ার মেন্টাল ইলনেস) শুধুমাত্র ওষুধে উপশম হয় না। সে ক্ষেত্রে ওষুধের পাশাপাশি কোনও ক্রিয়েটিভ থেরাপিকে কাজে লাগানো হয়। সৃজনশীল কাজ মস্তিষ্কে পরিবর্তন আনে। ধরুন, আপনি ছবি আঁকতে ভালবাসেন। হয় তো আপনার পেশা অন্য। কিন্তু ভালবেসে আঁকতে গেলে আপনি সেই কাজে পুরো মনঃসংযোগ দেবেন। মস্তিষ্কের ফ্রন্টাল লোব সাইলেন্ট হয়ে যায়, কোনও ক্রিয়েটিভ কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখলে। মেডিটেশন বা মনোযোগ বাড়ানোর কোনও এক্সারসাইজ় করার সময়ে মস্তিষ্কে যে কেমিক্যাল ফ্লো হয়, সৃজনশীল কাজের ক্ষেত্রেও তা-ই হয়। ফ্রন্টাল লোবে কেমিক্যাল রিলিজ় হয়, যা আমাদের ফিজ়িক্যাল থিঙ্কিং বাড়ায়। মূলত তিনধরনের হ্যাপি কেমিক্যাল আছে: ডোপামিন, সেরোটোনিন ও এন্ডরফিন। ক্রিয়েটিভ কাজে মনোযোগ দেওয়ার সময়ে এই তিনটি কেমিক্যাল রিলিজ় করে মস্তিষ্ক। খুব স্ট্রেসফুল দিনের শেষে ছবি আঁকলেন বা কোনও ইনস্ট্রুমেন্ট বাজালেন, তখন মস্তিষ্ক রিল্যাক্সড হয়। এগুলোকেই মনোবিদেরা থেরাপিতে ব্যবহার করেন। থেরাপির ক্ষেত্রে ওই নির্দিষ্ট অ্যাকটিভিটি নিয়মিত, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য করতে বলা হয়। কারওর প্রয়োজন অনুযায়ী, থেরাপিস্ট কোনও একটি ক্রিয়েটিভ অ্যাকটিভিটির পরামর্শ দেন। হয়তো, তাঁকে নির্দিষ্ট কিছু গান শুনতে বলা হল। বা ডান্স থেরাপির ক্ষেত্রে হয়তো শরীরের মুভমেন্ট বাড়ানোই লক্ষ্য। শারীরিক জড়তা কাটানো হয়। অর্থাৎ, থেরাপির ক্ষেত্রে পুরো জিনিসটাই স্ট্রাকচারড। আর সবকিছুই একজন ট্রেনারের তত্ত্বাবধানে হয়। এমন অনেক উদাহরণ আছে, যেখানে ওষুধের ডোজ় একই রেখে পেশেন্টকে কোনও ক্রিয়েটিভ থেরাপির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। চার-ছ'সপ্তাহ পরে সেই পেশেন্টের উন্নতি হলে বোঝা যায় যে অনেকটা কৃতিত্বই ক্রিয়েটিভ থেরাপির। কিছু দিন পরে অনেকের ওষুধের ডোজ়ও কমিয়ে দেওয়া হতে পারে।

## ক্রিয়েটিভিটি মানুষদেরও ডিপ্রেশন হয়

ক্রিয়েটিভ কোনও কাজ মনে তৃপ্তি আনে, মস্তিষ্কের হ্যাপি হরমোন নিঃসৃত হয়...একথা স্বীকৃত। কিন্তু যাঁরা ক্রিয়েটিভ কাজের সঙ্গে যুক্ত তাঁরাও তো ডিপ্রেশনে ভোগেন! তাঁদেরও দৈনন্দিন স্ট্রেস, টেনশন হয়। এমন অনেক লেখক, অভিনেতা, পরিচালক আছেন যাঁরা মানসিক অবসাদে ভুগেছেন। এর একটি দিক হল, সৃজনশীলতাকে ভালবেসে উপভোগ করা আর পেশাগত চাপ এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। ক্রিয়েটিভ কাজই যখন পেশা হয়ে দাঁড়ায়, তখন তার কিছু পেশাগত বিড়ম্বনাও থাকে। আবার এই মানুষগুলো সাধারণত অনেক বেশি পারফেকশনিস্ট হন। এটিও অতৃপ্তির একটি দিক। রাইটারস ব্লক-এর অন্যতম কারণও এটি। পেশাগত দিকের বাইরে বেরিয়ে নিজের পছন্দমতো কোনও অ্যাকটিভিটি করা প্রয়োজন। এ জন্য হবি ডেভেলপ করার পরামর্শ দেওয়া হয় প্রত্যেককেই। কাজের চাপে নিজের হবিকে সময় দিতে ভুলে গেলে মুশকিল। কিছু না হলে, কাজের চাপের ফাঁকে ঘুরে আসুন। সেখানকার ছবি তুলুন। সেখানকার স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে কথা বলুন। এটিও স্ট্রেস কমানোর একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। আর হ্যাঁ, একাকিত্ব দূর করা প্রয়োজন। কেউ হয় তো সারাদিন একা একা কাজের মধ্যে ডুবে আছেন। তাঁর জীবনে মাঝেমধ্যে মন খারাপ আসতে পারে। কমিউনিকেট করা জরুরি। সাধারণ মানুষদের ক্ষেত্রে, যাঁদের ক্রিয়েটিভ থেরাপির পরামর্শ দেওয়া হয়, তাঁদের অনেকেরই গ্রুপ সেশন করানো হয়। এ ক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন, ক্রিয়েটিভ কাজের সংজ্ঞার্থও ব্যাপক। তথাকথিত সৃজনশীল কাজের বাইরেও প্রায় সব কাজের মধ্যেই কিছু না কিছু ক্রিয়েটিভ দিক জড়িয়ে আছে। মন ভাল রাখার জন্য আপনি কোন কাজটিকে বেছে নেবেন, তা আপনার উপরেই নির্ভর করছে।

> সৃজনশীল কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকলে পজ়িটিভ ইমোশন বাড়ে। স্ট্রেস কমে, উৎকণ্ঠা বা অ্যাংজ়াইটি কমে। ক্রিয়েটিভ কাজ ইমিউনিটিও বাড়িয়ে তোলে।

**যোগাযোগ:** ৯৮৩৬৭৭৮০৬৩



ছবি: আইস্টক

# মন ভাল রাখবে সিনেমা

**শুধু বিনোদনের মাধ্যম নয়, সঠিকভাবে কাজে লাগালে মন ভাল রাখারও মোক্ষম অস্ত্র হয়ে উঠতে পারে সিনেমা! ফিল্ম থেরাপির নানা আঙ্গিকে আলোকপাত করলেন মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ ডা. শুদ্ধেন্দু চক্রবর্তী এবং দক্ষিণী সিনেমায় প্রদর্শিত মানসিক সমস্যার বিশ্লেষণে কর্নাটক-নিবাসী সায়কায়াট্রিস্ট ডা. কে এস সুব্রতা। শুনলেন সংবেত্তা চক্রবর্তী, সায়নী দাশশর্মা এবং মধুরিমা সিংহ রায়।**

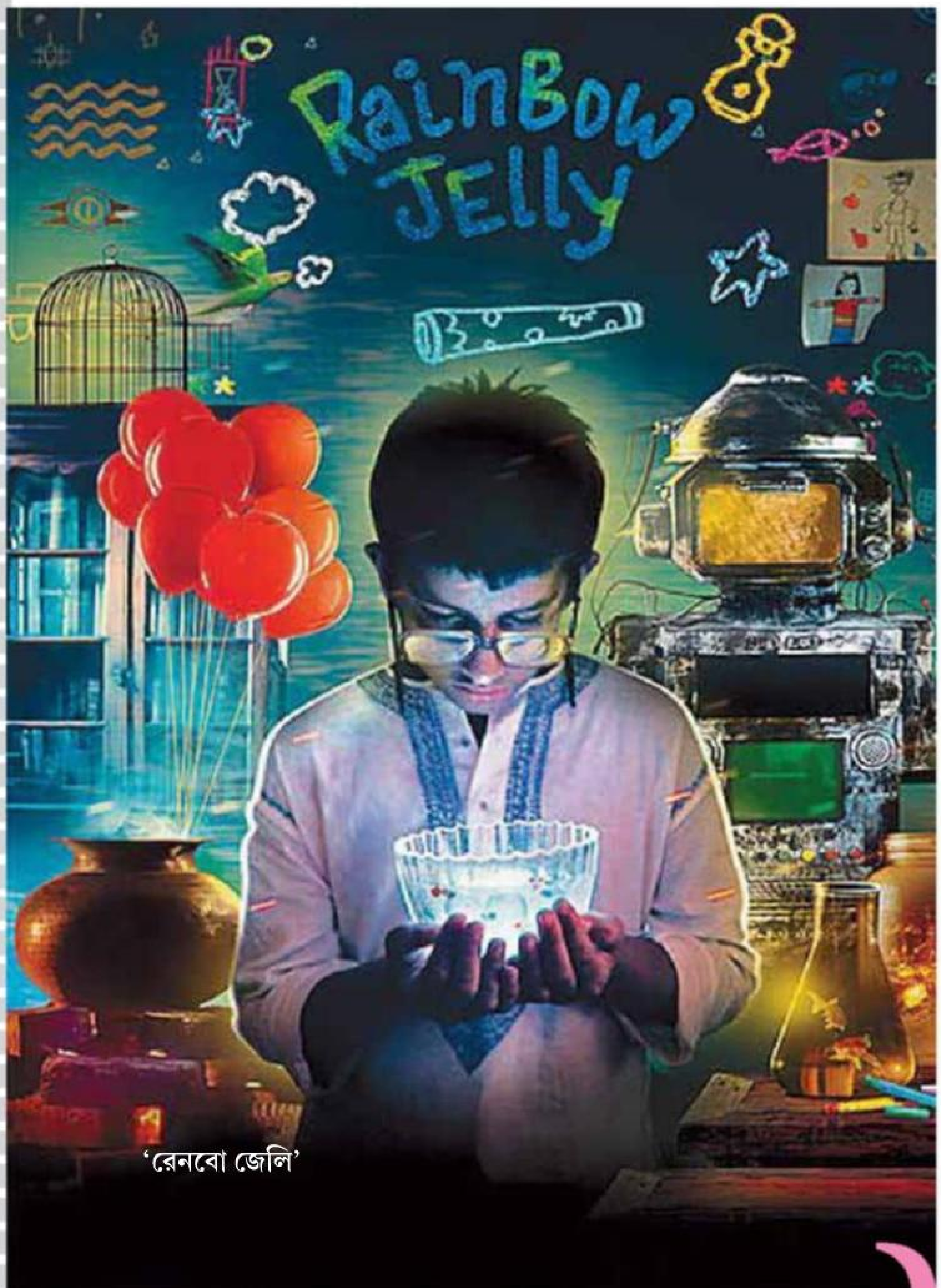
চলমান চিত্র। রুপোলি পর্দায় জীবন্ত হয়ে ওঠা কিছু মনোরম দৃশ্যপট, একাধিক চরিত্র এবং তাদের জীবনের গল্প... এসবও কি মন ভাল রাখার উপায় হতে পারে? বিজ্ঞান তো সেরকমই বলে! তাই শুধুমাত্র বিনোদন মাধ্যমের সীমিত সীমায় চলচ্চিত্রকে বেঁধে রাখলে, এর আসল ক্ষমতা সম্পর্কে অজ্ঞাতই থেকে যাবেন। শুধু মন ভাল রাখা নয়, ছোট-বড়, মনের নানা অসুখ প্রতিরোধেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে ফিল্ম। ভেবে দেখুন, সিনেমা বা যে কোনও মোশন পিকচার্স দেখার সময় অজান্তেই কত ধরনের আবেগ-অনুভূতি প্রকাশ করে থাকি আমরা, কতভাবে অনুপ্রাণিত হই! আর এই গুণের জোরেই আজ এক্সপ্রেশন থেরাপির অন্যতম অঙ্গ হয়ে উঠেছে সিনেমা। অবশ্য বিষয়টা এতটাও সহজ নয়। সিনেমাকে প্রকৃতপক্ষে থেরাপিউটিক করে তুলতে হলে, কয়েকটা বিষয়ে বিশেষভাবে সচেতন থাকতে হবে।

## সিনেমা কীভাবে থেরাপি?

ছবিকে আমরা মূলত বিনোদন এবং রিল্যাক্সেশনের মাধ্যম হিসেবেই দেখি। তাই 'ফিল্ম থেরাপি'— কথাটা শুনলেই মনে প্রশ্ন জেগে ওঠে যে, ছবি কী করে থেরাপির মাধ্যম হতে পারে? তা তো বিনোদনের চাবিকাঠি! কিন্তু ভেবে দেখতে গেলে, বিনোদনও তো আমাদের ভাললাগার সঙ্গেই জড়িয়ে! সিনেমার ক্ষেত্রে গল্পের ফ্রিকোয়েন্সি বা সংলাপের ফ্রিকোয়েন্সি, হয়তো কোথাও গিয়ে আমাদের মনের ভাললাগার ফ্রিকোয়েন্সির সঙ্গে মিলে যায়। তাই ছবি দেখতে আমাদের ভাল লাগে। আর থেরাপি জিনিসটাও খুব গম্ভীর কিছু নয়। কোনও একটা অসুখ সারানোর প্রচেষ্টাই করা হয় থেরাপির মাধ্যমে। ধরা যাক, কোনও একজন মানুষ খুব বিষাদাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন। তাঁকে একটা ইতিবাচক ফিল্ম দেখানো হল। ছবি দেখতে দেখতে হয়তো বা নিজেদের অজান্তেই আমরা কোনও চরিত্রের সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করে ফেলি। এটা অবশ্য ছবি নয় খালি, যে কোনও মোশন পিকচারের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য সত্য— যে জন্য সিরিয়ালেও জনপ্রিয় কোনও চরিত্র মারা গেলে ভেঙে পড়ি আমরা, কারণ এতদিন ধরে তো ওই চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলাম! এই কথা মাথায় রেখে যদি আমরা ইতিবাচক কোনও সিনেমা দেখিয়ে বিষাদগ্রস্ত মানুষটিকে সেই সিনেমার কোনও চরিত্রের সঙ্গে একাত্মবোধ করাতে পারি এবং সেই চরিত্র যদি কোনও ইতিবাচক ঘটনা ঘটায় বা সিদ্ধান্ত নেয়— তা হলে মানুষটিরও মনে হতে পারে যে, ও এটা করতে পারলে আমি কেন পারব না? এটা যদি সম্ভব হয়, তা হলে বিষাদগ্রস্ত মানুষটির মধ্যে কিন্তু এক ধরনের 'কগনিটিভ ইমপ্রুভমেন্ট' আসে।

সবসময় যে একটা গোটা চলচ্চিত্রই কাউকে দেখানো হয়, তা নয়। ছবির নির্দিষ্ট কোনও অংশ, যার সঙ্গে ওই ব্যক্তি রিলেট করতে পারবেন, বা যা থেকে ইতিবাচক অনুপ্রেরণা নেবেন, সেরকম ছোট কোনও অংশও মুভি থেরাপি হিসেবে দেখানো যেতে পারে। প্রয়োজন হলে একই ছবি বা ছবির অংশ বারবার দেখাতে হবে। এখানে একটা কথা মাথায় রাখা দরকার, যিনি ফিল্ম থেরাপি নিচ্ছেন, তাঁকে সিনেমা দেখতে ভালবাসতে হবে। একজন মানুষ যদি একেবারেই সিনেমা না দেখেন বা ফিল্ম সম্পর্কে তাঁর কোনও ইন্টারেস্ট না থাকে, তাঁর ক্ষেত্রে ফিল্মকে থেরাপি হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব নয়। তবে বেশিরভাগ মানুষই সিনেমা দেখতে ভালবাসেন এবং কোনও চরিত্রের সঙ্গে যদি তাঁরা যদি একাত্মবোধ করেন, সেক্ষেত্রে তাঁরাও নিজেদের ওই চরিত্রের মতো করে তোলার চেষ্টা

> ছবিকে আমরা মূলত বিনোদন এবং রিল্যাক্সেশনের মাধ্যম হিসেবেই দেখি। তাই 'ফিল্ম থেরাপি'— শুনলেই মনে প্রশ্ন জাগে, ছবি কী করে থেরাপির মাধ্যম হয়?



'রেনবো জেলি'

'রেনবো জেলি' ছবিটির কথা এ প্রসঙ্গে মনে করা যায়। ছবিতে ফ্যান্টাসি, ফেয়ারি টেল, সবকিছু মিশিয়ে একজন মাদার ফিগারকে আনা হচ্ছে। একটা 'হোপ' বা আশা দেখানো হচ্ছে।

করেন। এই উত্তরণের চেষ্টা-টাই ফিল্ম থেরাপির প্রধান উদ্দেশ্য। যেমন, কোনও স্কিজ়োফ্রেনিক রোগীকে যদি 'বিউটিফুল মাইন্ড' দেখানো হয় (এক স্কিজ়োফ্রেনিক রোগীর গল্প), সেক্ষেত্রে তিনি ওই চরিত্রকে দেখে জীবনের নতুন অর্থ খুঁজে পেতে পারেন। এখানে দু'টো বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত বিষয় নির্বাচন এবং দ্বিতীয়ত ছবিতে কী বলতে চাওয়া হচ্ছে, তা। লক্ষ রাখতে হবে, যেন সিনেমাতে কোনও ইতিবাচক মেসেজই থাকে। ড্রামা থেরাপির ক্ষেত্রে যেমন অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেশনের প্রয়োজন থাকে, আপাতত সিনেমা থেরাপিতে সেরকম 'রোল প্লেয়িং'য়ের কোনও ভূমিকা নেই। শুধুমাত্র সিনেমা দেখা হয়। তবে ভবিষ্যতে হয়তো সিনেমা থেরাপিতেও এর সংযোজন ঘটবে। একই সমস্যায় রয়েছেন, এমন কিছু মানুষকে যদি একই সিনেমা দেখিয়ে গ্রুপ থেরাপির আয়োজন করা যায়, সেক্ষেত্রে কে কীভাবে সিনেমার চরিত্রকে উপলব্ধি করলেন বা তাঁরা চরিত্রের জায়গায় থাকলে কী করতেন, সেই ধরনের আলোচনার মাধ্যমে থেরাপিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেন। বা সিনেমার কোনও দৃশ্য রিক্রিয়েট করে দেখাতে বলা যেতে পারে, নিজেদের মতো করে ডায়লগ লিখে এনে নিজেদের মধ্যে ইন্টারচেঞ্জ করতে বলা যেতে পারে। এই ধরনের প্রচুর স্কোপ রয়েছে ফিল্ম থেরাপি মডিফাই করার। তবে এখনও পর্যন্ত এই থেরাপির ব্যবহার খুবই সীমিত।

## কোন ধরনের সমস্যায় কার্যকর?

কগনিটিভ বিহেভিয়র থেরাপি, ফ্যামিলি থেরাপি, বিহেভিয়র থেরাপি, অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম, ইন্টারপার্সোনাল থেরাপি... সবরূপেই ফিল্ম থেরাপির প্রায়োগিকতা রয়েছে। বিশেষ করে ইয়ং এজ গ্রুপে ফিল্ম থেরাপির বহুল ব্যবহার রয়েছে। কারণ বাচ্চা বা অ্যাডোলসেন্টদের মধ্যে সাধারণত সিনেমা দেখার আগ্রহ সবচেয়ে প্রবল থাকে। এডিএইচডি, ছোটদের ডিপ্রেশন, চাইল্ডহুড অবসেশনের মতো একাধিক সমস্যায় অ্যাডজুভেন্ট থেরাপি হিসেবে (অর্থাৎ, ওষুধ চলার পাশাপাশি) ফিল্ম থেরাপি ব্যবহৃত হয়। আসলে, এই বয়সের বাচ্চাদের জীবনের অনেকটা জুড়ে থাকে বিনোদন। ফলে বিনোদনেও যদি একটু সতর্কভাবে কোনও থেরাপি ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, সেক্ষেত্রে খুব দ্রুত ফল পাওয়া যায়। এই বয়সে বাচ্চারা প্রায় সকলেই মোবাইল গেমস খেলতে পছন্দ করে। মূলত অ্যাকশন-বেসড গেমস বা ওয়ার গেমসের প্রতিই তারা আগ্রহী হয়। কিন্তু এই ধরনের গেমস থেকে খুব পজ়িটিভ কোনও শিক্ষা কি তারা পায়? কিংবা সুপারহিরো মুভির কথা ধরা যেতে পারে। এসব সিনেমায় যে ধরনের স্টান্ট দেখানো হয়, তা অনুকরণ করতে গেলে বাচ্চাদের যে কোনও সময় বিপদ হতে পারে। তাই বাচ্চারা কী দেখছে, তাদের মনে তা থেকে কী প্রভাব পড়ছে, এই বিষয়ে খুব সতর্ক থাকা উচিত সকলের। যেহেতু মোশন পিকচার্সের প্রতি এই বয়সে প্রবল আগ্রহ থাকে, তাই সরাসরি সিনেমা না দেখিয়ে পরিবর্তে কোনও কনস্ট্রাকটিভ গেমস খেলানো যেতে পারে। এতে গেমস খেলার পাশাপাশি অনেক ভাল জিনিসও শেখানো সম্ভব। যেমন, এখন প্রচুর ফার্মিং গেমস রয়েছে, যেখানে ছোট ছোট খেলা খেলে পয়েন্ট জিতে একটা ফার্ম তৈরি করতে হয়। এই ধরনের খেলায় কিন্তু কোনও ধরনের ধ্বংস, মারামারি বা অস্ত্রের ব্যবহার নেই। বরং নতুন কিছু সৃষ্টির আনন্দ রয়েছে, যা বাচ্চাদের মন শান্ত করতে এবং নেতিবাচক চিন্তাভাবনা থেকে দূরে রাখতে সাহায্য করতে পারে।

এ ছাড়া, বয়স্কদের ক্ষেত্রেও ফিল্ম থেরাপি ব্যবহার করা যেতে পারে। হয়তো কোনও ডিমেনশিয়ার রোগী রয়েছেন। তাঁর জীবন-ইতিহাস থেকে জানা গেল, তিনি বিশেষ এক ধরনের সিনেমা দেখতে ভালবাসেন বা কোনও বিশেষ সিনেমার দৃশ্য তাঁর অত্যন্ত পছন্দের। হয়তো সেই সিনেমা এখন তাঁর আর মনেও নেই, কিন্তু এক সময় দেখতেন, সেরকম কোনও দৃশ্য বা সিনেমা যদি তাঁকে বারবার দেখানো যায়, তাহলে অনেক ক্ষেত্রেই পুরনো স্মৃতির সঙ্গে নতুন স্মৃতি জুড়ে গিয়ে কগনিটিভ ইমপ্রুভমেন্টের সম্ভাবনা থাকে। অনেকেই হয়তো জানেন, জেরিয়াট্রিক বিভিন্ন সমস্যায় অসুস্থ ব্যক্তি তাঁর কেয়ারগিভার বা আশেপাশের মানুষদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে থাকেন। এক্ষেত্রে কেয়ারগিভারও যদি বয়স্ক হন, তাঁর মধ্যেও অবসাদ দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। দীর্ঘদিন এই ধরনের ব্যবহার পেলে একটা সময় তিনিও হাল ছেড়ে দেন এবং তার সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়ে সেই অসুস্থ ব্যক্তির উপর। জেরিয়াট্রিক ডিপ্রেশনের মানুষদের যদি 'বেলাশুরু'-র মতো সিনেমা দেখানো যায়, সেক্ষেত্রে তিনি পরিস্থিতির সঙ্গে যুঝবার রসদ পাবেন, মনের জোর পাবেন। জটিল সমস্যার পাশাপাশি এই ধরনের 'বার্ন আউট' প্রতিরোধ করতেও মাধ্যম হিসেবে ফিল্ম থেরাপি ব্যবহার করা যেতে পারে।

এর বাইরে বিভিন্ন প্যানিক ডিজ়অর্ডার নির্ধারণ করতে কিছু কিছু মুভির ক্লিপ ব্যবহার করা হচ্ছে। আক্রান্ত ব্যক্তিদের সিস্টেমিক্যালি এই ধরনের ক্লিপ দেখানো হচ্ছে এবং প্রতিক্রিয়া মাপা হচ্ছে। তারপর এক্সপোজ়ার রেসপন্স প্রিভেনশন বা ইআরপি-র শর্ত মেনে চিকিৎসা করা হচ্ছে। এরকম আরও বিভিন্ন সাধারণ এবং জটিল সমস্যার ক্ষেত্রে ফিল্ম থেরাপি ব্যবহার করা যেতে পারে। চলচ্চিত্র যে টুল হিসেবে কতটা শক্তিশালী বা এর আসল ক্ষমতা কতখানি, তা বুঝতে পারলে ভবিষ্যতে ফিল্ম থেরাপির প্রায়োগিকতা আরও বাড়বে।

## আশা... এবং সচেতনতা

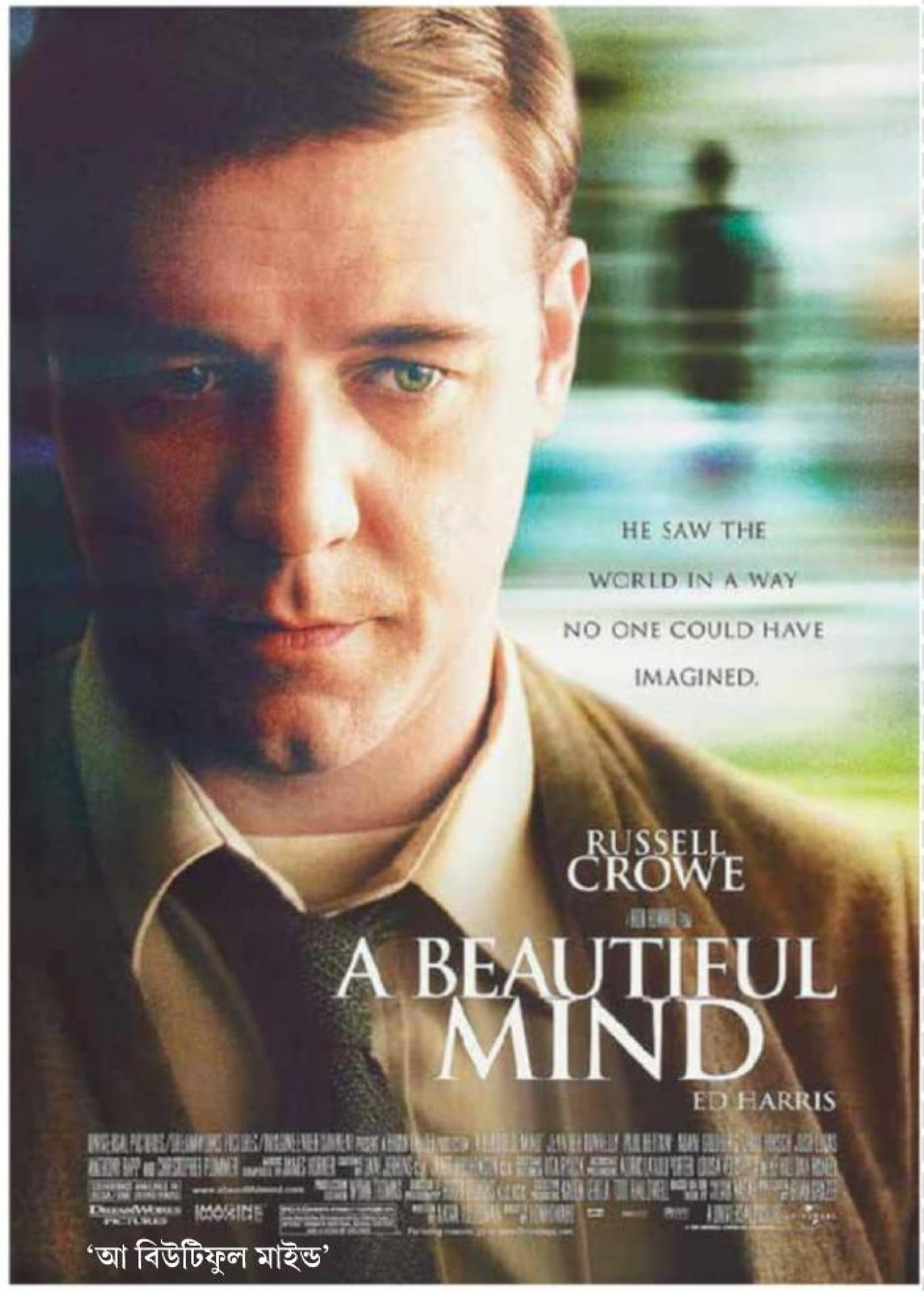
প্রথমে অবশ্যই দেখে নিতে হবে, ফিল্মটা তাঁর ফ্রিকোয়েন্সির সঙ্গে খাপ



'বেলাশুরু'




'তারে জ়মিন পর'



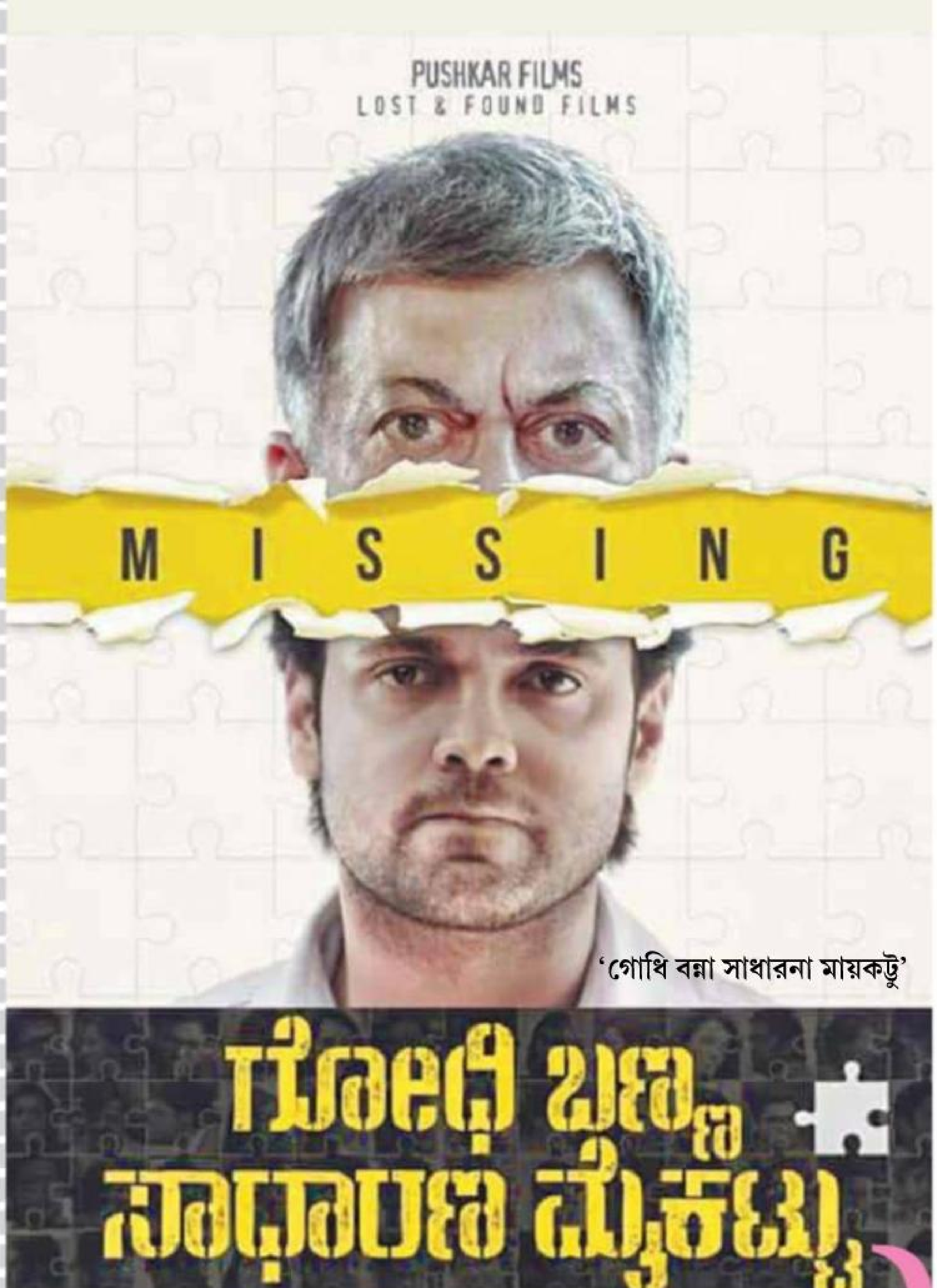

'আ বিউটিফুল মাইন্ড'

খায় কি না। ছবির স্টোরিলাইন তাঁকে কোথায় লিড করছে। প্রতিটি ছবিই তো এক-একটা যাত্রাপথ! এ প্রসঙ্গে মনে করা যেতে পারে 'সাউন্ড অফ মিউজ়িক'এর কথা। সে সময়কার বাচ্চারা ছবিটাকে অসম্ভব ভালবেসেছিল। তার কারণও ছিল। বাবা-মায়েরা কাজে ব্যস্ত, সঙ্গ দিতে পারেন না— এ অবস্থায় তারা মনে মনে হয়তো ওই ছবির টিচারের মতোই একজন মাতৃমূর্তিকে খুঁজছিল নিজেদের জীবনে। থেরাপির জন্যও এমনভাবেই ছবি বেছে নিতে হবে, যাতে যিনি থেরাপি নিচ্ছেন, ছবিটা তাঁর মধ্যে একটা উত্তরণ ঘটায়। ছবির চরিত্রের সঙ্গে যাতে তিনি নিজেকে আইডেন্টিফাই করতে পারেন। আমরা এমনিই মোশন পিকচারের চরিত্রদের অনুকরণ করতে ভালবাসি। এই জিনিসটাকেই থেরাপিউটিক্যালি ব্যবহার করতে হবে। হয়তো এমন কোনও ছবির এমন কোনও চরিত্রকে বেছে নেওয়া হল, যে চরিত্রটি এই নির্দিষ্ট ব্যক্তির মতোই বিষাদগ্রস্ত। তারপর সেই চরিত্রে একটা উত্তরণ দেখানো হল, যার ফলে দর্শকের মনে হল যে তাঁর জীবনেও এমনটা ঘটতেই পারে! এই যে আশাকে বাঁচিয়ে রাখা, পজ়িটিভ ভাইব দেওয়া— এর একটা প্রবল 'কগনিটিভ পোটেনশিয়াল' রয়েছে।

সিনেমা থেরাপির একটা সচেতনতা তৈরির আঙ্গিক রয়েছে। ধরুন, এই যে বিষাদগ্রস্ত একজন মানুষকে সিনেমার মাধ্যমে বিষাদ থেকে বের করার চেষ্টা করা হচ্ছে, এই মানুষটির সঙ্গে যদি তাঁর বাড়ির লোকজনও ছবিটা দেখেন, তা হলে তাঁরা বুঝতে পারবেন যে মনের অসুখটাও একটা অসুখই। যা সাময়িক এবং যাকে সারিয়ে তোলা যায়। এতে কোনও স্টিগমা নেই, লজ্জার কিছু নেই। অর্থাৎ একটা 'কেয়ারগিভার ট্রেনিং'ও দেওয়া হয়ে যাচ্ছে। 'রেনবো জেলি' ছবিটির কথা এ প্রসঙ্গে মনে করা যায়। সেখানে দেখানো হচ্ছে পার্শিয়ালি অটিস্টিক একটা ছেলে, যে মাকে হারিয়েছে ছোটবেলায়, সে একজন 'মাদার ফিগার', অর্থাৎ 'অ্যাটাচমেন্ট ফিগার' খুঁজছে। ছবিতে ফ্যান্টাসি, ফেয়ারি টেল, সবকিছু মিশিয়ে একজন মাদার ফিগারকে আনা হচ্ছে। একটা 'হোপ' বা আশা দেখানো হচ্ছে। যে কোনও থেরাপিউটিক ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে এই আশা জিনিসটার গুরুত্ব কিন্তু অপরিসীম। আবার এমনও ছবি রয়েছে, যেগুলো অত্যন্ত বিষাদাচ্ছন্ন। শুধু গল্প নয়, ছবির কাস্টিং, কালার— সবেতেই ধরা দেয় এই বিষাদ। দেখতে বসলে যে কারও মন খারাপ হয়ে যাবে। যাঁর কোনও মানসিক সমস্যা রয়েছে, তিনি এ রকম ছবির কোনও চরিত্রের সঙ্গে নিজেকে যদি এক করে ফেলেন, তা হলে তাঁর কষ্ট আরও বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এটা হল ফিল্ম থেরাপির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া। তাই এ রকম ছবি থেরাপির জন্য ব্যবহার করা উচিত নয়। কী ছবি দেখানো হবে, কোন বয়সের মানুষের জন্য — সেটা থেরাপিস্টকে আগে ভাল করে দেখে-বুঝে নিতে হবে।

## জঁরের সঙ্গে থেরাপি সম্পর্কিত?

প্রশ্ন করতেই পারেন, কমার্শিয়াল ছবিও কি থেরাপিউটিক হতে পারে? আসলে, কমার্শিয়াল মুভি বলতে আমরা যা বুঝি, তা হল সাধারণত দর্শকরা যা যা ভালবাসে, নাচ-গান-অ্যাকশন ইত্যাদি মেশানো সিনেমা। ফিল্ম থেরাপির ক্ষেত্রে কিন্তু এগুলো গুরুত্বপূর্ণ নয়। মূল যেদিকে খেয়াল রাখতে হবে, তা হল সিনেমার স্টোরিলাইন বা সিনেমায় কী মেসেজ দেওয়া হচ্ছে, তা। সেটা রিজিওনাল সিনেমা হোক বা পুরনো সিনেমার রিমেক কিংবা তথাকথিত 'মসালা' মুভি, যদি সিনেমায় কোনও ইতিবাচক বার্তা থাকে বা প্রধান চরিত্র যদি পজ়িটিভ কোনও বিষয় রিপ্রেজ়েন্ট করে, তাহলে তা থেরাপিউটিক হতে পারে অবশ্যই। সিনেমায় দেখানো গান বা রঙের সঙ্গে অবশ্য থেরাপির সরাসরি ভূমিকা রয়েছে। ছবিতে মন ভাল করা গান থাকলে, বা যে গান নার্ভ শান্ত করবে কিংবা আত্মবিশ্বাস বাড়াবে, মোটিভেট করবে, সেরকম সুর, কথায় তৈরি গানের মনের উপর পজ়িটিভ এফেক্ট তো আছেই। একইভাবে যদি খুব ভাইব্র্যান্ট রং



‘গোধি বন্না সাধারনা মায়কট্টু’

> দক্ষিণে পজ়িটিভ ছবিও তৈরি হয়েছে, যা মানসিক স্বাস্থ্যের উপস্থাপনার দিক থেকে স্টিরিওটাইপের বাইরে বেরনোর চেষ্টা করেছে। কান্নাড়া ‘গোধি বন্না সাধারানা মায়কট্টু’ অন্যতম।

হয় বা সুন্দর দৃশ্য থাকে ছবিতে, সেক্ষেত্রেও তা মন শান্ত করে, আনন্দের অনুভূতি জাগায়। কোনও ছবির এই প্রতিটি মাধ্যম যদি দর্শকের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তা হলে সেই দর্শকের থেরাপি হিসেবে সেই ফিল্মকে ব্যবহার করা যেতেই পারে।

তবে মনে রাখতে হবে, মনে ফিল্ম থেরাপি অবশ্যই ওষুধের বিকল্প হতে পারে না। ওষুধ তার নিজের কাজ করবে। কিন্তু তার পাশাপাশিই একটা ভাললাগার, যাকে বলে ‘ওয়েলবিইং’এরও তো দিক রয়েছে! ওষুধ খেলে কষ্টের উপশম হবে ঠিকই। কিন্তু কারও মনে গান গাওয়ার বা ছবি আঁকার ইচ্ছে জাগিয়ে তুলবে, এমন কোনও ওষুধ রয়েছে কি? সেটা সম্ভবপর করার জন্য মানুষটির কগনিটিভ এরিয়াগুলোকে অ্যাড্রেস করতে হবে। এই কগনিটিভ বিহেভিয়র থেরাপির মাধ্যম হিসেবেই ছবিকে ব্যবহার করা যায়।

দুঃখের বিষয় এই যে, এদেশে এখনও অবধি কগনিটিভ বিহেভিয়রাল থেরাপি হিসেবে ফিল্ম থেরাপিকে খুব কমই ব্যবহার করা হয়েছে। যেটুকু কাজ হয়েছে, তা-ও খুব বিচ্ছিন্নভাবে। চিকিৎসকেরা নিজেরা অনেক সময় বিভিন্ন মুভি রোগীদের দেখার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। তবে এর বাইরে অল্টারনেটিভ মেডিসিন হিসেবে মুভি থেরাপি এদেশে এখনও প্রচলিত নয়। কোনও স্ট্রাকচার্ড মুভি থেরাপি ইউনিট, মুভি থেরাপি স্কুল বা মুভি থেরাপিস্টের কোনও কোর্সও এই মুহূর্তে এদেশে নেই। ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ সায়কায়াট্রি-র তত্ত্বাবধানে বেশ কিছু ফিল্ম থেরাপি সেমিনার হয়েছে। আশা করা যায়, ভবিষ্যতে এই নিয়ে আরও অনেক বেশি কাজ হবে।

**যোগাযোগ:** ৯৮৩১৯৪০৯৫৮
**ই-মেল:** dr.suddhendu.chakraborty@gmail.com

## দক্ষিণী ছবি ও মানসিক স্বাস্থ্যের চিত্রায়ণ

যে কোনও সৃজনশীল শক্তির মধ্যেই ‘নিরাময়’ বা ‘হিলিং’-এর ক্ষমতা নিহিত থাকে। সিনেমা অত্যন্ত শক্তিশালী সৃজনশীল মাধ্যম। সেই দিক থেকে দেখতে গেলে যে কোনও ভাষার সিনেমার সঙ্গেই মন ভাল রাখা বা মেন্টাল ওয়েলনেসের একটি যোগসূত্র রয়েছে। শেক্সপিয়র একবার বলেছিলেন, ‘‘সারা বিশ্বই একটি মঞ্চ। সব পুরুষ ও মহিলাই মঞ্চশিল্পী, প্রত্যেকেরই নির্দিষ্ট ‘এন্ট্রান্স’ ও ‘এক্সিট’ আছে।’’ যেখানে বাস্তবজীবনকেই নাটকের সঙ্গে তুলনা করা যায়, সেখানে দর্শক হিসেবে যখন কেউ সিনেমা দেখতে যান, তিনি তাঁর পারিপার্শ্বিক মানুষজন, বন্ধু, আত্মীয়দের খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করেন সিনেমার চরিত্রগুলোর মধ্যে দিয়ে। যে কোনও সিনেমারই দর্শকমনে কিছু সদর্থক ও কিছু নঞর্থক প্রভাব থাকে। দক্ষিণের পরিবারগুলোয় প্রায় প্রতি সপ্তাহান্তেই মানুষ সিনেমা দেখতে যান। সিঙ্গল স্ক্রিনের পাশাপাশি মাল্টিপ্লেক্সে পরিবার, বন্ধুদের নিয়ে সিনেমা দেখতে যাওয়া এক ধরনের সেলিব্রেশন বলতে পারেন! তবে দক্ষিণের রাজ্যগুলো অর্থাৎ কর্নাটক, অন্ধ্র প্রদেশ, তেলেঙ্গানা, কেরল ও তামিল নাড়ুর বাইরে মহারাষ্ট্রের কিছু ছবি নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রায় দু’দশক আগে ‘দেবরাই’, ‘আস্তু’ আর ‘কাসভ’...এই তিনটি মরাঠি ছবির বিষয়কেন্দ্রে ছিল যথাক্রমে স্কিজ়োফ্রেনিয়া, অ্যালজ়াইমার্স ও ডিপ্রেশন। এই তিনটি ছবিতেই মানসিক অসুস্থতার অথেন্টিক উপস্থাপনা করা হয়েছিল। খুবই বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার পরে তৈরি হয়েছিল ছবিগুলো। মোহন আগাসে (অভিনেতা হওয়ার পাশাপাশি তিনি একজন মনোবিদও ছিলেন) এই ছবিগুলোর নেপথ্যের অন্যতম কারিগর ছিলেন। একজন সায়কায়াট্রিস্ট যদি ছবির সঙ্গে যুক্ত থাকেন, তাহলে সেই ছবিতে মানসিক স্বাস্থ্যের পজ়িটিভ রিপ্রেন্টেশন হবে, সেটা নিশ্চিত। এবার আসি, দক্ষিণের চারটি ইন্ডাস্ট্রির কথায়। স্যান্ডালউডের (কান্নাড়া ইন্ডাস্ট্রি) অনেক ছবিতেই সাইকোসিস বা পার্সোনালিটি ডিজ়অর্ডারের মতো বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু সেই ছবিগুলোর বেশিরভাগই মানসিক সমস্যাকে ‘স্টিগমা’ হিসেবে দেখিয়েছে! ১৯৮২-তে ‘মানাসা সরোবরা’ বলে একটি ছবি মুক্তি পেয়েছিল, বাণিজ্যিক দিক থেকে সফলও ছিল সেই ছবি। প্রথমবার মানসিক সমস্যাকে বড় পরদায় দেখানো হয়েছিল সেই ছবিতে। একজন মহিলা যাকে ‘মানসিক ভারসাম্যহীন’ বলে উপস্থাপন করা হয়েছিল, তিনি একজন ডাক্তারের সাহায্যে মেন্টাল ট্রমা কাটিয়ে ওঠেন। পরে তাঁদের প্রেমের সম্পর্ক হয়। ছবিতে মানসিক সমস্যাকে ‘ভারসাম্যহীনতা’ হিসেবে দেখানোর অর্থ সেই স্টিগমাকেই প্রশ্রয় দেওয়া! এছাড়া ‘শরপঞ্জারা’, ‘তরকা’, ‘মানাসারে’ বা ‘হুচ্চা’র মতো ছবি তৈরি হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। ‘হুচ্চা’ তামিল ছবি ‘সেতু’র রিমেক। কিন্তু ‘হুচ্চা’র গল্প বিজ্ঞানের পরিপন্থী। তবে পজ়িটিভ ছবিও তৈরি হয়েছে, যেগুলো অন্তত মানসিক স্বাস্থ্যের উপস্থাপনার দিক থেকে স্টিরিওটাইপের বাইরে বেরনোর চেষ্টা করেছে। ২০১৬-তে রক্ষিত শেট্টি অভিনীত ‘গোধি বন্না সাধারানা মায়কট্টু’-তে ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত এক মানুষের রিয়েলিস্টিক উপস্থাপনা করা হয়েছিল। সায়কায়াট্রিস্ট ডা. অশোক পাইয়ের ‘কারিনা বেঙ্কি’-তেও বিজ্ঞানসম্মতভাবে মানসিক সমস্যাকে দেখানো হয়েছিল, পজ়িটিভ বার্তাও দেওয়া হয়েছিল। মালয়ালম ছবির ক্ষেত্রে কেয়ারগিভার বা পেশেন্টের দৃষ্টিভঙ্গির তুলনায় অনেক বেশি তৃতীয় কোনও ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মানসিক সমস্যাকে দেখানো হয়েছে। ব্যতিক্রম রয়েছে, যেমন আদুর গোপালকৃষ্ণনের ‘অনন্তরম’ (মামুট্টি ও শোভনা অভিনীত)। নানা ধরনের পার্সোনালিটি ট্রেটস বা একজন মনোবিদের নানা ডিলেমা...



'দেবরাই'



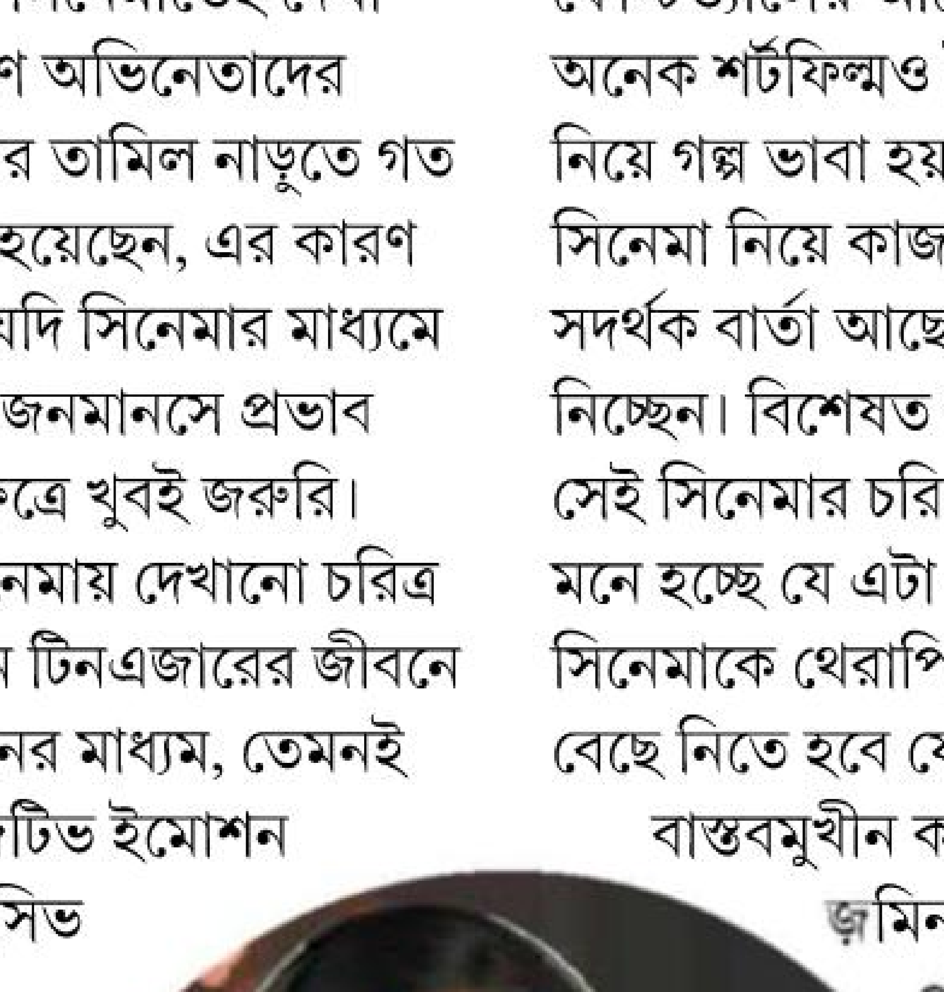
'অনন্তরম'

ইত্যাদি বিভিন্ন সময়ে যথেষ্ট সংবেদনশীলতার সঙ্গে দেখানো হলেও বৈজ্ঞানিক ভিত্তির অভাবও বেশ কিছু সিনেমায় দেখা যায়। মাথায় চোট লাগার পরে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলা বা সব ভুলে যাওয়া, ইলেকট্রো কনভালসিভ থেরাপি নিয়ে বদ্ধমূল ধারণার মতো স্টিরিওটাইপ রয়েছে এখানেও। পুরনো দিনের তেলুগু ছবির ক্ষেত্রেও স্টিগমা অনেকক্ষেত্রেই পাবেন দর্শকরা, তবে এখনকার ছবিতে তা তুলনায় অনেকটাই কম। অনেকটাই লিবারেল হয়েছে তেলুগু ছবির জগৎ। তামিলে যে ছবিগুলো মানসিক সমস্যা নিয়ে কথা বলেছে, সেগুলোতেও কয়েকটি কমন ফর্মুলা দেখা যায়। যেমন, সম্পর্কের ভাঙনের ফলে কোনও এক চরিত্রের মানসিক সমস্যা। বা মাথায় একবার চোট লাগার পরে স্মৃতিশক্তি হারানো, আর একবার চোট লাগলে স্মৃতিশক্তি ফিরে আসা। এধরনের সমস্যাগুলোয় স্পষ্ট করে ডায়াগনোসিসের ব্যাপারে উল্লেখ না থাকলে তা কতটা বিজ্ঞানসম্মত, তা নিয়ে ধন্দে পড়ে যেতে হয়। 'মানসিক ভারসাম্যহীনতা' বা 'ম্যাডনেস'-কে অনেক ছবিতেই সাধারণীকরণ করে ফেলা হয়। হয়তো তা স্কিজ়োফ্রেনিয়া বা সাইকোটিক ইলনেস। সেই চরিত্রগুলোর আচার-ব্যবহারও খুবই স্টিরিওটিপিক্যাল অনেকক্ষেত্রেই। কিন্তু বাস্তবে প্রায় দুই তৃতীয়াংশ স্কিজ়োফ্রেনিয়া পেশেন্টই সেরে ওঠেন। বাকি সামান্য কিছু মানুষের মধ্যে রেসিডিউয়াল সিম্পটম থাকে। বেশিরভাগ বাণিজ্যিক ছবি ইন্টেলেকচুয়াল ডিজ়এবিলিটি ও মেন্টাল ইলনেসের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেনা। আরও একটি বিষয় যা শুধুমাত্র দক্ষিণের সিনেমাতেই নয়, মোটামুটি সারা ভারতের সিনেমাতেই দেখা যায় তা হল ম্যাজিকো-রিলিজিয়াস ট্রিটমেন্ট। দক্ষিণে অভিনেতাদের ফ্যানডম সুবিশাল। প্রায় পুজো করা হয় তাঁদের। আর তামিল নাড়ুতে গত ৩৫ বছরে কোনও না কোনও অভিনেতাই মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন, এর কারণ জনমানসে তাঁদের ক্লিন ইমেজ! তাই, অভিনেতারা যদি সিনেমার মাধ্যমে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে সদর্থক বার্তা দেন, তা নিশ্চয়ই জনমানসে প্রভাব ফেলবে। এমপ্যাথি জেনারেশন একটি সিনেমার ক্ষেত্রে খুবই জরুরি। হয়তো পরিণতমনস্ক একজন অ্যাডাল্টের পক্ষে সিনেমায় দেখানো চরিত্র বা দৃশ্য বাস্তবজীবনে প্রভাব ফেলে না, কিন্তু একজন টিনএজারের জীবনে তা প্রভাব ফেলতেও পারে। সিনেমা যেমন বিনোদনের মাধ্যম, তেমনই তা অনুপ্রেরণা বা শিক্ষার মাধ্যমও হতে পারে। পজ়িটিভ ইমোশন পাওয়া জরুরি। সিনেমা দেখে কেউ যদি খুব অ্যাগ্রেসিভ হয়ে পড়েন, বা ডিপ্রেসড হয়ে পড়েন, তা কখনওই কাম্য নয়। তবে সিনেমাকে বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে নেওয়ার মতো পরিণতমনস্কতা থাকা জরুরি। তথাকথিত মেনস্ট্রিম বাণিজ্যিক ছবির ক্ষেত্রে অনেককিছুই যুক্তি-বহির্ভূত! এক্ষেত্রে বিনোদনই মুখ্য। আর মানসিক স্বাস্থ্যের অথেন্টিক ও বিজ্ঞানসম্মত চিত্রায়ণ যে ছবিতে হয়, সে ছবি পুরস্কার-প্রশংসা পেলেও বক্স অফিসে কতটা সফল হয়, তা নিয়ে সংশয় রয়েইছে। একটি বিষয় এখানে গুরুত্বপূর্ণ। মেন্টাল হেলথ প্রফেশনালদের এগিয়ে আসা প্রয়োজন। যেমন, হিন্দিতে 'মেন্টাল হ্যায় কেয়া'র টাইটল বদলে 'জাজমেন্টাল হ্যায় কেয়া' করা হয়েছিল। এই বদলের পিছনে ভূমিকা ছিল ইন্ডিয়ান সায়কায়াট্রিক সোসাইটির। তাঁরাই সেন্সর বোর্ডের কাছে যান। এমন উদ্যোগের আরও প্রয়োজন, সারা দেশেই।

## ফিল্ম থেরাপি ও মন ভাল রাখতে সিনেমা

ফিল্ম থেরাপি আর সিনেমাকে মন ভাল রাখার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করার মধ্যে পার্থক্য আছে। ধরুন, আপনি একটি ছবি দেখলেন। ছবি থেকে আপনি কী বার্তা পেলেন, তা ছবির শেষে পর্যালোচনা করলেন। এটি মন ভাল রাখার মাধ্যম হিসেবে দেখা যেতে পারে। ফিল্ম থেরাপি একজন অভিজ্ঞ ক্লিনিক্যাল সায়কোলজিস্টের তত্ত্বাবধানেই সম্ভব। মনোবিদ একজন মানুষের নির্দিষ্ট কোনও ডিজ়অর্ডার চিহ্নিত করবেন। তারপর তিনি কোনও ছবি দেখতে সাজেস্ট করবেন, নন জাজমেন্টাল পদ্ধতিতে। গ্রুপ সেশনেও হতে পারে এটি। মনোবিদ পেশেন্টের সঙ্গে সেই সিনেমাটি নিয়ে আলোচনা করবেন, তাঁর মধ্যে কোনও পরিবর্তনের জন্য। যেমন, সাইকো ড্রামা বা মিউজ়িক থেরাপির ক্ষেত্রে হয়। ভারতে যদিও ফিল্ম থেরাপি নিয়ে কাজ তুলনায় কম। চেন্নাইয়ের একটি ফাউন্ডেশন যেমন প্রতিবছর মানসিক স্বাস্থ্যকর্মীদের যৌথতায় ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের আয়োজন করে। অনেক মানুষই সেগুলো দেখতে আসেন। অনেক শর্টফিল্মও তৈরি হচ্ছে আজকাল, সেখানে মনোবিদের পরামর্শ নিয়ে গল্প ভাবা হয়। দক্ষিণের নামী মনোবিদ শ্রদ্ধা মোদি 'মাইন্ডফুল' সিনেমা নিয়ে কাজ করছেন। অর্থাৎ, যেসব ছবিতে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে সদর্থক বার্তা আছে, সেগুলো তিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে ভাগ করে নিচ্ছেন। বিশেষত যাঁরা কোনও মানসিক সমস্যায় ভুগছেন, তাঁদের সঙ্গে সেই সিনেমার চরিত্র, গল্প নিয়ে আলোচনা করাও জরুরি। কোথায় তাঁদের মনে হচ্ছে যে এটা একটু অন্যভাবেও ভাবা যেত, জানা জরুরি। যদি সিনেমাকে থেরাপি হিসেবেই ব্যবহার করতে হয়, তাহলে এমন সিনেমা বেছে নিতে হবে যেখানে কোনও মানসিক সমস্যাকে সংবেদনশীল ও বাস্তবমুখীন করে উপস্থাপন করা হয়েছে। বলিউডে যেমন, 'তারে জ়মিন পর'...ছবিটি দেখার পর একজন বাবা বা মা বুঝতে পারবেন, তাঁর সন্তানের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করা প্রয়োজন। বা কী ধরনের পেরেন্টিং মডেল তিনি গ্রহণ করবেন। সিনেমা যেহেতু অ্যাসপিরেশনাল, তাই শেষে একটি সদর্থক আশাব্যঞ্জক বার্তা দেওয়া জরুরি।

(মতামত বিশেষজ্ঞের ব্যক্তিগত)

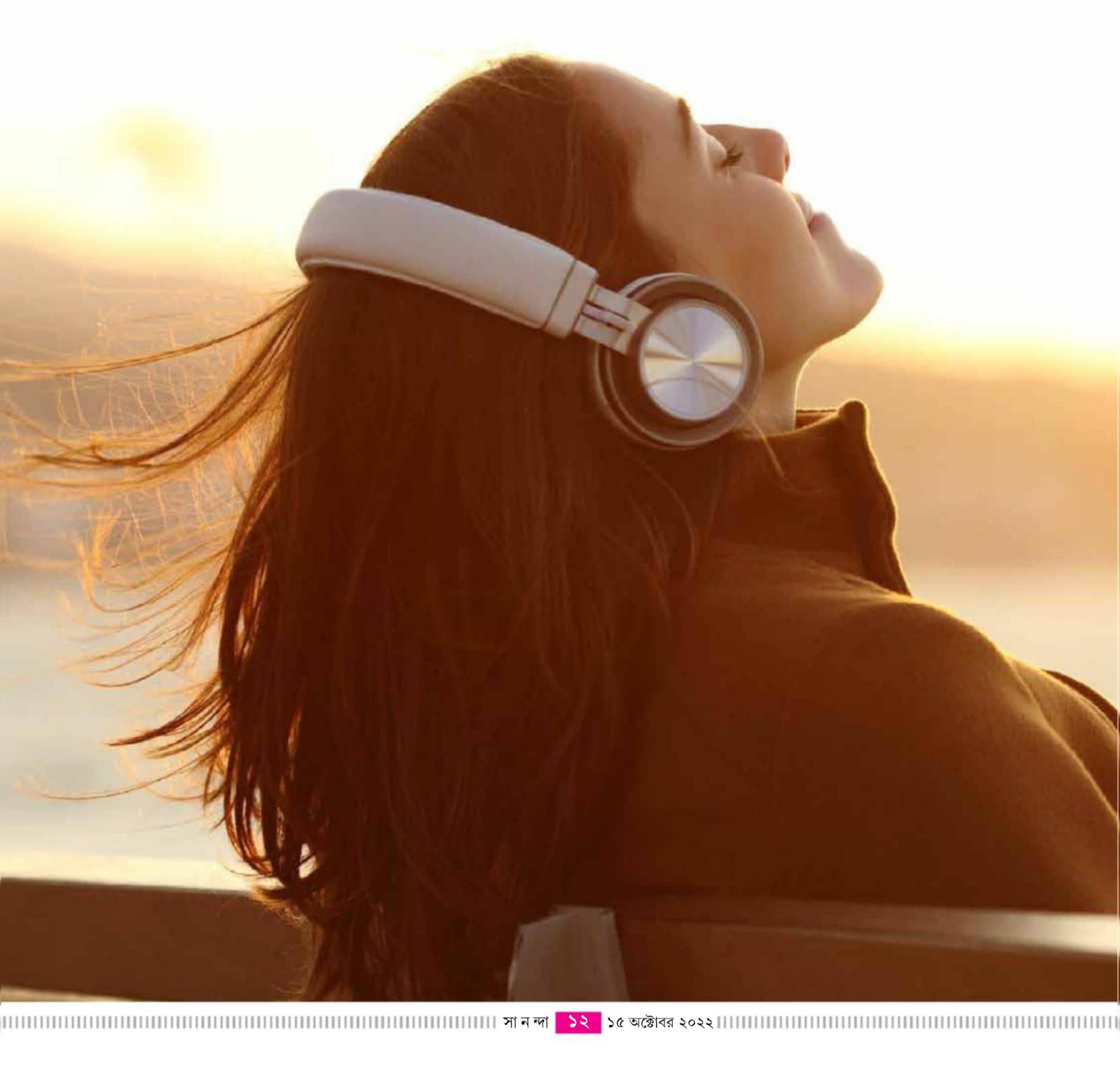


ছবি: আইস্টক

ক্রিয়েটিভ থেরাপি ও ভাল থাকা

# হাত বাড়ালেই সুর-তাল

রক্তচাপ থেকে অনিদ্রা, মধুমেহ থেকে মনঃসংযোগে অনীহা, মিউজ়িক থেরাপির সাহায্যে মুক্তি মিলতে পারে সব রোগ থেকেই। বললেন মিউজ়িক থেরাপিস্ট সন্তোষ ঘাটপান্ডে। জেনে নিলেন সংবেত্তা চক্রবর্তী।



সুকুমার রায় যতই ছোটদের জন্য ‘গানের গুঁতো’ লিখে থাকুন, গান মোটেই গুঁতো দেয় না কাউকে! বরং গান ভালবাসেন না, এমন মানুষ বিরল। কত বিষণ্ণ সকাল, একলা দুপুর, মনখারাপের বিকেল আমরা সঙ্গীতকে সঙ্গী করেই পার করেছি, সে হিসেব কি রেখেছি কখনও? গানের চেয়ে বড় বন্ধু যে খুব কম রয়েছে, সে কথা আমাদের সকলেরই জানা। কিন্তু গান বা বাজনা যে ওষুধেরও কাজ করতে পারে, সে কথা কি সকলে জানি? ওষুধ মানে খারাপ সময় কাটিয়ে ওঠার অনুপান নয় কিন্তু। একদম অসুখ সারানোর দাওয়াই! হ্যাঁ, বিভিন্ন অসুখে ম্যাজিকের মতোই কাজ করে মিউজ়িক থেরাপি। অনিদ্রা বা মনোযোগের অভাব বলুন বা রক্তচাপ অথবা ডায়াবিটিস— ঠিকভাবে, নিয়মমতো থেরাপি নিলে সেরে যায় স-ব। ভাবছেন, এ কী করে হয়? ওষুধ না, কাউন্সেলিং না, শুধু সঙ্গীতই যথেষ্ট সারিয়ে তুলতে? কী করে হয়, সেই আলোচনাই করব এবার।

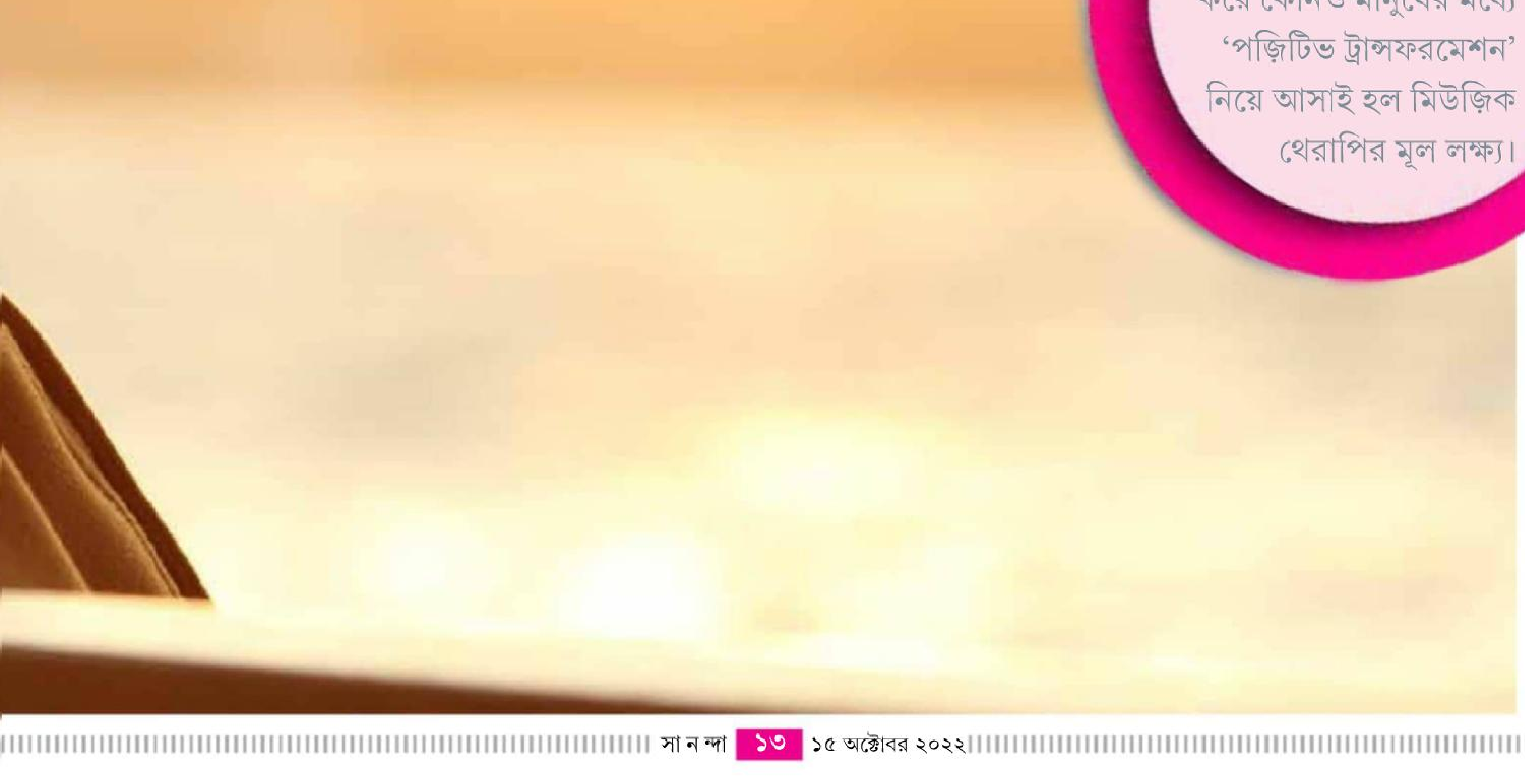
## শুধু গান শোনা নয়!

মিউজ়িক থেরাপি মানে শুধু গান বা বাজনা শুনে যাওয়া নয়। মন ভাল রাখা, বিনোদন, রিল্যাক্সেশন— নানা কারণে আমরা গান এবং বাজনা শুনেই থাকি সব সময়। এই গান ও বাজনাকে মাধ্যম করে কোনও মানুষের মধ্যে ‘পজ়িটিভ ট্রান্সফরমেশন’ নিয়ে আসাই হল মিউজ়িক থেরাপির মূল লক্ষ্য। এবার একজন মানুষের কী ধরনের উত্তরণ প্রয়োজন, তার উপর নির্ভর করে তাঁর থেরাপির ‘অবজেকটিভ’ কী হবে। কারও হয়তো আত্মবিশ্বাসে ঘাটতি হচ্ছে, তাঁর থেরাপির অবজেকটিভ এক রকম হবে। আবার যিনি ডায়াবিটিসের কষ্ট কমাতে চান, তাঁর ক্ষেত্রে অবজেকটিভ এক রকম। সেই অবজেকটিভকে ভিত্তি করেই স্থির করা হয় থেরাপির টেকনিক। সুতরাং পুরো ব্যাপারটাই অত্যন্ত ব্যক্তি-নির্ভর। কোনও একটি গান বা যন্ত্রসঙ্গীতের পিস একজন মানুষের উপর যে প্রভাব ফেলবে, অন্য কারও ক্ষেত্রে হয়তো প্রভাব সম্পূর্ণ আলাদা হবে! ধরুন দু’জন মানুষের মাথাব্যথা হল, একই পেনকিলার খেয়ে তারা সেরে গেল। মিউজ়িক থেরাপিতে কিন্তু দু’জন মানুষের একই ধরনের সমস্যা হলেও, একই সঙ্গীত শুনে তা সেরে না-ও যেতে পারে। মিউজ়িক থেরাপির অন্যতম ‘বিউটি’ হল, তা প্রতিটি মানুষের এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে সাদরে স্বীকার করে। এখানেই প্রশ্ন উঠে আসে যে, মিউজ়িক থেরাপি কী কী ধরনের সমস্যার ক্ষেত্রে কাজ করে? এই সমস্যার ব্যাপ্তি কিন্তু বিশাল। কিছু সমস্যার উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। অনিদ্রা, স্ট্রেস বা অ্যাংজ়াইটি তো বটেই, ডিমেনশিয়া, অ্যালজ়াইমার্স, এমনকী আত্মহত্যাপ্রবণতায় ভোগা মানুষেরাও মিউজ়িক থেরাপির সাহায্যে উপকার পেতে পারেন। এ সব ‘সাইকোলজিক্যাল ইসু’র পাশাপাশি ‘সাইকো-সোম্যাটিক ডিসঅর্ডার’এর ফলে জন্ম নেওয়া শারীরিক সমস্যা, যেমন ডায়াবিটিস, হার্টের সমস্যা বা আর্থ্রাইটিসেও এই থেরাপি কাজে আসতে পারে। মহিলাদের ক্ষেত্রে মেনস্ট্রুয়েশন-জনিত কষ্ট, পিসিওডি, মেনোপজ়ের সময় সমস্যা, থাইরয়েডের সমস্যা বা প্রেগন্যান্সি-রিলেটেড বিভিন্ন সমস্যাতেও আরাম দিতে পারে মিউজ়িক থেরাপি।

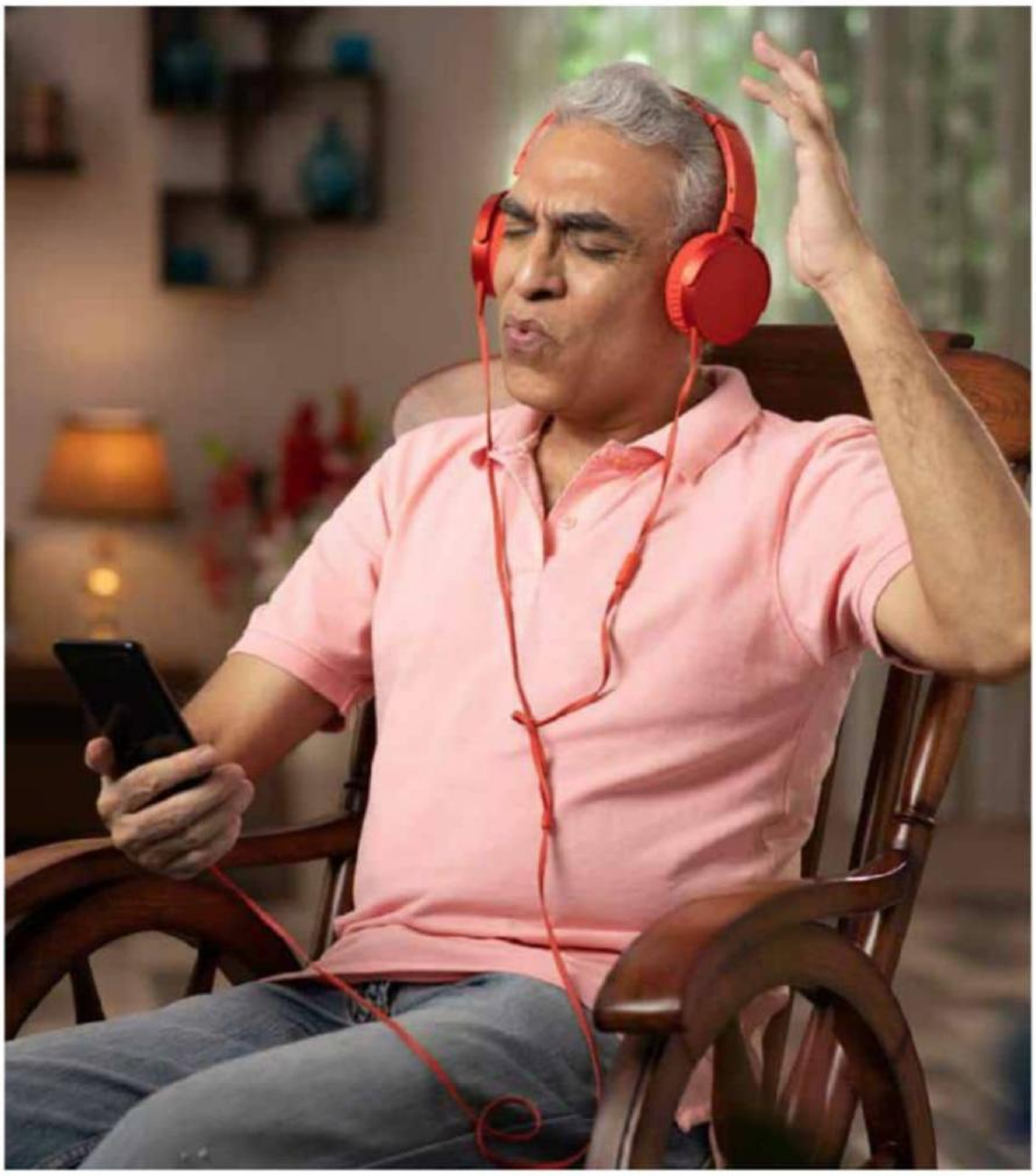
## কেমন এই চিকিৎসা?

ইচ্ছেমতো গান বা বাজনা শোনা দিয়েই যে মিউজ়িক থেরাপি হয় না, সে তো জানা হল। তা হলে কী করা হয় এই চিকিৎসাপদ্ধতিতে? পেশেন্টের হিস্ট্রি নেওয়াটা খুব জরুরি। বিহেভিয়ারাল, সাইকলজিক্যাল, মেডিক্যাল হিস্ট্রির পাশাপাশি ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কেও জানা প্রয়োজন। মানুষ হিসেবে তাঁর সম্পূর্ণ ধাঁচটা বোঝা তখনই সম্ভবপর হবে। তাঁর প্রবলেম এরিয়াগুলোও চিহ্নিত করে ফেলা যায়। সেইভাবেই তারপর মিউজ়িক ডিজ়াইন করা হয় তাঁর জন্য। ধরুন, একজনের জন্য ১৮ থেকে ২০টা ট্র্যাক বেছে নেওয়া হল। তাঁর প্রেসক্রিপশন হল, প্রতিদিন ২০ মিনিট করে এই ট্র্যাকগুলো শোনা। এর পাশাপাশি হয়তো কিছু মন্ত্র আবৃত্তি করা বা পেশেন্টের নিজের কণ্ঠস্বরকেও কোনওভাবে থেরাপিতে ব্যবহার করার নির্দেশাবলীও দেওয়া হতে পারে, তবে সেগুলো ‘কেস স্পেসিফিক’ হয়। সাধারণত থেরাপির সাইকল হয় ৬০ দিনের। শাস্ত্রীয় সঙ্গীত— কণ্ঠ এবং যন্ত্রসঙ্গীত দুইই— মিউজ়িক থেরাপির খুব ভাল মাধ্যম হতে পারে। বিভিন্ন কেসের ফলাফল ভিত্তি করে যদি বলা যায় যে, অন্য ধরনের সঙ্গীতের তুলনায় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের এক অদ্ভুত ‘থেরাপিউটিক ভ্যালু’ রয়েছে, তা হলে খুব অত্যুক্তি হবে না। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে রয়েছে যে বিজ্ঞান, তা মানবদেহ ও মনের বিভিন্ন সমস্যায় কাজে আসে সত্যিই। মানুষের শরীরে সারাদিন ধরে যা যা পরিবর্তন আসে, তারও সঙ্গে শাস্ত্রীয় গান জড়িয়ে রয়েছে। থেরাপির জন্য মিউজ়িক প্রেসক্রাইব করা হয়

> মিউজ়িক থেরাপি মানে শুধু গান বা বাজনা শুনে যাওয়া নয়, সঙ্গীতকে মাধ্যম করে কোনও মানুষের মধ্যে ‘পজ়িটিভ ট্রান্সফরমেশন’ নিয়ে আসাই হল মিউজ়িক থেরাপির মূল লক্ষ্য।







ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে রয়েছে যে বিজ্ঞান, তা মানবদেহ ও মনের বিভিন্ন সমস্যায় কাজে আসে সত্যিই।

মানবদেহের পরিবর্তন এবং দিনের নির্দিষ্ট সময়কে মাথায় রেখেই। ‘পপুলার মিউজ়িক’এর বদলে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতকে থেরাপির জন্য বেছে নেওয়ার আরও একটা কারণ রয়েছে। চেনাশোনা গান, ধরুন জনপ্রিয় কোনও ছবির গান— এগুলোর সঙ্গে অনেক সময়ই আমাদের অনেক স্মৃতি জড়িয়ে থাকে। গানটা শুনলেই সে সব স্মৃতি এসে ধাক্কা মারে মনে। অথবা হয়তো গানের দৃশ্যায়নটা মনে পড়ে যায়। থেরাপির উদ্দেশ্য সেখানে ব্যাহত হয়। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে যেটা হয় না।

আগেই বলা হয়েছে, থেরাপির ক্ষেত্রে কণ্ঠসঙ্গীত এবং যন্ত্রসঙ্গীত, দুইই গুরুত্ব পায়। দুইয়েরই নির্দিষ্ট কিছু প্রভাব থাকে পেশেন্টের উপর। তা ছাড়াও আলাদা করে বলতে হয় কিছু বাজনার কথা, মানবশরীরের উপর যেগুলোর আলাদা আলাদা প্রভাব পড়ে। বাঁশি, সন্তুর, সারেঙ্গি, বেহালা এমনই কিছু ইনস্ট্রুমেন্ট। তবলার মতো তালবাদ্যেরও যে ব্যবহার হয় না, এমন নয়। তবে সেগুলো হয় ব্যবহার করা হয় অ্যাকম্প্যানিমেন্ট হিসেবে। না হলে পেশেন্টের ‘অ্যাকটিভ পার্টিসিপেশন’এর মাধ্যম হিসেবে। মানে পেশেন্টেরই হাতে এগুলো তুলে দেওয়া হয় বাজানোর জন্য। মিউজ়িক থেরাপির যে বিভিন্ন ধরনের টেকনিক রয়েছে এটাও তার মধ্যে একটা, ক্ষেত্রবিশেষে ব্যবহার করা হয়।

## টেকনিকের সাতসতেরো

মিউজ়িক থেরাপির আলোচনায় বার বারই বলা হচ্ছে যে, নানা ধরনের টেকনিক থাকে এই পদ্ধতিতে, যা খুবই ব্যক্তি এবং কেস-নির্ভর। নিজে বাদ্যযন্ত্র বাজানো যেমন একটা টেকনিক। ক্ষেত্রবিশেষে আবার পেশেন্টকেও বলা হয় কোনও গান তৈরি করতে, বা সুর দিতে। মূল দু’একটা টেকনিক রয়েছে, যেগুলোর ব্যাপারে জেনে নেওয়া যেতে পারে এবার।

**নিজের কণ্ঠের ব্যবহার:** মিউজ়িক থেরাপির অন্যতম ‘বেসিক টেকনিক’। পরীক্ষায় প্রমাণিত যে, কোনও ব্যক্তির জন্য সবচেয়ে ‘পাওয়ারফুল ভয়েস’ হল তার নিজের কণ্ঠস্বর। অন্য যে কোনও সুরেলা, জনপ্রিয় কণ্ঠস্বরের তুলনায় নিজের কণ্ঠস্বর মানুষের পজ়িটিভিটি বাড়িয়ে দেয় অনেকগুণ— সে গলা যদি তথাকথিত ‘সুরেলা’ না হয়, তা হলেও। ব্রেন-ওয়েভ মেজ়ার করে দেখা গিয়েছে যে, একজন ব্যক্তির মস্তিষ্ক তার নিজের কণ্ঠস্বরকেই সবচেয়ে শক্তিশালী বলে মনে করে। এবার নিজের কণ্ঠের ব্যবহার হবে কীভাবে? প্রথমত, গেয়ে। হয়তো জনপ্রিয় কোনও সুর, কিংবা যাকে ‘ফ্রিকোয়েন্সি-বেস্‌ড সিম্পল টিউন’ বলা হয়, তেমন কোনও সুর গাইতে বলা হল। কিংবা কোনও মন্ত্রোচ্চারণ করতে বলা হল। অবশ্যই এগুলো সবই করতে হবে এমনভাবে, যাতে নিজের কণ্ঠস্বর শোনা যায়। মানে, শুধু মিউজ়িক শোনাতেই থেরাপি সীমাবদ্ধ থাকে না।

**‘ধ্বনিধ্যান’ ও ‘ধ্বনিস্নান’:** ধ্বনিধ্যান, অর্থাৎ সাউন্ড মেডিটেশন। শ্রোতা যেখানে একটা যাত্রাপথ অতিক্রম করেন, ‘আহৎ নাদ’ থেকে ‘অনাহৎ নাদ’ পর্যন্ত। আহৎ নাদ হল ‘আউটসাইড সাউন্ড’ বা ‘স্ট্রাক সাউন্ড’, যা মানুষ কানে শোনেন। অনাহত নাদ হল ‘আনস্ট্রাক সাউন্ড’, যা তিনি অন্তরে অনুভব করেন। ‘ধ্বনিস্নান’এর ইংরেজি পরিভাষা হল ‘সাউন্ড বাথ’। এখানে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার হয়। বিশেষ করে সন্তুর খুব গুরুত্বপূর্ণ



ধ্বনিস্নান-এ। বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে ‘সাউন্ড ফ্লো’ তৈরি করা হয়। পেশেন্ট যিনি, তিনি অবগাহন করেন সেই ধ্বনিতে। সব নেগেটিভিটি বেরিয়ে গিয়ে শরীরের শুদ্ধিকরণ ঘটানোই এই টেকনিকের উদ্দেশ্য।

## লাইভ মিউজ়িক, না ট্র্যাক?

দুই-ই ব্যবহার করা যায় মিউজ়িক থেরাপিতে। তবে লাইভ মিউজ়িকের সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। অনেক মানুষই লাইভ মিউজ়িকের মাধ্যমে থেরাপি নেওয়ার সুযোগ পান না। রেকর্ডেড বা অনলাইন মিউজ়িক সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া অনেক সহজ। বিশেষ করে কোভিড এবং কোভিড-পরবর্তী দুনিয়ার সব ধরনের, সব বয়সের মানুষই আগের তুলনায় অনেক বেশি ডিজিট্যাল হয়ে উঠেছেন। ফলে অনলাইন বা রেকর্ডেড মিউজ়িকের সাহায্য নেওয়াও তাঁদের জন্য অত কঠিন নয়।

## ভ্রূণাবস্থায়ও থেরাপি সম্ভব

মিউজ়িক থেরাপি সব বয়সের মানুষেরা তো নিতে পারেনই, এমনকী মাতৃজঠরে থাকাকালীনও কাউকে এই থেরাপি দেওয়া যায়। ভ্রূণাবস্থা থেকে দু’বছর বয়স পর্যন্ত যদি কেউ মিউজ়িক থেরাপিতে এক্সপোজ়ড হয়, তা হলে অন্য বাচ্চাদের তুলনায় তার সোশ্যাল কোশেন্ট, ইমোশনাল কোশেন্ট এবং ইন্টেলিজেন্স কোশেন্টে একটা নির্দিষ্ট উন্নতি ঘটে বলে দেখা গিয়েছে। তা ছাড়াও এই থেরাপির সুফল তাদের সঙ্গে সারা জীবন থেকে যায়, যা তাদের শিক্ষাজীবন এবং পরবর্তীকালে পেশাদার জীবনেও কাজে আসে। হবু মায়েদেরও অনেকটাই সুবিধা হতে পারে। দেখা গিয়েছে যে, বাচ্চার জন্মের আগে থেকে যদি সে মিউজ়িক থেরাপির সঙ্গে পরিচিত হয়, তবে জন্মের পর তাকে শান্ত করা বা প্রথম তিন-চার মাসে তাকে দৈনন্দিন রুটিনে সেট্‌ল করা অনেক সহজ হয়ে যায়।

## বিশেষ মানুষদের জন্য

মিউজ়িক থেরাপির বিভিন্ন টেকনিক বিশেষভাবে সক্ষম মানুষদের জন্যও খুব উপযোগী— বাচ্চাদের এবং বড়দের, দু’ক্ষেত্রেই। তাল বা রিদমের বোধ তাদের খুবই ভাল হয় বলে দেখা যায়। তালের প্রতি তাদের রেসপন্সও অন্যদের তুলনায় বেশি উদ্যমে ভরপুর হয়। রিদ্‌মিক অ্যাকটিভিটির মাধ্যমে তাদেরও রোজকার রুটিনে সেট করা সহজ হয়। অন্য নানা ধরনের ‘কেস স্পেসিফিক বেনিফিট’ পাওয়াও সম্ভব হয়।

## গান গাইতে জানলে...

যাঁরা গান গাইতে জানেন, তাঁরা মিউজ়িক থেরাপি শিখতে পারেন নিজেরাও। তারপর তা নিজেদের উপরেও প্রয়োগ করতে পারেন। অথবা নিজেরা মিউজ়িক থেরাপিস্ট হওয়ার ব্যাপারেও ভাবতে পারেন।

সুর এবং তাল এমনিতে আমাদের সর্বক্ষণের সঙ্গী তো বটেই। রোগে-শোকে হাত বাড়ালেও বন্ধু হয়ে দেখা দিতে পারে তারা। খালি সঠিক পরামর্শ নিয়ে এবং সঠিক পদ্ধতি মেনে চলতে হবে। তা হলেই সঙ্গীতে মধুময় হয়ে উঠবে প্রতিটা মুহূর্ত!

**যোগাযোগ: অনাহত মিউজ়িক থেরাপি** (+৯১-৮০১০৮৯১৭৬৫)
**ছবি (প্রতীকী):** আইস্টক

ক্রিয়েটিভ থেরাপি ও ভাল থাকা

# নৃত্যের তালে...ঘুচাও সকল বন্ধ হে

আধুনিক বিশ্বে 'ক্রিয়েটিভ আর্ট থেরাপি' খুবই আলোচিত একটি বিষয়। যার মধ্যে অন্যতম ডান্স মুভমেন্ট থেরাপি। সবিস্তারে জানাচ্ছেন ডান্স থেরাপি প্র্যাকটিশনার অঙ্গিরা চক্রবর্তী দাশগুপ্ত। লিখছেন পৃথা বসু।



স

কল বন্ধন, তা সে মানসিক হোক বা শারীরিক, নৃত্যের তালে, গানের সুরে, তুলির টানে তা থেকে বিরামের এক দুর্দান্ত পাথেয় 'ক্রিয়েটিভ আর্ট থেরাপি'। আত্মবিশ্বাস এসে ঠেকেছে তলানিতে। নিজেকে গোটাতে গোটাতে কুয়োর পাড় পর্যন্ত এনে ফেলেছেন প্রায়। না পাচ্ছেন শরীরে জোর, না মনে। সর্বক্ষণ 'এই বুঝি হেরে যাব'-র পিছুটান। আর ঠিক এখান থেকেই দিগন্তলীন খোলা মাঠে আপনাকে নিয়ে যেতে পারে নাচের তাল, লয়, ছন্দ। সেই ছন্দে শরীরই সারিয়ে তুলবে আপনার মনের যাবতীয় অসুখ।

আলোচনার শুরুতেই বলে রাখা প্রয়োজন, শরীর ও মন কখনওই আলাদা দুটো প্রতিষ্ঠান নয়। শরীর নামের ইমারতটি গড়ে তুলতে যেমন মনের স্মৃতি, আবেগ, অভিজ্ঞতার অবদান থাকে, তেমনই মনের সেসব ঘটনা-অঘটনগুলি প্রকাশের একমাত্র মাধ্যমের নাম শরীর। মন এবং শরীর কেবল দুটো আলাদা অভিব্যক্তিমাত্র। এছাড়া তাদের মধ্যে আর কোনও পার্থক্য নেই। বডি হচ্ছে গ্রস এক্সপ্রেশন, আর মন সাট্‌ল এক্সপ্রেশন। অর্থাৎ, শরীরী এক্সপ্রেশন দেখা যায়, মনেরটা দেখা যায় না। মন ফুরফুরে থাকলে যেমন শরীর আপনা থেকেই ভাল থাকে, তেমন শরীর ভাল থাকলে মনও হালকা লাগে। প্রাচীন মুনি ঋষিরাও মনঃসংযোগ বা ধ্যানের পাশাপাশি যোগ ব্যায়াম বা দেহ সাধনা করতেন। ফরাসি দার্শনিক রনে দেকার্ত, যার বিখ্যাত উক্তি "আমি চিন্তা করি অতএব আমি আছি", সেই দেকার্ত তাঁর দর্শনে মন এবং শরীরকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দিয়েছিলেন। দেকার্তের মতে, এই দুই সারবস্তুই ঈশ্বর থেকে এসেছে। কিন্তু এই দুই সারবস্তুর মধ্যে কোনও সম্পর্ক নেই। তাঁর এই মতামতের পর থেকেই মেন্টাল ওয়েলবিং বলতে আমরা শুধুমাত্র মন ভাল রাখার কথাই ভাবি। বাস্তবে এমনটা হয়না। আমরা মনে করি শরীরের কাজ হল কেবলই ফাংশানাল। তা কিন্তু নয়। তারও একধরনের ইন্টেলিজেন্স আছে। সেই কারণেই আমাদের শরীর জানান দেয় যে, এইবার একটু বিশ্রামের প্রয়োজন। কিংবা ধরা যাক, 'গুড টাচ' বা 'ব্যাড টাচ'-এর কথা। সেই সম্পর্কে অনুভূতিও কিন্তু শরীর মারফৎই আমরা প্রথমে পেয়ে থাকি। তারপর সেটা মনের দ্বারা গৃহীত বা উপলব্ধ হয়। কখনও কোনও রোমহর্ষক গল্প শুনলে আমরা বলে থাকি, 'শরীরটা শিউরে উঠল'। অথবা টেনশন করলে বা প্যানিক অ্যাটাক হলে অনেকের হাত কাঁপতে শুরু করে। এই প্রত্যেকটা উদাহরণই শরীর ও মনের পারস্পরিক নির্ভরশীলতার কথাই বলে। আর এখানেই আমাদের আলোচনার আসল চাবিকাঠি। শরীরের সাহায্যে মন ভাল করার এক অনবদ্য ম্যাজিক এই ডান্স মুভমেন্ট থেরাপি।



মেন্টাল ওয়েলবিং বলতে আমরা শুধুমাত্র মন ভাল রাখার কথাই ভাবি। মনে করি শরীরের কাজ হল কেবলই ফাংশানাল। তা কিন্তু নয়। তারও একধরনের ইন্টেলিজেন্স আছে।

## শিকড়ের খোঁজে

ডান্স মুভমেন্ট সাইকোথেরাপির শিকড় সন্ধানে আমাদের যেতে হবে উনিশ শতকে। উনিশ শতক— প্রতিদিনের পরিচিত দৃশ্যকে নতুন আলোয় চেনার সেই উদ্যমের পর্ব। শিল্পের জগতে এর ছাপ পড়েছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে। ব্যতিক্রমী পথে হাঁটেনি নৃত্যের মুদ্রাও। মুভমেন্ট মনের আবেগ প্রকাশের প্রাথমিক এবং আদিমতম ভাষা। মানুষ ঘুম থেকে জাগার পর থেকে মুভ করতে শুরু করে। একটি শিশু জন্মানোর পর প্রথমে অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমেই নিজের মনের ভাব প্রকাশ করে। তারপর সে ধীরে ধীরে কথা বলতে শেখে। আমরা যদি আদিম মানুষদের ইতিহাসও দেখি, তাহলেও একই গল্প শুনতে পাব। অতএব নাচের প্রাথমিক পরিচয় হল এটি একটি ফর্ম অফ এক্সপ্রেশন, তারপর একটি পারফর্মিং আর্ট। সেইদিকে খেয়াল রেখেই নাচকে আর কেবলমাত্র বিনোদনের পরিসরে বাঁধা হল না। তাকে যোগাযোগ স্থাপন ও মানসিক গতিবিধির বহিঃপ্রকাশের মাধ্যম হিসেবেও স্বীকৃত করার কথা উঠল। বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে মেরিয়ান চেজ়, মেরি হোয়াইটহাউস, ট্রুডি স্কুপ প্রমুখের নেতৃত্বে শুরু হল আধুনিক ডান্স থেরাপিউটিক আন্দোলন। দীর্ঘ পর্যবেক্ষণের পর তাঁরা দেখেন, সাধারণ নৃত্যশৈলীর অনুশীলনেই যদি কিছু বদল আনা যায়, তাহলে তাঁরা যেমনটা চাইছেন, তার খানিক কাছাকাছি পৌঁছনো সম্ভব। এভাবেই তৈরি হয়েছিল আজকের ডান্স থেরাপির প্রাথমিক খসড়া। এরপর এটি নানা সময়ে নানা তত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। যেমন ধরা যাক, ১৯৪০-এ সাইকোডায়নামিক



বডি মুভমেন্ট ও সাইকোলজির মেলবন্ধনই ডান্স মুভমেন্ট সাইকোথেরাপির সারকথা। ব্যক্তিকে তার শরীরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে এই থেরাপিতে বিভিন্ন কৌশল মেনে

তত্ত্বের কথা; কিংবা ১৯৬০-এ নন-ভার্বাল বিহেভিয়ার এবং শরীর কীভাবে মানসিক স্বাস্থ্যের উপর ক্রিয়া করে, সেই সংক্রান্ত গবেষণা। অবশেষে ১৯৬৬ তে প্রতিষ্ঠিত হয় ডান্স মুভমেন্ট থেরাপির সর্বজনমান্য প্রতিষ্ঠান 'আমেরিকান ডান্স থেরাপি অ্যাসোসিয়েশন' (এডিটিএ)। যথাযথ প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণের শেষে শংসাপত্র দিয়ে থাকে এডিটিএ। ভারতবর্ষে এই থেরাপির প্রচলন হয় কতকটা পরে। বর্তমানে যে মুভমেন্ট থেরাপি প্রচলিত, তাতে সাইকোডায়নামিক তত্ত্বের সঙ্গে গেস্টাল্ট থিয়োরি, মানবতাবাদী তত্ত্বসহ আরও নানা তাত্ত্বিক কাঠামোর সমাহার দেখা যায়।

## কাকে বলে 'ডান্স মুভমেন্ট থেরাপি'

নৃত্য তথা বডি মুভমেন্ট ও সাইকোলজির মেলবন্ধনই ডান্স মুভমেন্ট সাইকোথেরাপির সারকথা। আমেরিকান ডান্স থেরাপি অ্যাসোসিয়েশনের মত অনুসারে, মুভমেন্ট থেরাপি বা ডান্স থেরাপি হল এমন একটি সাইকোথেরাপি, যা অঙ্গ সঞ্চালনার মাধ্যমে কোনও ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও বৌদ্ধিক বিকাশে সাহায্য করে। প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব শরীরী ভাষা থাকে, যা অনেকসময়ই সঠিকভাবে ব্যবহার না হতে পারার ফলে বা বিভিন্ন অসুস্থতা অথবা প্রতিবন্ধকতার কারণে চিহ্নিত হতে পারে না। ফলে ব্যক্তি তার মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াগুলি স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ করতে না পেরে অনেকসময়ই মানসিক অবসাদের শিকার হয়। একজন ডান্স মুভমেন্ট সাইকোথেরাপিস্টের কাজই হল তা খুঁজে বের করা এবং তার সুষ্ঠু প্রয়োগে ব্যক্তির আত্মসচেতনতা বজায় রেখে তাঁর নানা অবদমিত সমস্যা ও অনুভূতিগুলিকে মুক্তি দেওয়া। ব্যক্তিকে তার শরীরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করাতে ডান্স মুভমেন্ট থেরাপিতে বিভিন্ন কৌশল মেনে চলা হয়। কিছু হয় দল বেঁধে, কিছু হয় ইনডিভিজুয়ালি। আবার প্রত্যেকটিই যে সকলের জন্য প্রযোজ্য, তাও নয়। কয়েকটি পদ্ধতি এখানে উল্লেখ করা হল—

**মিররিং:** এটি DMT বা ডান্স মুভমেন্ট থেরাপির সবচেয়ে জনপ্রিয় পদ্ধতি। এটি শুধুমাত্র প্রশিক্ষকের সঙ্গেও করা যেতে পারে, আবার দল বেঁধেও করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি একটি স্বতঃস্ফূর্ত মুভমেন্ট করে, আর অন্য লোকেরা তা অনুকরণ করে— আয়নায় যেমন হয়। এই কারণেই এর নাম মিরারিং।

**রেঞ্জ অফ মুভমেন্ট:** এই পদ্ধতিতে নানা প্রপ ব্যবহার করা হয়। যেমন ধরা যাক ওড়না। দুজন মিলে এই প্রক্রিয়াটি করা হয়। একজন নানাভাবে ওড়নাকে নাড়াতে শুরু করল। অপরজনকে মনে করতে হবে ওড়নাটা যেন তার শরীর। সেই অনুযায়ী সে মুভ করবে। প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব রেঞ্জ অফ মুভমেন্ট থাকে। এই পদ্ধতির ফলে সেটি বৃদ্ধি পায়। ফ্লেক্সিবিলিটি ও মোবিলিটি গড়ে তুলতে এটি খুবই কার্যকরী।

**আইসক্রিম মেল্টিং অ্যাক্ট:** এই পদ্ধতিটিও বেশ জনপ্রিয়। ঠিক যেভাবে একটা আইসক্রিম গলে যায়, ঠিক একইরকমভাবে মুভমেন্ট হয় এই

অ্যাক্টটিতে। অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিকে মনে করতে হবে যেন তিনি একটি বাক্সে বন্ধ। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে সেই কল্পিত বাক্সটাকে ভরিয়ে ফেলাই এই অ্যাক্টের উদ্দেশ্য।
এই ডান্স থেরাপিতে আমাদের দেহে ও মনে আনন্দের সঞ্চার হয়। উপরোক্ত প্রতিটি অ্যাক্টগুলিতে থেরাপির সঙ্গে লুকিয়ে আছে খুশি ও মজার উপাদানও। যেহেতু আমাদের মন নানা ইমেজ বা ছবির স্তরে ক্রিয়া করে, তাই মেটাফর বা রূপকের মাধ্যমে কাজটা অনেক সহজ হয়ে যায়। যেমন যদি বলা হয়, পিঠ টানটান করে বসুন, তাহলে সেটা কেমন যেন এক্সারসাইজ়ের মতো হয়ে যায়। সেই একই কাজ যদি এইভাবে করতে বলা হয়—আপনারা সবাই ছোট ছোট একটা বেলুন। আর এখন সেই বেলুনগুলোয় হাওয়া দেওয়া হবে। এটা বলামাত্রই এতক্ষণ যারা কুঁকড়ে বসে ছিলেন, সকলে সোজা হয়ে বসতে শুরু করবেন।



## ডান্স এবং ডান্স থেরাপি

ডান্স এবং ডান্স থেরাপির মূল পার্থক্য হল, নাচ একটি পারফর্মিং আর্ট, যেখানে দর্শকদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সেই আর্টের মাধ্যমে যেটা প্রকাশ করতে চাওয়া হচ্ছে, সেটা শিল্পিতভাবে দর্শকের সামনে তুলে ধরাই যে কোনও শিল্পের মতো নৃত্যশিল্পেরও লক্ষ্য। ডান্স থেরাপিতে এই দর্শকের ধারণাটিই থাকে না। এটি আসলে একধরনের সাইকোথেরাপিউটিক টুল, যার মাধ্যমে ব্যক্তির আত্মিক উন্নতি হয়। এখানে কোনও ঠিক-ভুলের ব্যাপার নেই। যাঁরা তথাকথিতভাবে 'নাচতে পারেন না', তাঁরাও ডান্স থেরাপির অন্তর্ভুক্ত। নৃত্যশিল্পের ক্ষেত্রে আমার মনের ভাব আরও দশটা মানুষকে বোঝানোর প্রচেষ্টা থাকে। ডান্স থেরাপি এই 'বোঝানো'-র দায়ভার থেকে মুক্ত। এতে গুরুত্ব কেবল এবং কেবলমাত্র ব্যক্তিরই। তাঁর মনের ভিতরে যা কিছু অনুভূতি, ভাল হোক বা খারাপ, তা এই মুভমেন্টের মাধ্যমে রিলিজ় হয়ে যায়। বিজ্ঞান বলে, ভাল কোনও কিছু অনুভব করলে, আমাদের দেহে এন্ডরফিন বলে একটা হরমোন নিঃসৃত হয়। যেটাকে সাধারণভাবে 'হ্যাপি হরমোন' বলে। ডান্স মুভমেন্ট থেরাপি এই হ্যাপি হরমোনের নিঃসরণ ঘটিয়ে ব্যক্তিকে তাঁর স্ট্রেস থেকে মুক্ত করে। এখানে প্রশ্ন উঠতেই পারে, বিষয়টা যখন মুভমেন্টের, তখন তো সাঁতার, সাধারণ এক্সারসাইজ় বা জিমও তো হতে পারে। নাচই কেন? কারণ, দর্শক থাক বা না থাক, নাচে সবসময়ই সৃজনশীল এক্সপ্রেশনের জায়গা থাকে। যেটা ব্যায়াম বা অন্যান্য শরীরচর্চায় থাকে না।



## কারা করতে পারবেন, কারা নয়?

প্র্যাক্টিশনারের মতে, ডান্স মুভমেন্ট থেরাপি সবাই করতে পারবেন। এটা সকলের করা উচিত। অর্থাৎ আট থেকে আশি ডান্স থেরাপির আওতায় পড়বে সবাই-ই। স্পেশাল চাইল্ডরা তো বটেই, এমনকি যিনি হুইলচেয়ার বাউন্ড বা যিনি প্যারালাইসিসে আক্রান্ত, ডান্স মুভমেন্ট থেরাপি তাঁর জন্যও। সেই ব্যক্তি যদি হাত নাড়াতে পারেন বা চোখেরও মুভমেন্ট করতে পারেন, তাহলেও তিনি করতে পারবেন। যেমন আলাদা আলাদা রোগে আলাদা আলাদা ওষুধ, তেমনই এক্ষেত্রেও এক-একরকম শারীরিক বা মানসিক স্থিতি, বয়স অনুসারে এক-একরকম থেরাপি।

**শিশুদের জন্য:** শিশুরা বেশিরভাগ সময়ই তাদের মানসিক বা শারীরিক সমস্যার কথা সঠিকভাবে বলে উঠতে পারেনা। ডান্স মুভমেন্ট সাইকোথেরাপি তাকে তার মনের আবেগ অনুভূতি প্রকাশে উদ্বুদ্ধ করে।

**কিশোর ও প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য:** এই বয়সের ছেলেমেয়েরা সচরাচর পোস্ট ট্রমাটিক পর্যায়ে অদ্ভুতরকমভাবে ডিফেন্সিভ হয়ে ওঠে। অর্থাৎ তাদের আচরণের মধ্যে একধরণের গুটিয়ে থাকার ভাব দেখা যায়। এই অবস্থা থেকে তাদের বেরোতে সাহায্য করে ডান্স থেরাপি।

**বয়স্কদের জন্য:** এই এজগ্রুপের মূল সমস্যা স্মৃতিশক্তি হ্রাস এবং স্বাস্থ্যের সার্বিক অবনতি। ডান্স মুভমেন্ট থেরাপি বডি মুভমেন্টের মাধ্যমে তাঁর শারীরিক স্বাস্থ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মনোযোগ বাড়াতেও সাহায্য করে।

## ভাল থাকায় ডান্স থেরাপি

আগেই আলোচিত হয়েছে যে শারীরিক ও মানসিক দুই ক্ষেত্রেই কাজ করে এই মুভমেন্ট থেরাপি। একদিকে যেমন আপনার বডি ইমেজ উন্নত করতে সাহায্য করবে, তেমনই আপনাকে করে তুলবে আত্মবিশ্বাসী। এর সবচেয়ে বড় অবদান, ডান্স মুভমেন্ট থেরাপি আমাদের নিজেকে আবিষ্কার করতে শেখায়। নিজের সঙ্গে আত্মিক যোগসূত্র স্থাপন ও অন্যদের সঙ্গে সম্প্রীতির বোধ তৈরি করে, যার ফলে আজেবাজে নানা চিন্তা আমরা সহজেই দূরে রাখতে পারি। আবার যেহেতু গোটা ব্যাপারটায় ছন্দ বা রিদ্‌ম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই আমাদের মনোযোগ বৃদ্ধিতেও এই থেরাপি সহায়তা করে। সাহায্য করে আমাদের সৃষ্টিশীলতা বৃদ্ধিতে। মুড ম্যানেজ করতেও এর জুরি মেলা ভার। ঠিক কী কী সমস্যা থেকে এই ডান্স মুভমেন্ট থেরাপি আমাদের নিরাময়ে সাহায্য করতে পারে, তার একটি ছোটখাটো তালিকা দেওয়া হল—





**অলকানন্দা রায়**
*নৃ ত্য শি ল্পী*

নৃত্য যে থেরাপি হিসেবে কাজ করে, তার প্রভাব যে কতখানি, সেটা জেলবন্দিদের সঙ্গে কাজ না করলে বোধহয় আমি কনশাসলি বুঝতে পারতাম না। মনখারাপ হলে যখন নাচ করতাম, দেখতাম মন ভাল হয়ে গেছে। এই সম্পর্কে আগে এটুকুই জানতাম, ব্যস! কিন্তু এটা যে মানুষের মানসিকতা পালটে দিতে পারে, সেটা আমার জেলের ভেতরের ছেলে-মেয়েরা প্রমাণ তো করেছেই, আমারও চোখ খুলে দিয়েছে। যখন কেউ একা নাচ করে, তখন সে তাঁর নিজের ইচ্ছেমতো নানা মুদ্রা করতে পারে। যে মুহূর্তে সেটা একজন থেকে অনেকজনের পরিসরে চলে আসে, তখনই তাতে অজান্তেই তৈরি হয়ে যায় পারস্পরিক সাপোর্ট বা ঐক্যের মাত্রা। ছন্দোবদ্ধ নাচ আমাদের দেহ, মন ও আত্মাকে একটা সূত্রে বাঁধে। একটা গান বা নাচে যখন তাল কেটে যায়, তখন সেই গান বা নাচটা নষ্ট হয়ে যায়। জীবনের তাল কেটে গেলে সেটাও নষ্ট হয়ে যায়। ওদের জীবনে যে ছন্দপতন ঘটেছিল, নাচের মাধ্যমে সেই ছন্দটা যেন ফিরে পেয়েছিল ওরা। ওদের ব্যবহার না হওয়া জীবনীশক্তিকেই কাজে লাগিয়েছিলাম আমি। দিনের শেষে এটা ওদের কাছে পুজোর মতো হয়ে গেছিল। রিহর্সালের ঘরটা প্রতিদিন ঝাঁট দিয়ে, মুছে পরিষ্কার করত আমার ওই ছেলে মেয়েরা। যেটাতে মানুষের জীবনের উন্নতি হয়, মানুষ আনন্দ অনুভব করে, সেটাই আর্ট। সেটা আঁকার মাধ্যমে হতে পারে, গানের মাধ্যমে হতে পারে, নাচের মাধ্যমেও হতে পারে। আর নাচ যেহেতু মানসিক স্বাস্থ্যের পাশাপাশি আমাদের শারীরিক স্বাস্থ্যের সঙ্গেও জড়িত, তাই থেরাপি হিসেবে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং কার্যকরী।

**শারীরিক সমস্যা:** ক্রনিক পেন, চাইল্ডহুড ওবিসিটি, ক্যানসার, আর্থ্রাইটিস, হাইপার টেনশন, কার্ডিয়োভাসকুলার ডিজ়িজ়

**মানসিক সমস্যা:** অ্যাংজ়াইটি, ডিপ্রেশন, পুয়োর সেলফ এস্টিম, ইটিং ডিসঅর্ডার, পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস, অ্যাটেনশান ডেফিসিট/ হাইপার অ্যাক্টিভিটি ডিসঅর্ডার (ADHD)

**বৌদ্ধিক সমস্যা:** ডিমেনশিয়া, কমিউনিকেশন ইস্যু

**সামাজিক সমস্যা:** অটিজ়ম, অ্যাগ্রেশন/ ভায়োলেন্স, ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স-জনিত ট্রমা, সোশাল ইন্টার-অ্যাকশনজনিত সমস্যা, পারিবারিক সমস্যা

যতই দিন এগোচ্ছে, ততই যেন আমরা ক্রমশ সেরিব্রাল হয়ে পড়ছি। আগে যেটুকু বডি মুভমেন্টের সুযোগ-সম্ভাবনা ছিল, দুবছর লক ডাউনে ‘ওয়র্ক ফ্রম হোম’-এর দৌলতে সেই অভ্যাসটুকুও চলে যাচ্ছে। প্রতিদিন আমরা বাক্সবন্দি হয়ে পড়ছি। সেটা বাড়ি হতে পারে, বা কম্পিউটার কিংবা ল্যাপটপ। যতক্ষণ না হাঁটুতে কিংবা পিঠে বা কোমরে আমাদের কোনও গুরুতর সমস্যা হচ্ছে, ততক্ষণ আমরা শরীর নিয়ে চিন্তাই করছি না। আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ক্রমাগত কমে যাচ্ছে, কারণ আমরা

বোকার মতো শরীর নিয়ে অতিরিক্ত উদাসীন থেকে মনকে গুরুত্ব দিয়ে এগিয়ে চলেছি। অর্থহীন এই চলা আর কতদিন? এবার বোধ হয় ভাববার সময় এসে গিয়েছে। আর সেখানে ডান্স মুভমেন্ট থেরাপি হতেই পারে আপনার নতুন ভাবনার সঙ্গী।







অভিরূপ সেনগুপ্ত
*ডান্স থেরাপিস্ট*

স্পেশাল চাইল্ডদের উপর ডান্স মুভমেন্ট থেরাপি নিয়ে আমি প্রায় দশ বছর কাজ করছি। এই থেরাপিকে আমি 'লাভ থেরাপি' বলতেই বেশি পছন্দ করি। আমি দেখেছি, স্পেশাল চাইল্ড এবং তাদের বাবা মায়েরা সবসময়ই নিজেদের খুব গুটিয়ে রাখে। সর্বক্ষণ হীনমন্যতায় ভোগে। এই ডান্স থেরাপি তাদেরকে একরকম শক্তি জোগায়। তারা আত্মবিশ্বাসী হতে শেখে। আর সন্তানদের এই পরিবর্তন দেখে বাবা মায়েরাও আগের থেকে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী হন। এই থেরাপি নার্ভাস সিস্টেমকে সজাগ রাখে, যা এই শিশুদের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ওদের পেশিগুলোকে সচল রাখে। ডান্স মুভমেন্ট থেরাপির আর একটা উল্লেখযোগ্য কাজ হল এই থেরাপি স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। হজমেও সাহায্য করে। এক্সারসাইজ়ের সঙ্গে মিশছে মনের আনন্দ আর ক্রিয়েটিভিটি। এই থেরাপি করাতে গিয়ে বাচ্চাগুলোর সঙ্গে আমার একরকম আত্মিক সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছে। ওদেরও আমার প্রতি এক অদ্ভুত টান তৈরি হয়েছে। আর ওরা যেহেতু নিয়মিতভাবে পারফর্মও করে, তাই ঠিক সময়ে মঞ্চে আসা, ঠিক সময়ে মঞ্চ থেকে বেরনো, আলো ঠিকঠাকভাবে নেওয়া— এই ব্যাপারগুলোতেও অভ্যস্ত হয়ে উঠছে ওরা। যেটা ওদের নিজেদের মধ্যে একধরণের ঐক্য তো তৈরি করছেই, পাশাপাশি আদান-প্রদান করার ক্ষমতাকেও বাড়িয়ে তুলছে। এককথায় স্পেশাল চাইল্ডদের সার্বিক বিকাশের ক্ষেত্রে এই ডান্স মুভমেন্ট থেরাপি সত্যিই একটা নতুন পথ দেখিয়েছে আমাদের। এই কাজ আমাদের আরও ছড়িয়ে দেওয়া উচিত।

যোগাযোগ: ৯০৫১৫২২১৬৬
ওয়েবসাইট: www.healingrhyyithm.com

ছবি: আইস্টক ও ইন্টারনেট

ক্রিয়েটিভ থেরাপি ও ভাল থাকা

# নাট্য-অভিনয় থেকে রোগ নিরাময়

চিকিৎসাশাস্ত্রে এক অভিনব পদ্ধতির নাম ড্রামাথেরাপি। এই ড্রামাথেরাপির কথা সবিস্তারে বললেন সাইকোলজিক্যাল কাউন্সিলার দীপা তলাপাত্র। শুনলেন দেবলীনা অধিকারী।





মানুষের মন বড় অদ্ভুত। রোজকার ব্যস্ত জীবনে মন ফিসফিসিয়ে বলতে থাকে তার ভাল না থাকার কথা। যেগুলো চেপে রাখতে রাখতে জন্ম নেয় মনের অসুখ। তখন আমাদের নিজেদের কথার জানানোর দরকার পড়ে। দরকার লাগে একটা আড়ালের। ড্রামা থেরাপি চরিত্রের দ্বারা সেই আড়াল দেয়। অন্য কোনও চরিত্রের মধ্য দিয়ে একটি ব্যক্তি তার জীবনের না বলা কথাকে প্রকাশ করতে পারে। অঙ্গ সঞ্চালনের মাধ্যমে সেই মানুষটা অনেক সময়ই তার মানসিক অবসাদ থেকে মুক্তি পেয়ে যায়। কোনও এক ভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করে মানুষের নতুন জীবনবোধ গড়ে উঠতে পারে। আসলে কখনও কখনও শরীরের অসুখের মতোই মনের জন্যও আমাদের ছুটে যেতে হয় চিকিৎসকের কাছে। প্রয়োজন হয় চিকিৎসার। তবে শরীরের চেয়েও মন আরও বেশি জটিল, তার তল পাওয়া মুশকিল। এখানে উপসর্গের কোনও বাঁধাধরা গৎ নেই। তাই মনের চিকিৎসার ধরন খানিক আলাদা। শরীরের চিকিৎসায় প্রয়োজনমতো ওযুধে কাজ হলেও, মন কেবল ওযুধেই সারে না। শরীরের পথ্যের মতোই দরকার হয় মনের পথ্যের। আর এই প্রয়োজনীয়তাই সৃষ্টি করেছে—মিউজ়িক থেরাপি, ডান্স থেরাপি, আর্ট থেরাপি, ড্রামা থেরাপি প্রমুখ ক্রিয়েটিভ আর্ট থেরাপির। এই লেখার আলোচ্য বিষয় ড্রামা থেরাপি।

## ড্রামা থেরাপি কী?

২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০-তে সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে দেখা যায়, কলকাতা থেকে কয়েকজন মানুষ শান্তিনিকেতনের তেপান্তর গ্রামে রওনা দিয়েছিলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল, এই সব ক্রিয়েটিভ আর্ট থেরাপির মাধ্যমে রোজকার জীবনের ক্লান্তি থেকে মানুষকে খানিক স্বস্তির স্পর্শ প্রদান। ড্রামা থেরাপি হল একটি থিয়েটার টেকনিক। যা চিকিৎসা-শাস্ত্রে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ব্যবহার করলে সেরে যায় মনের অসুখ, দুরারোগ্য শারীরিক ব্যধি। এই পদ্ধতিতে গড়ে তোলার দরকার এক নিরাপদ পরিসর। সেই পরিসরে তার মনকে বুঝে বিশেষজ্ঞের অধীনে নির্মিত হয় এক চিত্রনাট্য। যা কখনও অসুস্থ মনের জন্য হয়ে ওঠে পেনকিলার, কখনও এই পদ্ধতি মনের কোণে ভিড় করা রাগ, অভিমানকে টেনে বাইরে বের করে আনে। যে কোনও থেরাপির মতো ড্রামা থেরাপিতেও রোগীর নিরাপত্তাকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। এটি কোনও একক প্রচেষ্টা নয়। এটি একটি টিমওয়র্ক। অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজনানুসারে রোগীর পরিবারের সদস্যকেও অভিনয় করানো হয়ে থাকে। মনে রাখতে হবে, রোগী যেন সেফ-সাইডে থাকে। চিত্রনাট্যের কোনও গল্পে যেন তার কোনও আঘাত না লাগে। কাউন্সেলিং-এর ক্ষেত্রে একটা কথায় জীবন নতুনভাবে যেমন গড়ে ওঠে তেমনই মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। কাজেই জেনে নিতে হবে কোন কথায় তার প্রতিক্রিয়া কেমন হতে পারে? তা বোঝার জন্য রোগীর নেচার বোঝা সবচেয়ে জরুরি বিষয়। যে নাটকটা লেখা হবে, খেয়াল রাখতে হবে তার ফলে যাতে কোনও নেগেটিভ রিয়্যাকশন না হয়ে যায়। তা হলে ভয়ংকর ক্ষতি হয়ে

> এই পদ্ধতিতে গড়ে তোলার দরকার এক নিরাপদ পরিসর। যা এই থেরাপির একটি অন্যতম ও প্রধানতম শর্ত। মনকে বুঝে বিশেষজ্ঞের অধীনে নির্মিত হয় এর চিত্রনাট্য



এই থেরাপি কাদের জন্য প্রযোজ্য তার কোনও নির্দিষ্ট ফর্মুলা নেই। রোগীকে পর্যবেক্ষণ করে, তার সমস্যা বুঝে সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

যেতে পারে। অর্থাৎ বিষয়টি কিন্তু বেশ রিস্কি। এর জন্য বিশেষজ্ঞের সঠিক পর্যবেক্ষণ জরুরি। তিনি নিজে এই পদ্ধতি বহুবার ব্যবহার করেন প্রয়োজনমতো, এবং প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে খুব পজ়িটিভ রেজ়াল্ট পেয়েছেন। অসুস্থতায় জর্জরিত মানুষেরা সমস্যাগুলো থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছেন। এই অভিনব চিকিৎসাপদ্ধতিই সাধারণত মনোচিকিৎসা-বিজ্ঞানে ড্রামা থেরাপি নামে পরিচিত। বলা হয়ে থাকে, যেখানে শব্দের সীমানা শেষ হয়, ঠিক সেখান থেকেই সুরের সীমানার শুরু। ড্রামা-থেরাপিতে এই শব্দ, সুর ও বডি মুভমেন্টের সহযোগে তৈরি হয় এক অভিনব চিকিৎসা-পদ্ধতি।

## ইতিহাসের খোঁজে

ড্রামার ভিতরে ক্যাথারসিসের মাধ্যমে শান্তি প্রদানের শক্তিকে প্রথম চিকিৎসায় কাজে লাগিয়েছিলেন মনোচিকিৎসক জ্যাকব মোরেন। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর চিকিৎসাকেন্দ্রে তিনি মন-চিকিৎসায় তৎকালীন প্রচলিত চিকিৎসাপদ্ধতির বাইরে নানা উদ্ভাবনী পদ্ধতির পরীক্ষামূলক প্রয়োগ করতেন। তাঁর এমনই এক পরীক্ষামূলক পদ্ধতি হল সাইকোড্রামা। ড্রামাথেরাপি বর্তমান রূপ পরিগ্রহণ করতে শুরু করেছে ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের দিকে, যখন প্রথাগত মনোচিকিৎসার সঙ্গে যোগ হল হিউম্যানিস্টিক অ্যাপ্রোচ। যার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে তৈরি হয় 'নর্থ ইন্ডিয়া ড্রামা থেরাপি'। পশ্চিমি দুনিয়ায় এই পদ্ধতির প্রয়োগের বয়স বেশ খানিক হলেও ভারত তথা বাংলায় এই পদ্ধতি একেবারেই নতুন, অনেক ক্ষেত্রেই হয়তো অজানাও।

## কাদের জন্য....

এই থেরাপি কাদের জন্য প্রযোজ্য, তার কোনও নির্দিষ্ট ফর্মুলা নেই। রোগীকে পর্যবেক্ষণ করে, তার সমস্যা বুঝে সিদ্ধান্ত নিতে হয় যে, এই থেরাপির প্রয়োগ করা কতখানি সঠিক। সবার ক্ষেত্রে কিন্তু এই পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় না। দেখতে হবে রোগী কোন ক্রিয়েটিভ আর্ট ফর্মে পজ়িটিভ রিয়্যাক্ট করছে। যদিও ড্রামা থেরাপির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনও বয়সের সীমা নেই বলেই তাঁর মত। নেশাগ্রস্ত মানুষ, যে সমস্ত মানুষ অ্যাংজ়াইটি বা মানসিক অবসাদের শিকার, অথবা যাঁরা আত্মবিশ্বাসের অভাবে ভোগেন, তাদের ক্ষেত্রে এই থেরাপি প্রযোজ্য। এ ছাড়া সম্পর্কের জটিলতা, স্কিজ়োফ্রেনিক রোগী, অটিজ়মে আক্রান্ত শিশু, ট্রমার পেশেন্ট, বহুদিন ধরে শারীরিক নানা দুরারোগ্য ব্যধিতে জর্জরিত মানুষ, যারা দীর্ঘদিন ধরে নানা রকম ওষুধ খাচ্ছে, এমন মানুষদের জন্য এই থেরাপি অত্যন্ত লাভজনক প্রমাণিত হতে পারে। যাদের মনে কথা জমেছে কিন্তু প্রকাশ করার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে, যারা প্রিয় মানুষকে হারিয়ে যাওয়ায় হঠাৎ আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, যাদের আত্মহত্যাপ্রবণতা রয়েছে, স্ট্রেস বা টেনশনে যারা দীর্ঘকাল ধরে ভুগছে অথবা ওসিডির সমস্যা রয়েছে— তাদের ক্ষেত্রেও এই থেরাপি অত্যন্ত ফলপ্রসু। দাম্পত্যকলহ, প্রেমঘটিত সমস্যা, টিনএজ সমস্যা, বয়সজনিত সমস্যার ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা সম্ভব। এ ছাড়াও টিনএজারদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতার সমাধানেও এই পদ্ধতি খুবই ফলপ্রসু। কথোপকথনে উঠে এল এমনই কিছু কেসের কথা, যেগুলোর ক্ষেত্রে ড্রামা থেরাপির



নিরাময় ক্ষমতায় আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। এমনই কিছু অসুখ ও তার রোগমুক্তির গল্প এখানে তুলে ধরা হল —

প্রথম গল্পটি ডাক্তারের ভুলে হার্টে ফুটো নিয়ে জন্মানো একটা ক্লাস ৬-এর বাচ্চার গল্প। ১১ মাস বয়সে তিন বার অপারেশনের আঘাত নেমেছিল ছোট্ট শরীরে। ছেলেটির কথা বলা প্রায় বন্ধ, যেটুকু বলছে জড়িয়ে যাচ্ছে, কোনও রকম ম্যানার্স শিখতে পারছে না— সেই অবস্থা থেকে এই থেরাপির ফলে ধীরে ধীরে বাচ্চাটি সুস্থ হতে থাকে। আজ সে কেবল সুস্থই নয়, সুন্দর সিন্থেসাইজ়ার বাজায়, নাচ শেখে।

দ্বিতীয় গল্পটি আর-একটি ১১ বছরের বাচ্চা মেয়ের। তার ঠাকুরমার মৃত্যু ও পারিপার্শ্বিক বেশ কিছু আঘাতে তার কথা বন্ধ হয়ে যায়। মানসিক ভারসাম্য হারায় সে। বহু জায়গা থেকে তাকে বাতিলের খাতায় ফেলে দেওয়া হয়। থেরাপিতে আসার প্রায় সাতদিন পর তার নাম জানা যায়। থেরাপির নানা পদ্ধতির সঙ্গে তাকে ডায়েরি লিখতে দেওয়া হয়। 'ওর দ্বারা কিছু হবে না' দাগিয়ে দেওয়া মেয়েটি আজকের দিনে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত।

এবার সমাজে প্রতিষ্ঠিত এক ভদ্রলোকের কথা। তিনি হ্যালুসিনেশনের শিকার হন। কানে প্রতিধ্বনি হত। কোনও অপরাধবোধ তাঁর মধ্যে জমাট বেঁধে আছে। সেইমতো চিত্রনাট্য লেখা ও তাঁর নিজের বাড়িতেই ড্রামা অনুষ্ঠিত হয়। আজ তিনিও সাধারণ জীবনে ফিরে গেছেন।

একটা অত্যন্ত জটিল কেস। এক বাচ্চা মেয়ের কথা বলা বন্ধ হয়ে যায়। সে আর হাঁটতে পারে না। আসলে হঠাৎ করে কোনও ভয় থেকে আমরা নিজেদের গুটিয়ে নিতে থাকি। শিশু যেভাবে গর্ভে থাকে, আমরাও প্রায় সেই অবস্থায় চলে যাই। কথা বলা বন্ধ করে দিই, হাত-পা গুটিয়ে নিই। কল্পনা করি, আমরা এখন আবার গর্ভে নিরাপদে আছি। এ ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল। থেরাপি করতে করতে বাচ্চা মেয়েটি প্রথম 'মা' বলতে পারল। ধীরে ধীরে তাকে নানা উপায় কথা শেখানো হল, নতুন করে হামাগুড়ি দেওয়ানোর মাধ্যমে ধীরে ধীরে হাঁটতে শেখানো হল। আজ সে-ও সুস্থ।

এবার এক প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পীর কথা, পিতৃহারার শোকে তিনি মানসিক আঘাতে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিলেন, সরে যাচ্ছিলেন সঙ্গীতের জগৎ থেকে। এই থেরাপির স্পর্শে, চিত্রনাট্যের মাধ্যমে তিনি আবার নিজেকে নতুনভাবে খুঁজে পেলেন। এইভাবেই সমস্যা বুঝে সঠিক চিত্রনাট্য ও পদ্ধতির প্রয়োগে তথাকথিত মিরাক্‌ল ঘটতে পারে।

## ড্রামা থেরাপির আবশ্যিক শর্ত



মানসিক যন্ত্রণা থেকে খানিক স্বস্তি পেতে অথবা মনের অন্দরে বাসা বাঁধা ক্ষোভ, অভিমান, কষ্টকে টেনে বার করে আনতে এর জুড়ি মেলা ভার। কিন্তু এর অন্যতম চ্যালেঞ্জ, রোগীর জন্য নিরাপদ পরিসর গড়ে তোলা। এই থেরাপি সাধারণ ড্রামা নয়। সাধারণ ড্রামা লেখা এবং মঞ্চস্থ করা হয় সাধারণত দর্শকদের কথা মাথায় রেখে, তাঁদের মনোরঞ্জনের জন্য। কিন্তু এই থেরাপিতে দর্শক নয়, অংশগ্রহণকারীকে কেন্দ্র করে ড্রামা রচিত ও অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ ড্রামার চিত্রনাট্য, প্রস্তুতি-পর্বের সঙ্গে ড্রামা থেরাপির বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। চিত্রনাট্য এই থেরাপির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যেহেতু



চিত্রনাট্য রচনার সঙ্গে সাহিত্যের যোগ আছে, তাই যিনি এটি করাবেন, তাঁর সাহিত্যবোধ থাকতে হবে। ভাষার উপর অত্যন্ত দখল থাকতে হবে কারণ এখানে শব্দ-চয়নে সবচেয়ে বেশি সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। ভুল শব্দ-চয়নে রোগীর সাংঘাতিক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। অনেক সময় দেখা যায় কোনও নিরীহ শব্দে হঠাৎ করেই রোগী সাংঘাতিক রেগে যাচ্ছে অথবা তার সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়া ঘটছে। সেই মুহূর্তে শব্দটি বদল করতে হবে। সবচেয়ে বেশি দরকার রোগীকে বোঝা, তার কথা খুব ভালভাবে শুনে সমস্যার শিকড়কে খুঁজে বের করা। মনের অসুখের কারণ সবসময় কার্য-কারণ সম্পর্কের মতো পাশাপাশি অবস্থান করে না। অনেকক্ষেত্রেই অসুখের শিকড় রয়ে যায় মনের কোনও এক দুর্গম স্থানে। সমস্যার সেই শিকড়টি খুঁজে না পেলে এই থেরাপি রোগীর জন্য তেমন ফলপ্রসূ হবে না। সেইজন্য যিনি এই থেরাপি করাবেন, তাঁর হিউম্যান সাইকোলজির উপর গভীরে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। তাঁর নেতৃত্বদানের ক্ষমতা থাকা দরকার, যাতে রোগী এবং রোগীর আত্মীয় তাঁর উপর সম্পূর্ণ ভরসা করতে পারেন। তবে সবার প্রথমে দরকার মানসিকভাবে অসুস্থ ব্যক্তিটির কথা শোনা, তার ঠিকমতো কাউন্সেলিং করা, যা সবচেয়ে শক্ত। তিনি থেরাপিস্টকে মনের গোপন খোঁজ দেবেন কেন? তার জন্য দরকার থেরাপিস্টের সমানুভূতিশীল হওয়া, ভীষণরকম ধৈর্যশীল ও যত্নশীল হওয়া। তাঁর মধ্যে আপন করে নেওয়ার ক্ষমতা থাকতে হবে। সর্বোপরি রোগীকে ভালবাসতে হবে। রোগীর মনে বিশ্বাস জাগানো দরকার যে, 'আমি তোমাকে ভীষণ ভালবাসি, তাই আমি যেটা করছি, তোমার ভালর জন্যই করছি'। এই বন্ডিং তৈরি হওয়া ভীষণ জরুরি, নয়তো সে একটা কথাও শুনবে না।

## ক্যাথারসিস ঘটবে কোন জাদুমন্ত্রে

পাশ্চাত্যে এই ড্রামা-থেরাপি বিভিন্নভাবে ও বিভিন্ন পদ্ধতির সাহায্যে করা হয়ে থাকে।

**রোল প্লে:** এই পদ্ধতিটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত। এখানে একজন নির্দিষ্ট অবস্থায় অন্য কোনও চরিত্রের ভূমিকায় অংশগ্রহণ করে থাকে। কিছু ক্ষণের জন্য সেই চরিত্রের মধ্যে থেকে তিনি সেই চরিত্রের আঘাত, কষ্টকে বুঝতে পারেন। তাঁর মধ্যে নতুন জীবনবোধ গড়ে ওঠে। নিজেকে নতুনভাবে জানতে পারেন।

**ইম্প্রোভাইজ়েশন:** অনেক ক্ষেত্রে নাটকের কোনও দৃশ্য অথবা বক্তব্য



### চৈতি ঘোষাল

*অভিনেত্রী ও থেরাপিস্ট*

আমি ড্রামা থেরাপি শুরু করি মূলত আর্থিকভাবে সচ্ছল গৃহবধূদের নিয়ে। ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে মানসিক সুস্থতার প্রয়োজন খুবই বেশি। মানুষ অনেক কিছু ভিতরে চেপে রাখে। ড্রামায় কোনও চরিত্র অস্ত্রের মতো বা বর্মের মতো কাজ করে। তুমি যখন সেখানে কারওর ভূমিকায় অভিনয় করছ, তখন তোমার এমন কোনও আবেগ যা কেউ জানে না... এমনকী হয়তো তুমিও জান না... তা বাইরে আসতে পারছে। তখন মনে হয়, 'আমার এই কষ্টটাকে কেউ জাজ করবে না'। তোমার কথাটা তুমি চরিত্রের আড়ালে বলে হালকা হলে। এমন অনেককে দেখেছি যার স্ট্যামারিং-এর সমস্যা ছিল, আত্মবিশ্বাস ছিল না, বডিশেমিংয়ের ভয় ছিল, তারা সুস্থ হয়েছে। আমার থেরাপিতে সবচেয়ে বেশি চেষ্টা করি আত্মবিশ্বাসটাকে ফিরিয়ে দিতে। এ ক্ষেত্রে ড্রামা থেরাপি খুবই এফেক্টিভ থেরাপি, কারণ এতে একজনের সমস্ত শরীর ও মন একসঙ্গে চালনা হচ্ছে। আমি প্রায় দশটা সেশন করিয়েছি লকডাউনে। তাতে আমিও অনেক কিছু শিখেছি। এই থেরাপির ক্ষেত্রে মানুষ নিজেকে অন্যভাবে, নতুন করে জানতে পারে।

অসুস্থ ব্যক্তিকে হঠাৎ করে আঘাত দেওয়ার আশঙ্কা তৈরি করে। সেই ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকভাবে অভিনয়ের পরিবর্তনের মাধ্যমে সেই ভয়কে সামলাতে হয়। রোগীর নিরাপত্তার জন্য এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ ও অত্যাবশ্যকীয় পদ্ধতি।

**মাইম অর্থাৎ মূকাভিনয়:** কোনও রকম বক্তব্য না রেখে কেবল বডি মুভমেন্ট বা বডি ল্যাংগোয়েজের মাধ্যমে কোনও দৃশ্য বা নির্দিষ্ট কোনও আবেগকে প্রতিফলিত করার পদ্ধতিকে বলা হয় মাইম। এর মাধ্যমে নতুনভাবে চিন্তাভাবনার শক্তি যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনই কোনও না বলা আবেগের বহিঃপ্রকাশের ক্ষেত্রেও উপযোগী।

**স্পিচ:** এই পদ্ধতিতে রোগীকে এমনভাবে কথা বলানো হয়, যেভাবে তিনি সাধারণত কথা বলতে পারেন না। ধরা যাক, কারওর যদি আত্মবিশ্বাসের অভাব থাকে, তবে থেরাপিস্ট তাকে উচ্চ-স্বরে কথা বলতে বলেন।

**মুভমেন্ট:** এটা অনেকটাই মাইমের মতো। এই পদ্ধতিতে অনেক সময় মানসিকভাবে বিধ্বস্ত ব্যাক্তিটি নৃত্যের মাধ্যমে নিজেকে খুঁজে পান। কখনও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনার মাধ্যমে তিনি নিজের মানসিক অবস্থাকে তুলে ধরতে সক্ষম হন।

**অ্যাকটিং-আউট:** এই পদ্ধতিতে থেরাপিস্ট সেই ব্যবহার ও পরিস্থিতিকে আবার অভিনয় করতে বলেন, যা রোগীর সমস্যার মুল কারণ। যাতে রোগী নিজেই তাঁর সমস্যার কারণ খুঁজে পেতে সক্ষম হন।

**প্রপ্‌স এবং মাস্কের ব্যবহার:** শিশুদের ক্ষেত্রে অনেক সময় এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

এ ছাড়াও আরও নানা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। প্রফেশনাল নাটক বা ড্রামার মতো এখানেও মহড়া হয়, চলে নির্দিষ্ট দিনে ড্রামা অনুষ্ঠিত করার পূর্বপ্রস্তুতিও। যদিও বইয়ের অক্ষর আর বাস্তবে তাদের সঙ্গে ডিল করা ও সেই পদ্ধতি প্রয়োগ করার মধ্যে বেশ অনেকখানি পার্থক্য থেকে যায়। সার্জারির ক্ষেত্রে বইয়ের লেখা অনেক সুবিধা দিতে পারলেও, থেরাপিতে তা খুব বেশি সাহায্য করতে পারে না। প্রত্যেকটা মানুষের মন আলাদা হয়ে যায়, সেই মানুষের মনের সঙ্গে একাত্ম হতে পারার উপায় বই দিতে পারে না, নিজেকেই তার খোঁজ পেতে হয়। অসুস্থ মানুষ যাঁরা গল্প লিখতে পারেন, কবিতা লিখতে পারেন, যাদের যা প্রতিভা, তাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করা যেতে পারে, আর তাতে সুফলও মেলে। প্রত্যেকটা মানুষের ভিতরই আছে অসীম শক্তির ভান্ডার। আমরা তার খবর রাখি না। অথচ তাকে যদি খুঁজে নেওয়া যায় তাহলে কিন্তু একটা বিস্ফোরণ ঘটে। বই তো ভালবাসতে শেখাতে পারে না, রোগীকে ভালবাসতে হয়। আর সেখানেই পৃথক হয়ে যায় বইয়ের কালো অক্ষর আর বাস্তবের থেরাপির ধরন।







## শেষের কথা

প্রতিদিনকার লড়াইয়ে, জীবনের পথে চলতে চলতে ক্লেদ জমতে থাকে। সেই ক্লেদ আর পরিষ্কার করা হয়ে ওঠে না। পাহাড়-প্রমাণ ভিড়ে অসুস্থ হয়ে ওঠে মন। কোভিড পরবর্তীতে প্রতিদিনের আত্মহত্যা বৃদ্ধির প্রবণতা এই অসুস্থ হয়ে ওঠা মনের প্রমাণ। সেই মনকে সুস্থ করতে অনেক ক্ষেত্রে আমাদের যেতে হয় ক্যাথারসিসের সন্ধানে। মন খারাপ কখনও অসুস্থতার চেহারা নিলে ড্রামা থেরাপি মহৌষধের কাজ করতে পারে। যে ওষুধে সুস্থ হয়ে বলা যেতে পারে, 'ভাবছি ঘুরে দাঁড়ানোই ভালো।...যে-কোনও দিকেই চলে যেতে পারি/ কিন্তু কেন যাবো?'

তবে এই থেরাপির সঠিক প্রয়োগ একটি মানুষকে যেমন সুস্থতার পথে আনতে পারে, তেমনই এর ভুল প্রয়োগ কিন্তু রোগীর সাংঘাতিক ক্ষতি সাধন করতে পারে, সুতরাং বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ছাড়া এই থেরাপি করা ও করানো থেকে বিরত থাকাই শ্রেয়।

ছবি: আইস্টক ও ইন্টারনেট
যোগাযোগ: ৯৮৩১২৯৭১৪৭

# চিকিৎসা যখন চিত্রকলায়

আর্ট শুধুই রিক্রিয়েশন নয়, শরীর ও মনের এক রঙিন বন্ধন। কোভিড পরবর্তী সময়ে আরও প্রাসঙ্গিক হচ্ছে আর্ট থেরাপির ক্ষেত্র। আলোচনায় মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. অভিরুচি চট্টোপাধ্যায়। কলমে অনিকেত গুহ।

চিকিৎসাশাস্ত্রে বিজ্ঞানের উত্থান উল্কাসম। উনিশ শতকের পর থেকে চিকিৎসাশাস্ত্রের বিভিন্ন শাখায় আসে ভরা জোয়ার। চিরাচরিত পদ্ধতির বাইরে গিয়ে এ ক্ষেত্রেও দেখা যায় 'আউট অফ দ্য বক্স' ধ্যানধারণার সমীক্ষা। মিউজ়িক থেরাপি, ড্রামা থেরাপি, ডান্স থেরাপি, আর্ট থেরাপি—খুলছে চিকিৎসাশাস্ত্রের নতুন অধ্যায়। আর্ট থেরাপির বিষয়টাও আলাদা নয়। প্রখ্যাত লেখক *O. Henry-র 'The Last Leaf'* গল্পে জনসি *(Johnsy)* নিউমোনিয়া থেকে মানসিকভাবে সুস্থ হয়ে ওঠে দেওয়ালে আঁকা গাছের পাতার ছবি দেখে। সাহিত্য হোক বা ব্যক্তিজীবন, মানসিক স্বাস্থ্যের উপেক্ষিত অধ্যায় মুখ তুলেছে বারবার। বর্তমান ঘোড়দৌড়ের জীবনে নিজের দিকে তাকানোর সুযোগ কম; কর্মব্যস্ততায় ঢাকা পড়ে যায় মনের খোলা জানলাগুলো। মন-কেমনের অচিন অলিন্দে লুকিয়ে থাকে দুঃখ-সুখের না-বলা অধ্যায়। বাড়তে থাকে হতাশা, মানসিক চাপ ও চূড়ান্ত অবসাদ। আর্ট থেরাপি'র জার্নি শুরু ঠিক এখানেই। পদ্ধতিগত চিকিৎসার পাশাপাশি প্যারালাল মিডিয়া হিসেবে ক্রমেই প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে আর্ট থেরাপি'র পরিসর।

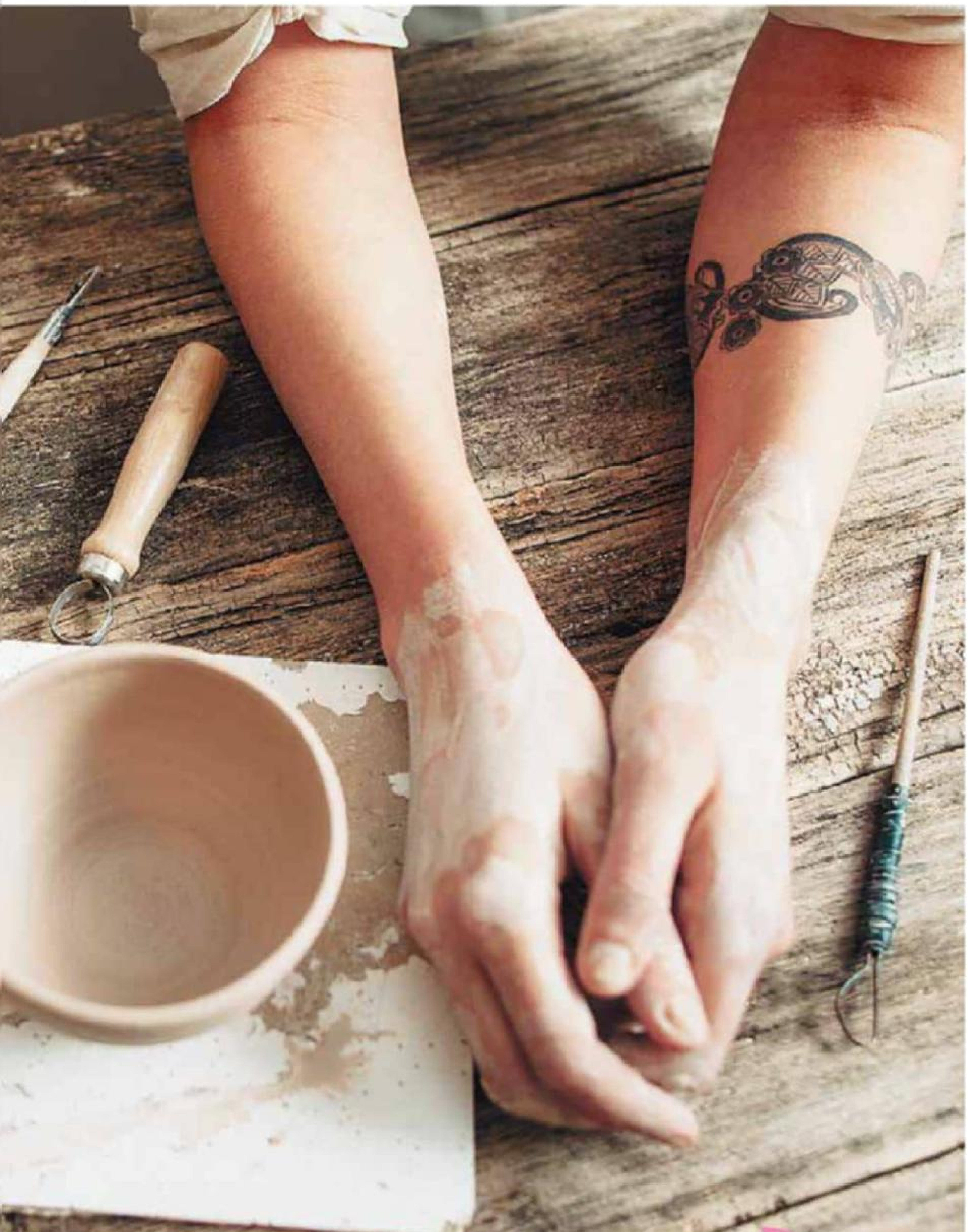
> মানসিক চাপ, মানসিক অবসাদ, সুইসাইডাল বিহেভিয়র, সাবস্ট্যান্স ডিপেনডেন্সি ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে আর্ট থেরাপির প্রয়োগ ও তার ফলাফল যথেষ্ট আশাপ্রদ।

## আর্ট থেরাপি কী?

বিদেশের মাটিতে বহুচর্চিত হলেও ভারতে বিষয়টা খানিক আনকোরা। মনের 'শরীর' ভাল রাখতে ট্যাবলেট-সিরাপ যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন, মনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার সহজ একটা পথ। আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রে আর্ট থেরাপি সেই পথের দিশারি। মানসিক চাপ, মানসিক অবসাদ, সাবস্ট্যান্স ডিপেনডেন্সি, সুইসাইডাল বিহেভিয়র ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে আর্ট থেরাপির প্রয়োগ ও তার ফলাফল যথেষ্ট আশাপ্রদ। প্রচলিত চিকিৎসাকে সঙ্গে রেখেই চিকিৎসার গুণগত মান







## উৎসের সন্ধানে...

প্রাচীনকাল থেকে রেখা মানুষের ভাবনা বহিঃপ্রকাশের মাধ্যম। রেখার আকারে ফুটে উঠত অব্যক্ত কথার আঁকিবুকি। আদিম আলতামিরা সেই সাক্ষ্য বহন করে চলেছে যুগ যুগ ধরে। বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে আর্ট থেরাপির এই ভিন্ন ধারার সূত্রপাত। এই সময়ে মূলত ইউরোপ ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রাথমিকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়। পৃথিবী যখন বিশ্বযুদ্ধে আচ্ছন্ন, ১৯৪২-এ অ্যাডরিয়ান হিল প্রথমবার ব্যবহার করলেন 'আর্ট থেরাপি' শব্দটি। শোনালেন চিত্রকলার হাত ধরে মারণব্যাধি যক্ষ্মা থেকে মানসিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ফিরে আসার গল্প। এই ধারায় গতি আসে ১৯৬৯ সালে *American Art Therapy Association (AATA)* গঠিত হওয়ার পর। ধীরে ধীরে সামনে আসে আর্ট থেরাপির অজানা অধ্যায়। ভারতীয় জনমানসে আর্ট থেরাপির ধারণা এখনও স্পষ্ট নয়। পরীক্ষামূলক প্রয়োগের হাত ধরেই দেশের একাধিক মেডিক্যাল রিসার্চ সেন্টার, বিশ্ববিদ্যালয় আর্ট থেরাপির উপর সেমিনার বা ইন্টিগ্রেটেড কোর্সের সুযোগ করে দিচ্ছে। অতি সম্প্রতি ২০১৫ সালে গঠিত হয় *Indian Art Therapy Discussion Forum (IATDF)*, যেখানে উপযুক্ত সচেতনতা ও প্রশিক্ষণের দ্বারা অন্যান্য বিষয়ের মত আর্ট থেরাপিকে শিক্ষার মূলস্রোতে নিয়ে আসার চেষ্টা করা হচ্ছে।

## রেখার রেখায় মনের কথা

লেখার শুরু রেখায়। সুমেরের 'কিউনিফর্ম' হোক বা মিশরের 'হায়ারোগ্লিফিক', রেখার বাঁধনে বারবার জীবন্ত হয়ে উঠেছে অতীত ইতিহাস। আর্ট থেরাপিতে রেখার ব্যবহারও অনুরূপ। আমাদের অনেকেরই হয়তো ডায়েরি লেখার অভ্যেস আছে। রোজকার মুখ্য-গৌণ নানা ঘটনার খতিয়ান। সাইকোলজিক্যাল সমস্যায় অনেক ক্ষেত্রেই চিকিৎসকেরা এই ডায়েরি লেখার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। কিন্তু সেই লেখা ডাক্তার বা অন্য কাউকে দেখাতেই সৃষ্টি হয় দোটানা। লেখার ভুল, হাতের লেখা ইত্যাদি একাধিক কারণে চলে আসে নিজেকে সংযত করার সমূহ প্রচেষ্টা। ফলত, ব্যক্তিমনের যথাযথ প্রকাশ ঘটে না। এখানেই শুরু হয় আর্ট থেরাপির যাত্রাপথ। লেখার ঠিকভুল হয়; রেখার নয়। একজনের কাছে যা নিতান্তই আঁকিবুকি, ব্যক্তিভেদে সেটাও অর্থপূর্ণ হতে পারে। রেখার ব্যবহার এক্ষেত্রে অনেক বৃহত্তর। সেখানে ব্যক্তির বাড়তি সতর্কতা অনাবশ্যক। সাদা পাতায় কখনও পেন, কখনও রং-তুলিতে রেখায় রেখায় ফুটে উঠে মনের নীল-নকশা। সাদা পাতায় ফুটে ওঠা রেখাচিত্রটি হয়ে ওঠে তার মনের অনেক কাছের। সমস্যার শিকড়ে পৌঁছতে যা চিকিৎসকদের কাছে অনেক বেশি মাত্রায় গ্রহণযোগ্য। এ ক্ষেত্রে একটা বিষয় সহজ করা দরকার। ব্যক্তির আঁকা বা স্ক্রিবলিং যা-ই হোক না কেন, সেটা দেখে ব্যক্তির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কিংবা মনের অবস্থা উপলব্ধির প্রচেষ্টা, এটা সাইকোলজিক্যাল টেস্টিংয়ের অন্তর্ভুক্ত। *Rorschach Inkblot Test (RIBT), Thematic Apperception Test (TAT), Children's Apperception Test (CAT),* সাইকোলজিক্যাল টেস্টিংয়ের এক-একটি উল্লেখযোগ্য মাধ্যম। এক্ষেত্রে আর্ট থেরাপির উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। ব্যক্তির মনের অবস্থার উপলব্ধি নয়, বরং পেন-পেনসিলের সাহায্যে তাকে তার মতো করে ভাবনার পরিসর তৈরি করে দেওয়াই এই পদ্ধতির সার

> পরীক্ষামূলক প্রয়োগের হাত ধরেই একাধিক মেডিক্যাল রিসার্চ সেন্টার, বিশ্ববিদ্যালয় আর্ট থেরাপির উপর সেমিনার বা ইন্টিগ্রেটেড কোর্সের সুযোগ করে দিচ্ছে।

বৃদ্ধি ক্রিয়েটিভ আর্ট ফর্মের মুখ্য উদ্দেশ্য। গঠনগতভাবে এই পদ্ধতি পুরোপুরি ডাক্তারি প্রোটোকলের অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ সম্পূর্ণ বিষয়টি পর্যবেক্ষণ-সাপেক্ষ। কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চের পাশাপাশি সমান গুরুত্ব পাচ্ছে কোয়ালিটিটেটিভ রিসার্চের প্রেক্ষাপট। মূলধারার ট্রিটমেন্টের পাশাপাশি জীবনকে আগের ছন্দে ফিরাতে ক্রিয়েটিভ থেরাপির জনপ্রিয়তা বাড়ছে। এই পটভূমিতেই বলিষ্ঠ হচ্ছে আর্ট থেরাপির প্রসঙ্গ। ব্যক্তিকে নিজের চেনা পরিসরে রেখে তার ভিতরের সবটুকু ফুটিয়ে তোলার যথাযথ পরিবেশ তৈরি করা হয়। মাধ্যম রং-কাগজ-কলম। চেনা পরিসরের ছোঁয়ায় কাগজে-কলমে ফুটে ওঠে মনের ব্লু-প্রিন্ট। মানসিক অক্ষমতা দূরে ঠেলে বেরিয়ে আসে ভিতরকার মানবিক সত্তা।

কথা। রাগ, জ্বালা, যন্ত্রণা, অভিমান, সবকিছুই প্রকাশ পায় রেখার মাধ্যমে। *"Art therapy is all about expression, not understanding"*, এই নীতিতেই আর্ট থেরাপি বিশ্বাসী। পেন-পেনসিল ছাড়াও ফিঙ্গার পেন্টিং, অর্থাৎ শুধু আঙুল ও রঙের সাহায্যে মনের মতো চিত্রবিন্যাস আর্ট থেরাপির অন্যতম উপাদান। বিভিন্ন মানসিক সমস্যায় ক্যাথারসিস খুবই হেল্পফুল এক প্রসেস, যা আর্ট থেরাপির এক বিশেষ প্রয়োগ। ক্যাথারসিস প্রক্রিয়ায় ব্যক্তির মনের জমে থাকা রাগ, অভিমান রঙের মাধ্যমে রিলিজ় করার চেষ্টা করা হয়। বিশালায়তন ক্যানভাসে চোখ বন্ধ করে রং ছেটানোর পদ্ধতি বেশ প্রচলিত। মনে লুকিয়ে থাকা রাগ, ক্ষোভের সবটুকু দিয়ে ব্যক্তি ক্যানভাস রাঙিয়ে তোলে। ধীরে ধীরে তার হৃদয় শান্ত হয়। সঙ্গে তৈরি হয় তার আত্মবিশ্বাস। রাগ-দুঃখ-হতাশা বদলে যায় সৃষ্টি সুখের উল্লাসে। অনেক ক্ষেত্রেই ছবি অমূলক বা অপ্রাসঙ্গিক হলেও ওই ব্যক্তির কাছে তার গুরুত্ব অপরিসীম। ক্যাথারসিস প্রক্রিয়ার আরও একটি ধরন হল রিল্যাক্সেশন বা নিশ্চিন্ত মনঃসংযোগ। আর্ট থেরাপির ক্ষেত্রে মনঃসংযোগের ধরন সামান্য ভিন্ন। চোখ বন্ধ করে ব্যক্তিকে আঁকিবুকি কাটতে বা স্ক্রিবল করতে বলা হয়। ব্যক্তির হাতের মুভমেন্ট চালিত করবে তার মনকে। আরামদায়ক পরিবেশ তৈরির জন্য অনেক ক্ষেত্রেই হালকা গান বা গানের সুর বাজানো হয়ে থাকে। এভাবে সামান্য আঁকিবুকির মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে তার মানসিক স্থবিরতার জট খুলতে থাকে। শুধুই মানসিক নয়, ডেভেলপমেন্টাল




ডিজ়অর্ডার বা মাসল মুভমেন্টের দীর্ঘ শারীরিক সমস্যার ক্ষেত্রেও বর্তমানে আর্ট থেরাপির প্রভাব আশানুরূপ।

## আর্ট থেরাপির আউটলাইন

মানুষের শরীর, স্বাস্থ্য তথা সার্বিক উন্নয়নে আর্ট থেরাপির সুনির্দিষ্ট কিছু প্রসেস আছে। ব্যক্তিভেদে এই প্রসেস অবশ্যই পরিবর্তনশীল। আর্ট থেরাপিতে সর্বপ্রথম প্রয়োজন ব্যক্তির নিজের সদর্থক ইচ্ছা। সম্পূর্ণ বিষয়টিই নির্ভর করে আছে তিনি কতটা এই প্রসেসে আস্থা রাখছেন, মানসিক দ্বন্দ্ব কাটিয়ে নিজেকে কতটা নিয়োজিত করছেন তার উপর। চিকিৎসক কখনওই এ ব্যাপারে ব্যক্তিকে জোর করেন না, পরামর্শ প্রদান করেন মাত্র। আর্ট থেরাপির বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে মূলত সাইকোলজিক্যাল, স্পিরিচুয়াল বা আধ্যাত্মিক (মেডিটেশন) ও রিক্রিয়েশনাল (রং-পেনসিল, কাগজ-কলমের ব্যবহার), এই তিন ধরন প্রচলিত। আর্ট থেরাপিতে রিক্রিয়েশনাল অর্থাৎ কাগজ, কলম ও রঙের ব্যবহারে ব্যক্তির পূর্ণ মানসিক



*হিরণ মিত্র, চিত্রশিল্পী*

মানুষের মনোজগতে, স্মৃতি নির্মাণও এক ধরনের ক্রিয়া, কাজ। পৃথিবীব্যাপী ছবির সৃষ্টি আমাদের ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। পরিবেশের সঙ্গে মানানসই ছবি ও সুস্থ চেতনাশক্তি মানুষের মন ভাল করে। প্রাচীনকালে সামন্ততন্ত্রে ছবির ব্যবহার হয়েছে সিস্টেমকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। কিন্তু সবটাই হয়েছে বাহ্যিক ও শারীরিক জায়গা থেকে। ছবি ও মানুষ উভয়েরই শরীর, মন আছে। মনের এই জগৎ এখনও তেমন স্বীকৃত নয়। খানিক জটিল হলেও মনের স্থিরতা একসময় ঠিক আসবে। তার বহিঃপ্রকাশ প্রচ্ছন্ন হলেও বহমান। একজনের ছবি অন্যজনের মনের উপর ভিন্নভাবে প্রভাব ফেলতে পারে। সে ক্ষেত্রে অক্ষর এক নিবিড় সংযোগ মাধ্যম। ছবি ও অক্ষর দুইই মানুষের মনকে চিনতে পারে। চিত্রচর্চার দ্বারা একজনের মনের উপর প্রভাব ফেলা। চিকিৎসায় মূলত আর্টের এই বিশেষ দিকটিই ব্যবহার করা হয়। আর্ট সাইকোলজিক্যালি প্রকট। ছবির এই প্রভাব বিস্তার করেই ব্যক্তিকে সুস্থ করা যায়। যদিও সুস্থতা ও অসুস্থতার বেড়াজাল ঠিক কোথায় সেটা স্পষ্ট নয়। মনের শৃঙ্খলা বা বিশৃঙ্খলা সমস্তটাই ব্যক্তি বিশেষে পরিবর্তনশীল। ছবির মাধ্যমে তার সামাজিক স্থিতিশীলতা অনেক ক্ষেত্রেই ফেরানো সম্ভব। রঙের ব্যবহার মানুষমনকে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে। মনোরোগীদের সঙ্গে কাজ করার সুবাদে এই বিষয়টি খুবই কাছ থেকে দেখেছিলাম। বিভিন্ন রঙের প্রতি তাদের আকর্ষণ চোখে পড়ার মতো। কেউ নীল কেউ বা লাল রঙের ব্যবহারে খুশি হয়।
ছবি, অক্ষর, চিহ্ন... এক আশ্চর্য জগৎ। ভিন্ন ধরনের যোগাযোগ। ছবি আমাকে সুস্থ রাখে। মনের স্বাস্থ্য ভাল রাখে। কারণ চিত্র-যাত্রার মধ্যে শরীরে নানা রকম পরিবর্তন ঘটে। নানারকম হরমোনাল পরিবর্তন হয়। একটা হ্যাপি ফিলিং আমার শরীরকে সচল করে তোলে। সেই সজীব শরীর আমার মনের উপর ক্রিয়া করে। এভাবেই বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়। সব কিছুতেই উপলব্ধির একটা প্রত্যক্ষ ভূমিকা আছে। প্রতিটা উপলব্ধি একটা দৃশ্য বোঝাপড়ার দিকে নিয়ে যায়। প্রতিটা বোঝাপড়া নিজের কাছে ফিরে ফিরে আসে। এটা একটা চলমান ক্রিয়া, আমার দৃশ্যের চলমানতা, এই চলমানতার সঙ্গে মিশে যায়। আমি কখনও এই প্রক্রিয়া থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে পারি না।





কোভিড পরবর্তী সময়ে মানুষ মনের সুস্থতার গুরুত্ব অনুধাবন করেছে। আর্ট থেরাপি সেই গতিকে আরও বাড়িয়ে তুলছে।

বিকাশের প্রচেষ্টা করা হয়। পেন্টিং, ফিঙ্গার পেন্টিং (আঙুলের ছাপের মাধ্যমে আঁকা), ডুডলিং (নির্দিষ্ট কিছু আঁকা), স্ক্রিবল করা (আঁকিবুকি কাটা), মনের মতো মাটির মডেল তৈরি করা, খোদাই করে আঁকা বা কার্ভিং, পটারি— ইত্যাদি টেকনিকগুলো বর্তমানে প্রাধান্য পাচ্ছে। আর্ট থেরাপি চলাকালীন প্রধানত দু'ধরনের সেশন বা পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তির স্বাভাবিক মানসিক বিকাশ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হয়। একক সেশন বা গ্রুপ সেশনে থেরাপিস্টের সঙ্গে বসতে পারেন। গ্রুপ সেশনে একটি ছবি চার থেকে পাঁচজন মিলে করা হয়। ছবি তৈরির বিভিন্ন পর্যায়ে একজন ব্যক্তি অন্যজনের সঙ্গে ভাবের আদানপ্রদান ও পারস্পরিক ভারসাম্য বজায় রেখে চলে। ফলত, ছবি তৈরির উদ্যোগে তাদের মধ্যে এক স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা দেখা যায়। ছবি তৈরির সঙ্গে তৈরি হয় তাদের আত্মবিশ্বাস, পারস্পরিক সহযোগিতার অভ্যেস ও নিজেকে লোকসমাজে মেলে ধরার মানসিকতা। অটিজ়ম বা সাইকলজিক্যালি ইনট্রোভার্ট ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অত্যন্ত উপকারী। বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে একক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। রঙের ব্যবহারে তার সামাজিক আত্তীকরণকে বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়। এই রং আসলে তার মনের প্রতিফলন। সিংহভাগ ফলাফলই আশাপ্রদ। কোভিড পরবর্তী সময়ে মানুষ মনের সুস্থতার গুরুত্ব অনুধাবন করেছে। প্রায় দু'বছর চার দেওয়ালের মধ্যে থেকে মানসিক সুস্থতা যে বিঘ্নিত হয়েছে, তা সামাজিক চর্চার অন্যতম বিষয় হয়ে উঠেছে। অটিজ়মে আক্রান্ত শিশুদের ক্ষেত্রে আর্ট থেরাপি খুবই হেল্পফুল। অটিজ়মে আক্রান্ত ব্যক্তির প্রধান সমস্যাই হল সোশ্যাল ইন্ট্রোভার্টনেস ও ডেভেলপমেন্টাল ডিজ়অর্ডার। এই পরিস্থিতিতে আর্ট থেরাপি তাদের সোশ্যাল কমিউনিকেশনের পথ প্রশস্ত করে। Attention Deficit Hyperactivity Disorder(ADHD) বা কম মনঃসংযোগযুক্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে আঁকার সময় 'ডোপামিন' নামক হরমোন ক্ষরণ হয়, যা মনঃসংযোগ বৃদ্ধিতে সহায়ক। সাময়িক আঁকাজোকা যে কোনও ব্যক্তির স্ট্রেস লেভেল কমিয়ে আনতে সাহায্য করে। ডিসলেক্সিয়ায় আক্রান্ত শিশুদের ক্ষেত্রেও আর্ট থেরাপি উপকারী।

## শিশুদের ক্ষেত্রে কোন কোন পরিস্থিতিতে আর্ট থেরাপি সহায়ক:

- কোনও বিপজ্জনক ঘটনায় যদি বাকশক্তি সাময়িকভাবে হারিয়ে যায়।
- অটিজ়মে আক্রান্ত শিশুর ক্ষেত্রে প্যারালাল ট্রিটমেন্ট হিসাবে।
- বিশেষ কোনও কারণে মুখচোরা হওয়া, চরিত্রগত অস্বাভাবিকতা, একরোখা, বহির্জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ তৈরি করতে না পারা বা মনের ভাব প্রকাশে সমস্যা।
- বিশেষভাবে সক্ষম, মানসিকভাবে বদ্ধ শিশুদের জন্য।
- অতীতের কোনও ঘটনার গভীর আঘাতে সাময়িক স্মৃতিশক্তি হ্রাস বা মেন্টাল স্ট্রেস তৈরি হয়ে যাওয়া।

*(উল্লিখিত সকল বিষয়েই চিকিৎসকের পরামর্শ আবশ্যক)*

আর্ট থেরাপি নিয়ে চর্চা বাড়ছে। খুব ধীরে হলেও ক্রিয়েটিভ থেরাপির উপর মানুষের আস্থা জন্মাচ্ছে। দীর্ঘ লকডাউনে গৃহবন্দি মস্তিষ্ক আবার খুলছে তার বন্ধ দরজার আগল। চিকিৎসক মহলে আরও বেশি করে গুরুত্ব পাচ্ছে ক্রিয়েটিভ থেরাপির প্রয়োগ ও উপযোগিতা। মনে রাখা প্রয়োজন, যে কোনও 'এক্সপ্রেসিভ থেরাপি' কখনই পদ্ধতিগত ফার্মাকোথেরপির বিকল্প নয়। সহযোগী ক্ষেত্র মাত্র। ব্যক্তির জীবনযাত্রার গুণমান ফিরিয়ে আনতে ক্রিয়েটিভ আর্ট থেরাপি নতুন নতুন নজির সৃষ্টি করছে। গত ১০ই অক্টোবর আমরা পেরিয়ে এলাম আরও একটা 'বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস'। উদ্‌যাপনের হিড়িক চোখে পড়ার মতো; কিন্তু সামাজিক সচেতনতা বাড়ছে কী?

**যোগাযোগ:** ৯৮৩০১৭২৭২৮

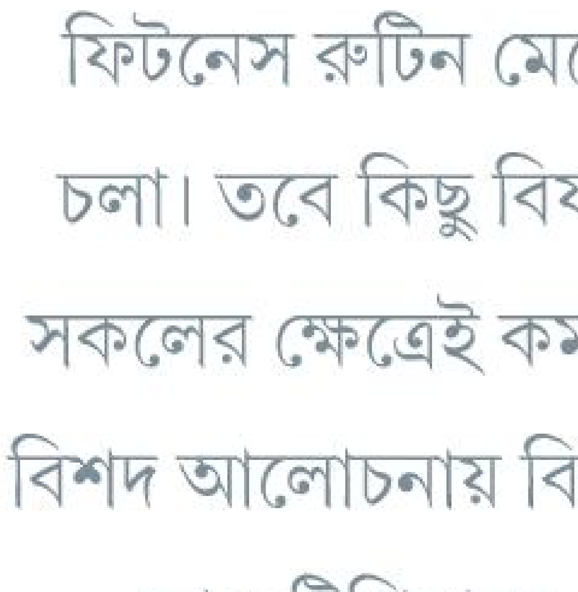
**ছবি:** আইস্টক



ওজন কমাতে প্রত্যেকের প্রয়োজন তার শরীরের উপযুক্ত ডায়েট এবং ফিটনেস রুটিন মেনে চলা। তবে কিছু বিষয় সকলের ক্ষেত্রেই কমন। বিশদ আলোচনায় বিশিষ্ট ডায়েটিশিয়ান।

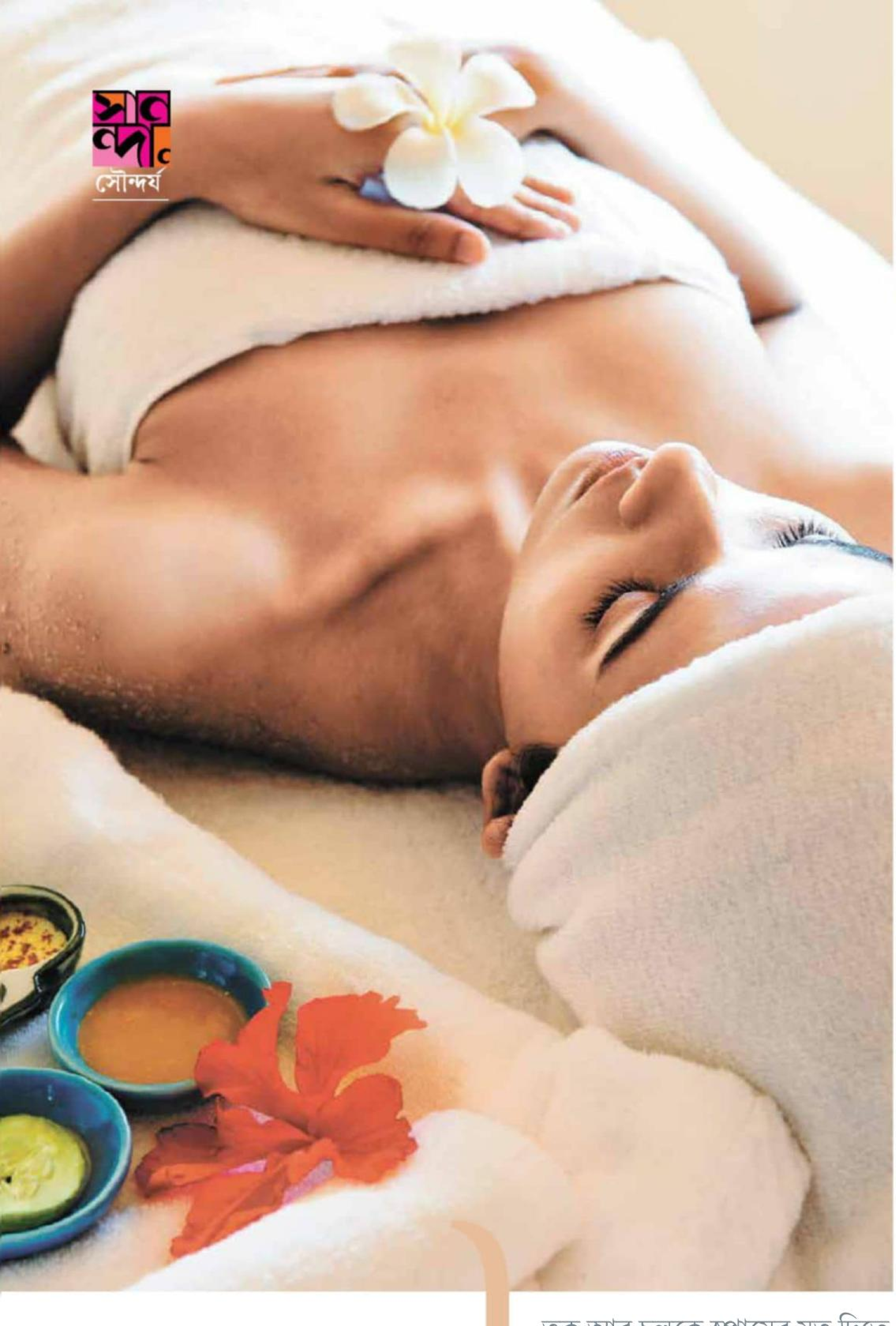
# ওয়েট লসের মূলমন্ত্র

খাওয়াদাওয়া নিয়ে নানা মুনির নানা মত। তার মধ্যে কোনটা ঠিক আর কোনটা নয়, তা নিয়ে যুক্তি-তর্কের অন্ত নেই। অনেক ক্ষেত্রে আবার জানা তথ্যও জিভের তোয়াজ করতে গিয়ে বা স্রেফ অলসতার জন্য ভুলে যান অনেকে। অথচ কী জানেন, ডায়েট তথা ভাল থাকা কিন্তু কষ্টসাধ্য কোনও কাজ নয়। এর কোনও ম্যাজিক ফর্মুলাও নেই। পুরোটাই দাঁড়িয়ে রয়েছে কতগুলো ছোট ছোট অভ্যেসের উপর ভর করে। সুস্বাস্থ্য পেতে এই ছোটখাট দিকগুলো নিয়েই সচেতন হতে হবে। লেটেস্ট ডায়েট ক্রেজ় দেখে স্রোতে গা ভাসালে সাময়িক লক্ষ্যপূরণ হলেও হতে পারে, তবে সেই ফলাফল দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা কমই। ফলে প্রিয় সেলেব্রিটির ডায়েট মন্ত্র গুলে খেয়ে বা ফ্যাড ডায়েট, ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং-এর মতো 'ট্রেন্ড' চোখ বুজে বিশ্বাস না করে, ব্যালান্সড খাওয়াদাওয়াকে গুরুত্ব দিন। ওজন কমাতে স্বাস্থ্যকর, সুষম, ব্যালান্সড ডায়েটের বিকল্প নেই। সঙ্গে ক্যালরি কাউন্ট রাখুন, যাতে শরীরে অতিরিক্ত ক্যালরি জমতে না পারে। তবে প্রয়োজনীয় ভিটামিন বা মিনারেলের চাহিদা মেটাতে সাপ্লিমেন্টের উপর নির্ভর করে থাকবেন না যেন। মনে রাখবেন, সাপ্লিমেন্টের কাজ শুধু পুষ্টির অভাব মেটানো, খাবারের চাহিদা পূরণ করা নয়। ফলে বাজার-চলতি 'মিল রিপ্লেসার'-এ পয়সা না ঢেলে যথাযথ খাবার খান। এতে শরীরের দরকারি সব পুষ্টি উপাদানের চাহিদাও মিটবে, যা যে কোনও সাপ্লিমেন্টের চেয়ে ভাল। ওজন কমানোর প্রসঙ্গে হাইড্রেটেড থাকার প্রতি অতটাও গুরুত্ব আরোপ করা হয় না সাধারণত। অথচ পর্যাপ্ত পরিমাণে জল খাওয়া যে কতভাবে ওজন কমাতে সাহায্য করে, তা গুণে শেষ করা যাবে না। তা ছাড়া এতে ত্বক ভাল থাকে, ডিটক্সিফিকেশন হয়, দীর্ঘদিন শরীর সতেজ থাকে। ফলে দিনে অন্তত ১০ গ্লাস ফ্লুইড ইনটেক করতে চেষ্টা করুন। পাশাপাশি প্রয়োজন শরীরচর্চার। পুষ্টির অর্থ শুধু খাবার নয়, বরং শরীর কীভাবে সেই খাবার ব্যবহার করছে এবং কতটা ব্যবহার করছে, তাও সুস্থ থাকার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে। পর্যাপ্ত শারীরিক পরিশ্রম ছাড়া যাই খান, তা শরীর মেটাবলাইজ় করতে পারে না ঠিকমতো। ফলে জোর পায়ে হাঁটা, স্পট মার্চিং, খেলাধুলো, সাঁতার বা নাচ, কিছু একটা রোজকার রুটিনের অঙ্গ করে তুলুন। এর পাশাপাশি সিম্পল সুগারের পরিবর্তে কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট খাওয়া, ডায়েটে টাটকা ফল, সবজি, বাদাম, লিন প্রোটিন, ফাইবার রাখা তো রয়েইছে। এসবই যদি করেন, তাহলে ওজন কমা শুধু সময়ের অপেক্ষামাত্র!



ডা. অঞ্জলি মুখোপাধ্যায়
নিউট্রিশনিস্ট, ফাউন্ডার-ডিরেক্টর হেলথ টোটাল (মুম্বই, পুণে, নাসিক, বেঙ্গালুরু)। ওবিসিটি ও হেলথ ডিজ়অর্ডার স্পেশ্যালিস্ট। যোগাযোগ: ১৮০০ ২৬৬ ০৬০৭/ ০২২ ৬৭২ ৬৬৮৮৮
আরও জানতে দেখুন
www.health-total.com





# বাড়িতেই স্পা-চর্চা

ত্বক আর চুলকে স্পায়ের যত্ন দিতে হলে পকেটের উপরও চাপ দিতে হবে, তার কোনও মানে নেই! ঘরোয়া উপায়েও একই রকম ফলাফল পেতে পারেন। পরামর্শ রইল এবারের পাতায়।



পুজোর ক'দিন বিস্তর ধকল পড়েছে শরীরের উপর। রাতদিন এক করে প্যান্ডেল হপিং করেছেন, সাজগোজ চলেছে প্রতিনিয়ত, আর সঙ্গে পেটপুজো তো ছিলই! এত কিছুর মাঝে বাদ পড়েছে ঘুম আর শরীরের যত্ন। না নিজেকে বিশ্রাম দিয়েছেন, না ত্বক-চুলকে। কিন্তু এখানেই তো শেষ নয়। এহেন দিন এখনও ঢের বাকি। উৎসবের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হওয়ার আগে হাতে যে ক'টাদিন সময় রয়েছে, তা ঠিকমতো খরচ করলে অবশ্য চুল আর ত্বকের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না পরে। সময় এবং সাধ্য থাকলে চটজলদি একবার ঢুঁ মেরে আসতেই পারেন পছন্দের সালঁতে। তবে যাঁদের পক্ষে তা সম্ভব নয়, এই প্রতিবেদন বিশেষভাবে তাঁদের জন্য। অস্বীকার করার উপায়ও নেই যে, সব সময় ইচ্ছে থাকলেও সালঁর বিলাসবহুল যত্ন নেওয়া সম্ভব হয় না। উৎসবের মরসুমে তো আরওই। তাই ঘরোয়া যত্নের উপর ভরসা করতেই হয়। তার মানে অবশ্য এই নয় যে, বাড়িতে করা স্পা-তে তেমন উপকার পাবেন না বা মনের মতো ফল মিলবে না। সালঁর মতো প্রফেশনাল রেজ়াল্ট না পেতে পারেন, কিন্তু ত্বক আর চুলে বদলটা পরিষ্কার চোখে পড়বে, তা নিশ্চিত। তাই আর সাতপাঁচ না ভেবে, ঘরোয়া স্পায়ের জোগাড়যন্ত্রেই লেগে পড়ুন। খুব জটিল আয়োজনের প্রয়োজন নেই। হাতের কাছে মজুত রয়েছে, এমন সামগ্রী দিয়েই সেরে ফেলতে পারেন স্পা-চর্চা।

## বডি অ্যান্ড ফেশিয়াল স্পা

বাড়িতেই স্পা করবেন, সেই অবধি তো সব ঠিক আছে। কিন্তু সালঁর মতো লাগজুরিয়াস স্পা কি আর ঘরে বসে করা সম্ভব? এই প্রশ্নটা যাঁদের মনে ঘুরছে, তাঁরা শুনে খুশি হবেন, এমনটা সত্যিই সম্ভব। প্রয়োজন শুধু কিছু চেনা

অ্যারোম্যাটিক হার্বস আর সাধারণ উপকরণ। আর দরকার দশ মিনিট সময়। দিনের যে কোনও সময় এইটুকু সময় হাতে রাখুন। তবে যেহেতু স্কিন স্পা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, তাই স্নানের আগের সময়টাই আদর্শ। ত্বক যেহেতু আমাদের শরীরের সবচেয়ে বৃহৎ অঙ্গ, তাই স্নানের আগে যেভাবে ত্বকের যত্ন নেওয়া সম্ভব বা বলা ভাল, যত সহজে যত্ন নেওয়া সম্ভব, অন্যান্য সময় তা সম্ভব নয়। পুরো শরীর জুড়েই যেহেতু প্যাক বা স্ক্রাবের ব্যবহার করবেন, তাই তারপর স্নান করাও অনেকক্ষেত্রে জরুরি। তাই চেষ্টা করুন, অন্তত ফুল বডি স্পায়ের ক্ষেত্রে স্নানের আগে মিনিটদশেক সময় হাতে রাখতে। ফেশিয়াল স্ক্রাব যখন ইচ্ছে করতে পারেন।

**কিউকাম্বার মিন্ট সুগার বডিস্ক্রাব:** শসার আর্দ্রতার সঙ্গে পুদিনার সতেজতা... ত্বকের ভোল বদল করতে এর চেয়ে উপযুক্ত উপকরণ আর কী হতে পারে! ত্বককে শান্ত করার পাশাপাশি মৃত কোষের পরত সরাতেও কার্যকরী এই স্ক্রাব। আর এর সঙ্গেই যদি মিশিয়ে নেন অল্প নারকেল তেল, তাহলে মখমলের মতো মসৃণতাও পাবেন আর লাবণ্যও। ১/৩ কাপ শসাবাটার সঙ্গে সমপরিমাণ পুদিনাপাতাবাটা এবং ২/৩ কাপ চিনি মেশান। এতে ২ চা-চামচ নারকেল তেল মিশিয়ে এয়ারটাইট জারে ভরে ফ্রিজে স্টোর করে রাখুন। এক সপ্তাহ ভাল থাকবে এই স্ক্রাব। যখন ব্যবহার করতে চান, তার খানিকক্ষণ আগে ফ্রিজ থেকে বের করে ঘরের তাপমাত্রায় নিয়ে আসুন। মিনিটদশেক ভালমতো শরীর স্ক্রাব করে স্নান করে নিন।

**হানি-অ্যাভোকাডো ফেস মাস্ক:** এই ঘরোয়া ফেস মাস্ক ত্বক পরিষ্কার করবে গভীর থেকে, পাশাপাশি ত্বকের পিএইচ লেভেল ব্যালান্স করবে এবং উজ্জ্বলতাও আনবে। সব ধরনের ত্বকের জন্যই এই মাস্ক উপকারী। ১/৪ কাপ পাকা অ্যাভোকাডোর ক্বাথ বের করে তাতে ২ টেবলচামচ খাঁটি মধু এবং আধ চা-চামচ অ্যাপল সাইডার ভিনিগার মেশান। সবটা ভালভাবে মেশান, চাইলে ব্লেন্ডারে ঘুরিয়ে নিতে পারেন একবার। পরিষ্কার ভিজে ত্বকে পাতলা এবং সমান করে এই মাস্ক লাগান। শুকিয়ে গেলে সাধারণ জল দিয়ে ধুয়ে ময়শ্চারাইজ়ার লাগান। যদি ত্বক তৈলাক্ত প্রকৃতির হয়, সেক্ষেত্রে দ্বিতীয়বার ময়শ্চারাইজ় না করলেও চলবে। সপ্তাহে অন্তত দু'বার ব্যবহার করুন।

**ল্যাভেন্ডার টোনিং মিস্ট:** ল্যাভেন্ডারের সুগন্ধে শরীরের ক্লান্তি দূর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ত্বকও রিফ্রেশড হয়ে উঠবে নিমেষে। স্ক্রাবিং বা মাস্কের পর ত্বককে টোন করতে এই মিস্ট ভীষণ উপকারী। শুধু মুখে নয়, পুরো শরীরে ব্যবহারের উপযোগী। দেড় কাপ ফুটন্ত জলে দেড় চা-চামচ শুকনো ল্যাভেন্ডারের কুড়ি দিয়ে ১৫ মিনিট ঢেকে রেখে দিন। তারপর জলটা ছেঁকে ঠান্ডা করে তাতে ১ চা-চামচ অ্যাপল সাইডার ভিনিগার মেশান। মিশ্রণটা একটা স্প্রে বোতলে ভরে রেখে দিতে পারেন সপ্তাহখানেক। প্রয়োজনমতো পরিষ্কার ত্বকে স্প্রে করে নিন। ময়শ্চারাইজ়ার ব্যবহার করার আগে এই মিস্ট ব্যবহার করলে বেশি ভাল ফল পাবেন।

পুরো শরীরজুড়ে প্যাক বা স্ক্রাব ব্যবহার করার পরে অনেকক্ষেত্রেই স্নান করা জরুরি। তাই চেষ্টা করুন, অন্তত ফুল বডি স্পায়ের ক্ষেত্রে স্নানের আগে মিনিটদশেক সময় হাতে রাখতে। ফেশিয়াল স্ক্রাব যখন খুশি করতে পারেন।





শসা ও পুদিনাপাতার স্ক্রাব ত্বকের মৃতকোষ দূর করতেও কার্যকরী।



> ওটস দিয়েও বডিস্ক্রাব তৈরি করে ফেলতে পারেন বাড়িতেই। গুঁড়ো করে নেওয়া ওটসের সঙ্গে গোলাপের শুকনো পাপড়িগুঁড়ো মিশিয়ে বানিয়ে নিন এটি।

**রোজ় ওটমিল মিল্ক বাথ:** ত্বকের ইরিটেশন বা লালচেভাব কমাতে, অশুদ্ধি দূর করতে এবং র‍্যাশের নিরাময়ে ম্যাজিকের মতো কাজ করে ওটস। আর স্ক্রাব হিসেবে বা মাস্কে ওটসের কার্যকারিতার কথা তো সকলেই জানেন। সেই ওটসের পুষ্টি যদি গোটা শরীর পায়, তাহলে বডি স্পায়ের মতো এফেক্ট পাবেন, তা নিশ্চিত। এক্ষেত্রে অবশ্য ওটস গুঁড়ো করে নিতে হবে। সঙ্গে লাগবে আর-একটি অতিপরিচিত উপাদান— গোলাপের শুকনো পাপড়ি। মোটামুটি ১ কাপ ওটসের সঙ্গে ১ কাপ গোলাপের শুকনো পাপড়ি একসঙ্গে গুঁড়ো করে নিন। প্রতিবার স্নানের জলে মোটামুটি ৩/৪ কাপ এই মিশ্রণ মিশিয়ে নিন। ওটস ত্বককে পরিষ্কার এবং নারিশ করবে, আর গোলাপের পাপড়ি অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটারি এবং অ্যান্টি-সেপ্টিক উপাদান হিসেবে কাজ করবে। এয়ারটাইট কন্টেনারে ভরে স্টোরও করে রাখতে পারেন এই মিশ্রণ। প্রায় ছ'মাস পর্যন্ত ভাল থাকবে।

## হেয়ার স্পা

ঝলমলে, মসৃণ, নরম চুল পেতে হেয়ার স্পায়ের উপর ভরসা করেন অনেকেই। চটজলদি চুলের স্বাস্থ্য ফেরানোর এত সহজ উপায় সত্যিই আর নেই। তবে যদি সালঁ যাওয়ার সময় না পান বা বাজেটের সমস্যা থাকে, সেক্ষেত্রে বাড়িতেও স্পা করে নেওয়া সম্ভব। হেয়ার স্পা-এর মূলত চারটে ভাগ। অয়েল মাসাজ, স্টিম, ক্লেনজ়িং এবং ট্রিটমেন্ট। এর মধ্যে স্টিমিং সবার ক্ষেত্রেই একরকম, তবে চুলের ধরন এবং অবস্থা অনুযায়ী অয়েল মাসাজ, ক্লেনজ়ার এবং ট্রিটমেন্ট বেছে নিতে হবে। ঠিকঠাক উপকরণ ব্যবহার করলে রুক্ষতা আর নির্জীবতার সঙ্গে সঙ্গে খুসকি, চুল পড়া, ডগা চেরার মতো অনেক সমস্যা থেকেও রেহাই পাবেন।

- প্রথমে চুল আঁচড়ে নিয়ে চুলের ধরন বুঝে হোহোবা, আমন্ড, নারকেল তেল বা অলিভ অয়েল স্ক্যাল্পে মাসাজ করতে হবে অন্তত মিনিটদশেক। যদি পাতলা চুল হয় বা অত্যধিক চুল পড়ার সমস্যা থাকে, সেক্ষেত্রে স্রেফ চুলে এবং স্ক্যাল্পে তেল মালিশ করে ছেড়ে দিন। মাসাজ করবেন না।
- এরপর চুলে গরম ভাপ দিন। গরম জলে তোয়ালে ডুবিয়ে জল নিংড়ে চুলে জড়িয়ে রাখতে পারেন। অথবা একটু উঁচু টুলের উপর



ত্বক শান্ত করতে এবং টোনড রাখতে সাহায্য করবে ল্যাভেন্ডার টোনিং মিস্ট।



গরম জলে শ্যাম্পু মিশিয়ে তাতে নখ ডুবিয়ে রাখুন পরিষ্কার করার জন্য।



চুল পরিষ্কার করে অ্যাভোকাডো, টক দই বা মধুর দিয়ে বানানো মাস্ক লাগান।

বসে মাথা হেলিয়ে ধোঁয়া ওঠা জলের পাত্রের উপর রেখে তোয়ালে দিয়ে ঢেকে দিন। খেয়াল রাখবেন, যেন বাষ্প তোয়ালের বাইরে বেরিয়ে না যায় বা চুল সরাসরি জলের সংস্পর্শে না আসে। অন্তত ১০-১৫ মিনিট এভাবে স্টিম নেওয়ার পর চুল ধুয়ে ফেলুন।

● মাইল্ড শ্যাম্পু দিয়ে স্ক্যাল্প ভালভাবে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিন। এরপর আবার শ্যাম্পু নিয়ে হেয়ার শ্যাফ্টে লাগান। ২ মিনিট রেখে ধুয়ে নিন। শেষে কন্ডিশনার লাগান চুলের ডগায়। যত বেশি সময় রাখতে পারেন, ততই ভাল। তবে ভুলেও চুলের গোড়ায় বা স্ক্যাল্পে কন্ডিশনার লাগাবেন না, চুল পড়া বাড়বে তাতে।

● চুল পরিষ্কার করে নেওয়ার পর ভিজে অবস্থাতেই ট্রিটমেন্ট লাগান। সমস্যা এবং চুলের ধরন বুঝে উপাদান বেছে নিন। শুষ্ক চুলে দেড় টেবলচামচ অ্যাপল সাইডার ভিনিগারে ২ টেবলচামচ মধু এবং ১ চা-চামচ অলিভ অয়েল মিশিয়ে পুরো স্ক্যাল্পে ও চুলে লাগান। ১০ -১৫ মিনিট রেখে শ্যাম্পু করে নিন। অথবা একটা অ্যাভোকাডো চটকে তাতে পরিমাণমতো মধু মিশিয়ে পুরো চুলে লাগিয়ে রাখুন ১৫ মিনিট। তারপর ধুয়ে নিন। অ্যাভোকাডোর পরিবর্তে পাকা কলা চটকেও ব্যবহার করতে পারেন। তৈলাক্ত চুলের জন্য বিয়ার খুব উপকারী। শ্যাম্পু করার পর শেষবার চুল ধুতে এক ক্যান বিয়ার ব্যবহার করতে পারেন। চুল নিমেষে নরম হবে। খুসকির সমস্যা থাকলে ৭-৮টা স্ট্রবেরি থেঁতো করে তাতে কয়েক ফোঁটা পেপারমিন্ট বা টি-ট্রি অয়েল মিশিয়ে চুলে ও স্ক্যাল্পে লাগিয়ে রাখুন আধঘণ্টা। তারপর ধুয়ে নিন। এর বাইরে প্রোটিন প্যাক হিসেবে ডিমের সাদা (তৈলাক্ত চুল), টক দই (শুষ্ক চুল), দুধ (স্বাভাবিক চুল) ইত্যাদিও ব্যবহার করতে পারেন। আর ট্রিটমেন্ট ব্যবহারের পর চুল ধুয়ে হাওয়ায় শুকোতে চেষ্টা করুন। অবশ্যই পরে সেরাম ব্যবহার করবেন, না হলে ফল দীর্ঘস্থায়ী হবে না।





## হ্যান্ড অ্যান্ড ফুট স্পা

শুধু ত্বক আর চুলের দিকেই তাকালে তো চলবে না, হাত-পায়েরও সমান যত্ন নিতে হবে। আর বাড়িতে হ্যান্ড অ্যান্ড ফুট স্পা করাও বেশ সহজ। চেনা কয়েকটা উপকরণ হাতে থাকলেই সালোঁর মতো ফল পাওয়া যায়। একটা ছোট বালতি বা ডেকচিতে খানিকটা গরম জল নিয়ে তাতে এপসম সল্ট এবং মাইল্ড শ্যাম্পু মিশিয়ে নিন। পুরনো নেলপলিশ তুলে হাত-পা ডুবিয়ে রাখুন তাতে। মিনিটদশেক পর নরম ব্রাশ দিয়ে ভালভাবে নখ ঘষে নিন। এরপর পছন্দের স্ক্রাব ভালভাবে মাসাজ করে ধুয়ে ময়শ্চারাইজ় করে নিন। যদি ম্যানিকিওর বা পেডিকিওর করতে চান, সেক্ষেত্রে নেলপলিশ তোলার পরই নখ শেপ করে কেটে ফাইল করে নিন। কিউটিকল অয়েল ব্যবহার করতে পারেন, যদি শুষ্কতার সমস্যা থাকে। কয়েকটি হ্যান্ড এবং ফুট স্ক্রাব এবং হোমমেড ময়শ্চারাইজ়ারের রেসিপি রইল। পছন্দমতো বেছে নিতে পারেন।

**হিমালয়ান ফুট স্ক্রাব:** ৫ টেবলচামচ হিমালয়ান সল্ট, ১০ চা-চামচ মতো নারকেল তেল, ১ চা-চামচ বেকিং সোডা এবং কয়েক ফোঁটা পছন্দের এসেনশিয়াল অয়েল একসঙ্গে মিশিয়ে রেখে দিন। অল্প করে নিয়ে পায়ের পাতায় স্ক্রাব করুন। হাতেও ব্যবহার করতে পারেন এই স্ক্রাব। মিনিটপাঁচেক ঘষে ধুয়ে নিন। ত্বক পরিষ্কার এবং ডিটক্স করতে সাহায্য করবে এই স্ক্রাব।

**লেমন অ্যান্ড সুগার স্ক্রাব:** ১ টেবলচামচ পাতিলেবুর রস, ৩/৪ কাপ চিনি এবং ১/৪ কাপ ভার্জিন অলিভ অয়েল একসঙ্গে মিশিয়ে হাত এবং পা স্ক্রাব করতে পারেন। ত্বক উজ্জ্বল করতে বিশেষভাবে কার্যকরী এই স্ক্রাব।



**কফি হ্যান্ড অ্যান্ড ফুট স্ক্রাব:** ১ টেবলচামচ করে কফি, মধু, দারচিনিগুঁড়ো, এপসম সল্ট এবং নারকেল তেল একসঙ্গে মিশিয়ে রাখুন। শুষ্কতা এবং পিগমেন্টেশনের সমস্যায় কাজে দেবে।

**হ্যান্ড অ্যান্ড ফুট রিপেয়ার স্যাল্ভ:** আধকাপ করে নারকেল তেল, রোজ়মেরি, পুদিনাপাতা এবং কোকো বাটার একসঙ্গে গরম করে মিশিয়ে নিন। খুব অল্প আঁচে গরম করবেন। ১০ মিনিট রেখে ছেঁকে নিন। ময়শ্চারাইজ়ার হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন এই মিশ্রণ। শুষ্কতা ধারেকাছে ঘেঁষবে না আর।

না অতিরিক্ত সময় প্রয়োজন, না বাহারি উপকরণ। তাই সালোঁর পরিবর্তে একবার বাড়িতেই স্পা-সেশনের আয়োজন করে দেখুন। নিরাশ হবেন না!



# ভিটামিন ডি চাই-ই!

শুধু মেয়েদের না, বয়স নির্বিশেষে সব মানুষের। ভিটামিন ডি-র উপকারিতা বুঝিয়ে বললেন সিনিয়র রেজিস্টার্ড ডায়েটিশিয়ান অর্পিতা ঘোষ দেব। শুনলেন সংবেত্তা চক্রবর্তী।

ওটিটি-র দৌলতে টিভি আজকাল কম দেখা হয় ঠিকই। কিন্তু যাঁরা এখনও টিভি খুলে বসেন, 'মেয়েদের ভিটামিন ডি খুব দরকার'— এই মর্মে বিভিন্ন প্রডাক্টের বিজ্ঞাপন তাঁরা দেখেছেনই। মেয়েদের কথাই কেন বারবার ওঠে বিশেষ এই ভিটামিন নিয়ে আলোচনা করতে গেলে? বাকিদের বুঝি সুস্থ থাকার জন্য ভিটামিন ডি-র প্রয়োজন পড়ে না? তেমন কিন্তু নয় ব্যাপারটা। সব মানুষেরই ভিটামিন ডি দরকার। হয়তো বিশেষ কিছু কারণে মেয়েদের প্রয়োজনটা একটু বেশি গুরুত্ব পায়। ভিটামিন ডি-র প্রয়োজনীয়তা, কী ধরনের খাবার খেলে তা সহজেই মেলে... সব নিয়েই আজ কথা বলব আমরা।

## সানশাইন ভিটামিন

ভিটামিন ডি-র আর এক নাম। কারণ, মানুষের শরীরে ৮০ শতাংশ ভিটামিন ডি ঢোকে সূর্যের আলট্রা-ভায়োলেট বি রশ্মি থেকে। বাকি ২০ শতাংশ পাওয়া যায় সঠিক খাবার খেলে। তবে সূর্যরশ্মি থেকে ভিটামিন ডি মেলে মানেই তার কনভারশন পুরোপুরি ত্বকে আলো পড়ে হয়, এমন নয়। ত্বক, তারপর যকৃৎ বা লিভার, শেষে কিডনি— এই তিন জায়গায় একাধিক কনভারশনের ধাপ পেরিয়ে তৈরি হয় ক্যালসিট্রায়ল (calcitriol), যা হল সবচেয়ে



‘অ্যাকটিভ ফর্ম অফ ভিটামিন ডি’। কিডনিতে এই যে কনভারশন হচ্ছে, এটাকে আবার নিয়ন্ত্রণ করে একাধিক ফ্যাক্টর— যথা, প্যারাথাইরয়েড হরমোন লেভেল, সেরাম ক্যালশিয়াম ও ফসফরাস লেভেল। এতগুলো ভারী ভারী কথা বলার উদ্দেশ্য একটাই জিনিস বোঝানো— যে সানশাইন ভিটামিন তৈরির কাজ শুধুমাত্র ত্বকের নয়। শরীরের একাধিক অঙ্গ হাতে হাতে মিলিয়ে সে কাজ করে।

## সকলেরই প্রয়োজন

ভিটামিন ডি আদতে ক্যালশিয়াম অ্যাবসর্পশন এবং বোন হেল্‌থ বৃদ্ধি করে, বজায়ও রাখে। এবার ক্যালশিয়ামের প্রয়োজন বা হাড়ের স্বাস্থ্য ভাল রাখার দরকার তো জেন্ডার ও বয়স-নির্বিশেষে সকলেরই! তাই ভিটামিন ডি-ও সকলেরই চাই। তবে মহিলাদের শরীরে ভিটামিন ডি-র অভাব

মহিলাদের শরীরে ভিটামিন ডি-র অভাব হলে অস্টিওপোরোসিস নামে হাড়ের এক ধরনের রোগের আশঙ্কা থাকে, যা তাঁদের কর্মক্ষমতাকে কার্যত তলানিতে নামিয়ে আনতে পারে। ক্লান্তি, শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ব্যথা, হতে পারে সবই।

হলে বেশ কিছু সমস্যার আশঙ্কা তৈরি হয়। যেমন, অস্টিওপোরোসিস নামে হাড়ের এক ধরনের রোগ, যা তাঁদের কর্মক্ষমতাকে কার্যত তলানিতে নামিয়ে আনতে পারে। ক্লান্তি, শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ব্যথা, হতে পারে সবই। এ ছাড়াও আরও নানা সমস্যা শরীরে বাসা বাঁধতে পারে এর ফলে। যেমন সন্তানধারণে অক্ষমতা, ওবেসিটি, পিসিওএস পেশেন্টদের ক্ষেত্রে ইনসুলিন রেজ়িস্ট্যান্স, অটো-ইমিউন ডিজ়িজ় (যেমন রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস), ইনফ্ল্যামেটরি বাওয়েল ডিজ়িজ়, উচ্চ রক্তচাপ, হার্টের সমস্যা, নানা ধরনের সংক্রমণ— এমনকী ক্যানসার বা মাল্টিপল স্ক্লেরোসিসের মতো সমস্যাও। সুতরাং মহিলাদের যে ভিটামিন ডি অত্যন্ত প্রয়োজন, সে কথাকে অস্বীকার করার কোনও জায়গাই নেই।



ভিটামিন ডি কার কতটা প্রয়োজন, তার রূপরেখা হল:

একেবারে শিশু (০ থেকে ১২ মাস)- ১০ মাইক্রোগ্রাম (৪০০ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট)

বাচ্চা এবং টিনএজার- ১৫ মাইক্রোগ্রাম (৬০০ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট)

১৮ থেকে ৭০ বছর বয়সিরা- ১৫ মাইক্রোগ্রাম (৬০০ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট)

৭০ বছরের বেশি বয়স্করা- ২০ মাইক্রোগ্রাম (৮০০ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট)

অন্তঃসত্তা এবং যাঁরা ব্রেস্টফিড করাচ্ছেন- ১৫ মাইক্রোগ্রাম (৬০০ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট)

এর থেকেই প্রমাণিত যে শুধু মহিলা নয়, সকলেরই ভাল থাকার জন্য ভিটামিন ডি অত্যন্ত প্রয়োজন। আর যে বাচ্চারা ব্রেস্টফিড করছে, তাদের ভিটামিন ডি সাপ্লিমেন্ট খাওয়া প্রয়োজন। কারণ ব্রেস্টমিল্কে ভিটামিন ডি প্রয়োজনীয় পরিমাণের চেয়ে কম থাকে।

## কেন হয় ঘাটতি?

ভিটামিন ডি-র ঘাটতি হওয়ার একাধিক কারণ রয়েছে। স্কিন সিন্থেসিস কমে যেতে পারে, সানস্ক্রিনের ব্যবহার, ডার্কার স্কিন পিগমিন্টেশন, সঠিক সময়ে সূর্যের আলোয় স্কিন এক্সপোজ়ার





না হওয়া, গ্রাফটেড স্কিন ইত্যাদি ছাড়া বয়সজনিত কারণেও। সেলিয়াক ডিজ়িজ় বা গ্যাসট্রিক বাইপাস সার্জারির মতো প্রোসিডিওরের কারণেও ত্বকে অ্যাবজ়র্পশন কমে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। অতিরিক্ত স্থূলতার ফলেও ভিটামিন ডি-র ঘাটতি তৈরি হতে পারে। কারণ ফ্যাট-সলিউবল এই ভিটামিন, ফ্যাট সেল্‌স অথবা টিসুতে আটকে যায়। অ্যান্টিকনভালস্যান্ট, গ্লুকোট্রয়েড (স্টেরয়েড হরমোন, যা ইনফ্ল্যামেশন, অটো-ইমিউন ডিজ়িজ় ও ক্যানসারের চিকিৎসায় কাজে লাগে), এইচআইভি মেডিকেশন— এগুলোও ভিটামিন-র ব্রেকডাউন ঘটিয়ে, তাকে ইনঅ্যাকটিভ ফর্মে এনে ফেলে। এ ছাড়া কারও যদি কোনও কিডনি বা লিভার ডিজ়িজ় হয়, তা হলে তারও ভিটামিন ডি সিন্থেসিস ব্যাহত হয়। অন্তঃসত্ত্বাদের ক্ষেত্রে প্রি-এক্ল্যাম্পশিয়া (এক ধরনের হাইপারটেনশন ডিসঅর্ডার যা প্রেগন্যান্সির সময় হতে পারে), জেস্‌টেশনাল ডায়াবিটিস, অ্যাংজ়াইটি এবং ডিপ্রেশনের ফলে ভিটামিন ডি-র মাত্রা কম হয়ে পড়তে পারে।

## তার মানেই কি সাপ্লিমেন্ট?

একেবারেই নয়। ভিটামিন ডি বাইরে থেকে, সাপ্লিমেন্ট নিয়ে শরীরে ঢোকানোর প্রয়োজন রয়েছে কি না, তা বলে দেবে ব্লাড কাউন্ট। ৩০এমজি/এমএল হলে, তা সাফিশিয়েন্ট। ২১-২৯ এমজি/এমএল-এর ক্ষেত্রে ইনসাফিশিয়েন্সি রয়েছে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞেরা। আর যাঁর রক্তপরীক্ষার রিপোর্ট ২০ এমজি/এমএল-এর কম আসবে, তিনি ভিটামিন ডি ডেফিশিয়েন্সিতে ভুগছেন। ভিটামিন ডি আদতে ফ্যাট-সলিউবল ভিটামিন, যা লিভারে জমা হয়ে থাকে। কেউ যদি রক্তপরীক্ষা না করিয়েই ভিটামিন ডি সাপ্লিমেন্ট নিতে থাকেন, তা হলে তা বাড়তে বাড়তে টক্সিসিটির পর্যায়ে পৌঁছে যেতে পারে, যাতে করে শরীরের ক্ষতিই হবে। কাজেই আপনার আদৌ সাপ্লিমেন্ট নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে কি না, ব্লাড টেস্ট করিয়ে তা দেখে নিন আগে।




## স্বাভাবিক উপায়ই সেরা!

যে কোনও পুষ্টিগুণই সাপ্লিমেন্টের বদলে স্বাভাবিক উপায়ে পেতে পারলে, তার চেয়ে ভাল আর কিছু হয় না। সকাল ১০টা থেকে দুপুর ৩টের মধ্যে যে কোনও সময় সূর্যের আলোয় যদি হাত এবং পায়ের ত্বককে মেলে ধরে রাখতে পারেন, তা হলে শরীরে ভিটামিন ডি-র ঢোকা সহজ হয়। এই এক্সপোজ়ারের সময়সীমা পাঁচ মিনিট থেকে আধঘণ্টা হতে পারে। তবে পুরোটাই নির্ভর করে স্কিন পিগমেন্টেশন, ঋতু, দিনের সময়, যে জায়গায় রয়েছেন সেখানকার ল্যাটিটিউড— এ রকম কিছু মাপকাঠির উপর। এ ছাড়াও স্যামন, ক্যান্ড টুনা, ছোট চিংড়ি, ডিমের কুসুম, কড লিভার অয়েল, ফর্টিফায়েড দুধ, দই, অরেঞ্জ জুস ইত্যাদিও ভিটামিন ডি-র খুব ভাল উৎস।

সুতরাং ঠিকঠাক খাবার খান। পর্যাপ্ত সূর্যস্নান করুন। এবং প্রয়োজনে সাপ্লিমেন্ট নিন, অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে। ভিটামিন ডি-র ঘাটতির আশঙ্কা তা হলে থাকবে না।

**যোগাযোগ:** ৯৮৭৫৩৯৮৩৭৭

# পারফেক্ট Frames

চশমা যাঁদের সর্বক্ষণের সঙ্গী, ট্রেন্ডি ফ্রেম সম্পর্কেও তাঁদের ওয়াকিবহাল থাকা জরুরি। কোন ধরনের ফ্রেম এখন ইন? কীভাবেই বা স্টাইলিং করবেন? জেনে নিন।



## ক্লিয়ার ভিউ

মিলিম্যানিজ়ম ক্রেজ়ের সাম্প্রতিকতম সম্প্রসারণ ঘটেছে চশমার ফ্রেমে। আর তাই চিরন্তন রঙিন ফ্রেম ছেড়ে সকলে বেছে নিচ্ছেন ক্লিয়ার ফ্রেম। ইজ়ি-টু-ওয়্যার, স্টাইলিশ এবং সব বয়সে, সব কমপ্লেকশনে, সব ধরনের পোশাকের সঙ্গে মানানসই। তবে গাঢ় বা উজ্জ্বল রঙের পোশাকের সঙ্গে টিম-আপ না করাই ভাল। কারণ এই ধরনের রং ওভারপাওয়ার করতে পারে। হালকা রঙের পোশাককে এই ধরনের ফ্রেম সবচেয়ে কমপ্লিমেন্ট করে। খুব লাউড মেক-আপও না করাই ভাল। বরং হালকা, মিনিম্যাল মেক-আপ ক্লিয়ার ফ্রেমের উপর ফোকাস রাখতে সাহায্য করবে। এখন টিন্টেড ক্লিয়ার ফ্রেমসও বেশ জনপ্রিয়। সাদা বা রঙিন, পছন্দ অনুযায়ী ফ্রেম বেছে নিন। শুধু খেয়াল রাখবেন, মুখের আকৃতির সঙ্গেও যেন তা মানানসই হয়।



## প্লেজ়েন্ট প্যাস্টেল

ফ্যাশনে প্যাস্টেল শেড বেশ কিছু সময় ধরেই শিরোনামে রয়েছে। তবে চশমার ক্ষেত্রে শুধু প্যাস্টেল নয়, তার সঙ্গী হয়েছে ম্যাট টেক্সচার। ম্যাট আইফ্রেমে প্যাস্টেল শেডস এই মুহূর্তের অন্যতম জনপ্রিয় ট্রেন্ড। মোনোক্রোম্যাটিক পোশাকের সঙ্গে একই শেডের ফ্রেম দেখতে ভাল লাগে। তবে চাইলে উজ্জ্বল রঙের পোশাকের সঙ্গেও পরতে পারেন এই ধরনের ফ্রেম। শুধু চেষ্টা করুন মেক-আপ মিনিম্যাল রাখার এবং তা খুব গ্লসি না হলেই ভাল।



## মার্বল মুড

একরঙা ফ্রেমের বদলে নতুন কিছু ট্রাই করতে চাইলে প্রিন্টেড ফ্রেম আপনার আদর্শ চয়েস হতে পারে। তবে ফ্লোরাল বা অ্যানিমাল প্রিন্ট ছেড়ে বেছে নিন মার্বল। বোল্ড লিপকালার আর মানানসই রঙের পোশাকের সঙ্গে টিম-আপ করলে স্টাইল কোশেন্ট বেড়ে যাবে নিমেষে। বিশেষ করে পার্টিওয়্যারের সঙ্গে মার্বল ফ্রেমসের জুটি দারুণ গ্ল্যামারাস।



## মেটাল মোটিভেশন

একসময় মেটাল ফ্রেম মানেই বয়স্কদের চশমা বলে মনে করা হত। কিন্তু এখন মেটালের কদর বেড়েছে তরুণদের মধ্যেও। চিরন্তন গোল বা চৌকো মেটাল ফ্রেমের বদলে তারা বেছে নিচ্ছেন ক্যাট-আই, হেক্সাগনের মতো শেপ। গোল্ডেন বা সিলভারের পাশাপাশি চল বাড়ছে রোজ় গোল্ড, কপার টোনের। কর্পোরেটওয়্যারের সঙ্গে বেশ মানানসই। আবার ফেস্টিভ মুডেও ভাল লাগবে।


# আলোয় আলো আকাশ...

আলোর উৎসবে চারিদিকে উজ্জ্বল আলোর রোশনাই। এই আলোকময় দিনে সাজকাহনেও থাক তার ছোঁয়া। এথনিক থেকে ওয়েস্টার্ন, দীপাবলির এক্সক্লুসিভ ফ্যাশন ফ্রেম রইল এবারের সানন্দায়।

গাঢ় নীলের উপর সিকুইনের কাজ করা ওয়ান শোল্ডার ককটেল ড্রেস। দীপাবলির পার্টির পারফেক্ট অ্যাটায়ার।

পোশাক: রুকেরু
ফোন: ৯০৩৮৭৭৭১৩৩



দীপাবলির সন্ধ্যায় গোল্ডেন ইয়েলো ও প্যাস্টেল কালার কম্বোতে লহেঙ্গার সাজ। সঙ্গে কুন্দন ও পোলকি কাজের চোকার ও হাতপদ্ম গয়নার সঙ্গত।

গয়না: হর্ষিতা
সুলতানিয়া জুয়েলরি
ফোন: ৮৩৩৫০৭৮১৮৩
পোশাক: রুকেরু



আলোর উৎসবে শুধুই এথনিক স্টাইল মানাবে, এমনটা কিন্তু নয়! ছক ভাঙা সাজে সাজতে ট্রাই করতে পারেন এরকম ফুলস্লিভস ওয়েস্টার্ন ড্রেস।

পোশাক: সাস্যা
ফোন: ০৩৩ ২২৮৯২৩২৩



হালকা নীল লং
এথনিক গাউন।
সঙ্গে ফ্রিল দেওয়া
দোপট্টা। কুন্দনের
গয়নার সহযোগে
স্নিগ্ধ সাজ।

পোশাক: সাস্যা
গয়না: হর্ষিতা
সুলতানিয়া জুয়েলারি



আলোর উৎসবে চাই
উজ্জ্বল রঙের বাহার।
ভাইব্র্যান্ট রঙের লং
স্কার্টের সঙ্গে মিরর
ওয়র্ক করা স্ট্র্যাপি টপ
ও নেটের দোপট্টা।
সঙ্গে কুন্দনের ভারী
নেকপিসে সম্পূর্ণ সাজ।

পোশাক: সাস্যা
গয়না: হর্ষিতা সুলতানিয়া
জুয়েলরি



প্যাস্টেল পিঙ্কের
উপর ফ্লোরাল
প্রিন্টেড ধোতি
প্যান্টস। সঙ্গে ক্রপ
টপ ও লং শ্রাগে
ইন্দো-ওয়েস্টার্ন লুক।

পোশাক: সাস্যা
গয়না: হর্ষিতা সুলতানিয়া
জুয়েলরি



দীপাবলির সাজে পরনে লাল এথনিক লহেঙ্গা। ডানদিকে অন্যজন পরেছেন কমলা ও ম্যাজেন্টা স্ট্রাইপড ইন্দো-ওয়েস্টার্ন পোশাক।

পোশাক: সাস্যা
মাথাপট্টি (বাদিকে): হর্ষিতা সুলতানিয়া জুয়েলরি

মডেল: জুহি, কোয়েল
মেক-আপ: কাজু গুহ
ফোন: ৮০১৭৯৪২৬৫১
হেয়ার: নাজ় হোসেন
স্টাইলিং: বম্বে বাই আয়েশা
ফোন: ৮৩৩৫৯৬৫৯৬৮
সহযোগী: অঙ্গনা সামন্ত
শুটিং লোকেশন: এফিনগাট ব্রিউ পাব
২৪ পার্ক স্ট্রিট, সিলিকা পার্ক, লেভেল ৭, ম্যাগমা হাউস
ফোন: ০৭৬২০০৩৮৮৮৮
ছবি: সোমনাথ রায়
শুটিং কোওর্ডিনেশন: মৌমিতা সরকার

*এই শুটের ভিডিও দেখতে স্ক্যান করুন QR কোডটি*



আপনাকেই দেখাতে হবে প্রাথমিকভাবে। আর এর শুরু করুন মাইন্ডসেটের পরিবর্তন দিয়ে। সকলের কাজকে গুরুত্ব দিতে শুরু করুন। দেখবেন, সময়ের গুরুত্ব বুঝতে অসুবিধা হবে না।

● মনে রাখবেন, দেরি করে কোথাও পৌঁছনোর চেয়ে আগে পৌঁছনো ভাল। তাই যেখানে দেরি হতে পারে, সেখানে আগে থেকেই হাতে খানিকটা সময় রাখুন। কোন কাজে কতটা সময় লাগে, তার একটা রাফ হিসেব রাখুন। প্রতিটা কাজ সেই সময়ের মধ্যে শেষ করুন। প্রতিটা কাজের মধ্যে কিছুটা বাড়তি সময় রাখুন, যাতে ভুল করলে শুধরে নেওয়ার সময় পান।

● কাজের প্রায়োরিটি অনুযায়ী সেগুলো ভাগ করে নিন। হয়তো আধঘণ্টার মধ্যে তিনটে কাজ শেষ করতে হবে। এর মধ্যে হয়তো দু'টো কাজ না করলেই নয়। তৃতীয়টা পরে করা সম্ভব। এক্ষেত্রে কোনও একটা কাজে দেরি হয়ে গেলে অপেক্ষাকৃতভাবে কম জরুরি কাজ বাদ দিয়ে অন্য কাজটা সময়ে শেষ করুন।

● অনেক অফিসেই ঢোকার সময়ে কিছুটা (দশ-পনেরো মিনিট) বাফার দেওয়া হয়। সেক্ষেত্রে আসল সময়টাকেই প্রায়োরাটাইজ় করুন। প্রথমেই যদি বাফার টাইমকে লিমিট ধরে নেন, সেক্ষেত্রে দেরি হওয়ার আশঙ্কা আরও বাড়বে বই কমবে না।

# পাংচুয়ালিটি ইজ় আ গ্রেট ভার্চু!

জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তো বটেই, বিশেষ করে কর্মক্ষেত্রে এই কথা সদা মনে রাখা জরুরি। ওয়র্কপ্লেসে সময় সম্পর্কে নিজের সচেতনতা বাড়াবেন কীভাবে? রইল পরামর্শ।

সমীক্ষা বলে, প্রায় ৪১ শতাংশ কর্মী চাকরি হারিয়েছেন পাংচুয়ালিটির অভাবে। অথচ চাকরির পরীক্ষা বা ইন্টারভিউতে কেউ কিন্তু এই প্রসঙ্গে কোনও কথা তোলেন না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা যাচাই করা হয় বাস্তবে। হয়তো কাজের ধরন বা কোম্পানি ভেদে পাংচুয়ালিটির গুরুত্ব কম-বেশি হয়, তবে একে অবহেলা করা উচিত নয় কখনওই। বলতে পারেন, অফিসের অলিখিত নিয়মগুলোর মধ্যে একটি এটি। শুধু অফিসে নির্ধারিত সময়ে পৌঁছনো নয়, ডেডলাইন মিট করা, সময়ে মিটিংয়ে জয়েন করা, সবই পাংচুয়ালিটির অংশ। এতে শুধু কাজ করতেই যে সুবিধে হয় তা নয়, বরং সহকর্মীরাও বুঝতে পারেন, কাজের ব্যাপারে আপনি কতটা সিরিয়াস। অপরদিকে দেরি করার অর্থ, আপনি তাঁদের সময়ের গুরুত্ব দিচ্ছেন না বা আপনি কমপিটেন্ট নন। টিমওয়র্কের ক্ষেত্রে একজনের পাংচুয়ালিটির অভাব পুরো টিমের জন্য ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাছাড়া প্রফেশনালিজ়মের সঙ্গেও পাংচুয়ালিটির সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। ফলে ইন্টারভিউতে তো নয়ই, এমনকী চাকরি জয়েন করার পরও সময় সম্পর্কে সচেতন হন।

● এক্ষেত্রে অনেকটাই আপনার কর্তব্য। সময়ের কাজ সময়ে করতে হবে, এই সিদ্ধান্ত আপনার নিজেকেই নিতে হবে এবং তা থেকে কোনও অবস্থাতেই যেন সরে আসতে না হয়, সেই দৃঢ়তাও

● অনেকক্ষেত্রে একসঙ্গে অনেক কাজ জমে গেলে স্ট্রেস থেকেও কনসেনট্রেশনে সমস্যা হয়, যার অবধারিত ফল কাজে দেরি। তাই মাঝেমধ্যে মিনিট পাঁচেকের ব্রেক নেওয়াও জরুরি, যাতে শরীর-মন রিফ্রেশ করার সময় পান।

তবুও, এত কিছুর পরও যে দেরি হতে পারে না, তা নয়। কিছু জিনিস সবসময় হাতে থাকে না। বিশেষ করে যাতায়াতের সময়। বা কোনও ক্ষেত্রে অন্য কারওর আনপাংচুয়ালিটির কারণেও আপনার দেরি হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে ইমিডিয়েট বস বা টিম লিডারকে দেরির কারণ জানিয়ে রাখুন। প্রয়োজনে ক্ষমা চেয়ে নিন। তবে নিয়মিত দেরি হলে নিজের রুটিন বা কাজের ধরনের দিকে নজর দিন। নয়তো সহজেই খারাপ ইম্প্রেশন তৈরি হতে পারে কর্মক্ষেত্রে।



পড়াশোনার ক্ষেত্রে চিটিং করলে শাস্তি তো মেলেই, জীবনের ভিতও থেকে যায় নড়বড়ে। সন্তানকে এ কথা বোঝানোর দায়িত্ব আপনাদেরই।

# চিটিং করা অন্যায়!



স্কুল থেকে ফোন পেয়েই বুকটা কেঁপে উঠেছিল শ্বেতার। মেয়ে অরিত্রীর ক্লাস ফাইভের হাফ-ইয়ার্লি চলছে। পরীক্ষায় কিছু গোলমাল হল? মেয়ের কি শরীর-টরির খারাপ করল? হুড়মুড় করে অরিত্রীর স্কুলে পৌঁছে যা শুনলেন, তাতে অবশ্য মনে হল, লজ্জায় মাটিতে মিশে যাওয়া ছাড়া আর গতি নেই। পরীক্ষার হলে চিটিং করেছে অরিত্রী! পাশেরজনের লেখা দেখে দেখে উত্তর লেখার চেষ্টা করছিল। ধরা পড়ে যাওয়ার পর খাতা কেড়ে নিয়েছিলেন পরীক্ষক! গোটা একটা পরীক্ষা বাতিল হয়ে গিয়েছে অরিত্রীর। এখানেই শেষ নয়। মেয়ে যে এত বড় একটা অন্যায় করেছে, সেই অনুশোচনার কোনও চিহ্নই নেই তার চোখেমুখে। বাড়িতে নিয়ে এসে যখন প্রবল ধমক দিলেন মেয়েকে, সে সোজা বলল, ‘‘বাংলার সিলেবাস এত বড়, অর্ধেক জিনিস বুঝতেই পারিনি কখনও। টিউশনে ম্যাম খালি নোট্স লেখাতেন, বোঝাতেন না। তোমরাও কখনও কিছু দেখিয়ে দাওনি, কিন্তু নম্বর না পেলে বকাবকি করতে। তনয়া বাংলায় ভাল, তাই ওকে বলেছিলাম খাতাটা দেখাতে। না হলে নম্বর কোথা থেকে পেতাম?’’

গোলমালটা কোথায় হয়, বুঝলেন তো? সকলেই বলছি না, কিন্তু অনেক বাবা-মা ছোট থেকে একটা কথাই ঢুকিয়ে দেন সন্তানের মাথায়— নম্বর পেতে হবে। একটা বিষয়েও কম নম্বর পেলেই রেজ়াল্ট খারাপ হবে। রেজ়াল্ট খারাপ হলেই প্রতিযোগিতায় টিকতে পারবে না। দুঃখের বিষয়, এই ভাবনার পিছনে শুধু সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা কাজ করে না। সন্তান কত ভাল ফল করল পরীক্ষায়, সেটা মা-বাবার স্টেটাস সিম্বলেরও সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়। তাই তাঁরা চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন সন্তানের উপর। কিন্তু অনেক সময়ই আবার বিষয়টা বুঝতে সন্তানের কোনও সমস্যা হলে, তাকে দেখিয়ে দেওয়ার সময়টুকুও বের করতে পারেন না। ভাবেন, টিউশন রয়েছে তো! কিন্তু সব সময় হয়তো টিউশনই যথেষ্ট হয় না বাচ্চার জন্য। ফলাফল— চিটিং। ধরা পড়লে শাস্তি যা হয়, তা তো হয়ই, এতে করে ওর শিক্ষাও তো সম্পূর্ণ হয় না! ফলে ভবিষ্যতের ভিতও তৈরি হয় না ঠিক করে। সবচেয়ে সর্বনাশ হয়, ধরা যদি না পড়ে। ছোট থেকেই ওর মনে এই ধারণা তৈরি হয়ে যায় যে, ঠকিয়ে সবকিছু অনেক সহজে পাওয়া যায়। বাচ্চার মধ্যে মনুষ্যত্ববোধই গড়ে ওঠে না। ফলে চিটিং করা যে অন্যায়, এটা ওকে প্রথম থেকেই বোঝাতে হবে। অন্যের খাতা দেখার অবস্থায় যাতে কোনওদিন ওকে না পড়তে হয়, নজর রাখতে হবে সেদিকেও। নিজেদের জীবনচর্যার মাধ্যমে ছোটদের বোঝানো যায় খুব সহজেই। আপনি কাজ

করছেন বলে টাকা পাচ্ছেন, সেই টাকা দিয়ে ওর পড়াশোনা, বাইরে খেতে যাওয়া, ঘুরতে যাওয়া— সব হচ্ছে। অর্থাৎ, ভাল কিছু পাওয়ার জন্য পরিশ্রম করতে হয়। নম্বর পাওয়ার জন্যও তেমনই পড়াশোনা করতে হবে। ফাঁকি দিয়ে কোনওকিছুই পাওয়া যায় না— এটা প্রাথমিক শিক্ষা। তার চেয়েও বড় কথা হল, নম্বর দু'একটা বিষয়ে একটু কম পেলেও চলবে। কিন্তু ভাল মানুষ না হলে চলবে না কিছুতেই। ও যদি ভাবে অন্যের খাতা দেখে উত্তর লিখে দেবে, তার মানে অন্য একজন পরিশ্রম করছে আর তার লাভটা পাচ্ছে ও। এটা কি ভাল মানুষের লক্ষণ? যখনই ওর মনে হবে ওর সাফল্যের পিছনে ওর কোনও অবদানই নেই, নিজের কাছেই মাথা হেঁট হয়ে যাবে না? সারাক্ষণ মনে হবে না, যে ও অন্যায়ভাবে অন্যের পরিশ্রমের ফল ভোগ করছে? তার চেয়ে নিজে খেটে নম্বর পাওয়া অনেক আনন্দের, স্বস্তির নয় কি? পড়াশোনা তো শুধু নম্বর পাওয়ার জন্য নয়, নানা বিষয় জানার জন্যও। না পড়লে তো বিষয়গুলোও জানা হবে না।

বিষয়গুলো জানতে কিন্তু ওকে সাহায্য করতে হবে আপনাদেরও। আগে নিজেরা মাথায় ঢোকান, যে রোবট-দৌড়ে বাচ্চাদের নামালে ওরা আর মানুষ তৈরি হবে না। পড়াশোনা শিখুক নিজের আনন্দে। সেই আনন্দের হদিস সব সময় স্কুল বা টিউশনে মেলে না। ভাষা শেখার জন্য গল্পের বই পড়ার চেয়ে ভাল উপায় আর কী আছে? ইতিহাসও তো গল্পই! পৃথিবীর কবে কোথায় কী ঘটেছে, রাজারানি হোন বা সাধারণ মানুষ, তাঁরা কী কী কীর্তি







ভাল কিছু পাওয়ার জন্য পরিশ্রম করতে হয়। নম্বর পাওয়ার জন্যও তেমনই পড়াশোনা করতে হবে। ফাঁকি দিয়ে কোনওকিছুই পাওয়া যায় না। তার চেয়েও বড় কথা, নম্বর দু'একটা বিষয়ে একটু কম পেলেও চলবে। কিন্তু ভাল মানুষ না হলে চলবে না কিছুতেই।

স্থাপন করেছেন— এগুলো গল্পের মতো করে জানার আনন্দ কি কম? ভূগোল পড়ার সময় যদি গ্লোব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বিভিন্ন মহাদেশ, দেশ চেনা যায়, সে আনন্দ কি কিছু আবিষ্কার করার আনন্দের মতো নয়? অঙ্কও তো আসলে সংখ্যার খেলা! নানা সংখ্যার যোগ-বিয়োগ, গুণ-ভাগে লুকিয়ে রয়েছে যে জাদু, তারও কি কম মজা? এই আনন্দগুলো ধরিয়ে দিতে হবে ওদের। তার জন্য বাচ্চাদের পিছনে সময় দিতে হবে। খালি 'পড়, পড়' না করে পড়ার পিছনের মজাটার খোঁজ দিতে হবে। যখন কোনও সমস্যায় পড়বে ওরা, তখন স্কুল বা টিউশনের উপর দায়িত্ব না ছেড়ে দিয়ে, নিজেও ওদের সঙ্গেই সমাধানের রাস্তা খুঁজতে হবে। সমস্যাগুলো একবার সমাধান করার অভ্যেস তৈরি হয়ে গেলে, তখন অন্য কারও খাতা দেখে লেখার কথাও ওদের মাথাতে আসবে না।

তবে একটা কথা মনে রাখবেন। চিটিং করা উচিত নয়, কারণ করলে শাস্তি পেতে হবে— এভাবে বোঝাবেন না ওদের। তা হলে ওরা হয়তো পরীক্ষকেরও চোখ ফাঁকি দেওয়ার উপায় খুঁজে নেবে! আসল কথা হল পরিশ্রম আর সততা। ভাল এবং সফল মানুষ তৈরি হওয়ার ভিত এইদুটোই। সে কথাই যেন ছোট থেকে বুঝতে শেখে ওরা।

**ডানদিকের পাতার বড় দুটি ছবি:** আইস্টক




# আলোর উৎসবে ‘আনন্দ’ সাজ

পুজোর রেশ কাটতে না কাটতেই এসে গেল আলোর উৎসব। দীপাবলির সকাল-সন্ধ্যায় উজ্জ্বল সাজ হোক ট্র্যাডিশনাল ও কনটেম্পোরারি বারো হাত শাড়িতে। ‘আনন্দ’ শাড়ির সাজে আলোকময় হোক দীপাবলির ফ্যাশন-প্যালেট।

হাফ অ্যান্ড হাফ স্টাইলে কালো ও মাস্টার্ড কালার কম্বিনেশনে অ্যাবস্ট্রাক্ট প্রিন্ট প্যাটার্নের সিল্ক শাড়ি। আঁচলে জিওমেট্রিক্যাল প্রিন্ট। সঙ্গে সাদাকালো স্লিভলেস ব্লাউজ় ও রুপোর গয়না।



কালো ও লালের
কনট্রাস্টে টাইগার
স্ট্রাইপ প্যাটার্নের
প্রিন্টেড সিল্ক শাড়ি।
আঁচলে লাল-সাদার
কম্বোতে একই প্রিন্ট।
হল্টারনেক ব্লাউজ়
ও রুপোর গয়নায়
কনটেম্পোরারি লুক।



লাল জমির উপর চওড়া রয়্যাল ব্লু পাড়ের সিল্ক শাড়ি। পাড় ও আঁচল জুড়ে লাল, হালকা নীল ও পিচ কালার কম্বিনেশনে আইক্যাচিং মোটিফ। লাল শার্টের সঙ্গে ড্রেপিং স্টাইলে ফ্যাশনেবল লুক।



সবুজ ভেঙ্কটগিরি সিল্ক শাড়ি। জমি জুড়ে জ়রির বুটি। কনট্রাস্টিং ম্যাজেন্টা আঁচলে সিলভার গোল্ড ও মিনাকারি ফ্লোরাল মোটিফ। কোমরে বেল্ট ও হালকা গয়নায় ফিউশন সাজ।



চওড়া পাড়ের তসর চান্দেরি শাড়ি। পাড়েও তসরের বুনোট। শাড়ির জমিতে লাল সবুজ কম্বিনেশনে ‘জোড়া টিয়াপাখি’ মোটিফ। আঁচলে সবুজের কনট্রাস্ট।



উইভিং অ্যান্ড প্রিন্টসের অপূর্ব মেলবন্ধনে এই শাড়ি। পাড় ও আঁচলে ইন্ডিগো ব্লু ও সবুজ তসরের বুনন। জমি জুড়ে 'আনন্দ' সিগনেচার ফ্লোরাল প্রিন্ট।



সবুজ ও লালের বাহারে ট্র্যাডিশনাল ‘আনন্দ’ পাড় ও আঁচল। শাড়ির জমিতে ছোট ছোট টিয়াপাখির মোটিফ। অফ-শোল্ডার ব্লাউজ় ও স্টাইলিশ ইয়ারিংয়ের সঙ্গতে উৎসবের সাজ।



কমলা, মাস্টার্ড ও কালোর কনট্রাস্টে ‘আনন্দ’ সিগনেচার জিওমেট্রিক প্রিন্টেড ইক্কত শাড়ি। ক্লাসিক আর্টওয়ার্কের অপূর্ব নিদর্শন বললে অত্যুক্তি হয় না।

শাড়ি: আনন্দ
কুইন্‌স ম্যানসন
১৩ রাসেল স্ট্রিট
কলকাতা- ৭০০০৭১
ফোন: ২২২৯২২৭৫
৯৬৭৪৩৯২২৭৫

মডেল: শ্রীলগ্না, হিয়া
ডিম্পল, স্নেহা
মেক-আপ ও হেয়ার:
বাবুসোনা সাহা
৮২৪০৫৫০৮৮৪
স্টাইলিং, ব্লাউজ় ও গয়না:
অয়ন হোড়
ফোন: ৯০০৭২২০৪৯৬
রুপোর গয়না: করিশ্মাজ়
ফোন: ৮৬৯৭১১৩৩৬৭
শুটিং লোকেশন:
ইকোহাব, নিউটাউন
ফোন: ০৩৩ ৪০৩১৯০০০
ছবি: সোমনাথ রায়
শুটিং কোওর্ডিনেশন:
মৌমিতা সরকার

*এই শুটের ভিডিও দেখতে স্ক্যান করুন QR কোডটি*



# হৃদয়নগর

স্বপন শর্মা

একটা সাদা রঙের ম্যাজিক গাড়ি প্ল্যাটফর্মের পাশে দাঁড়ানো। সুজয় সেই গাড়িতে ওঠে। গাড়িটা প্রচণ্ড গতিতে চলার পর, বিরাট প্রাসাদের সামনে নামে। প্রাসাদের সামনে একটা বড় জায়গা জুড়ে নানা ফুল ও ফলের গাছ। উদ্যানের পাশে হরিণেরা চড়ে বেড়াচ্ছে। প্রাসাদের সামনে বিশাল পুকুর। পুকুরে হাঁসেরা দলবেঁধে সাঁতার কাটছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কাগজের নৌকা ভাসাচ্ছে জলে। সুজয় দেখতে পায়, দূরে দু'টি নারী-পুরুষ। সে হাঁটতে হাঁটতে ওদের কাছে যায়। পুরুষটি সুজয়কে প্রথম দেখতে পায়। জিগ্যেস করে, "এই, তুই কে? তোর বাড়ি কোথায়? এখানে কী করে এলি?"

"আমার নাম সুজয় সরকার। ম্যাজিক গাড়ি করে এখানে এসেছি। দারুণ লাগল ম্যাজিক গাড়ি।"

"তোর সঙ্গে কে আছে?"

"আমি একাই এসেছি। আমার স্কুল, পড়াশোনা কিছুই ভাল লাগে না। বেড়াতে ইচ্ছে করে শুধু।"

"কোন স্কুলে পড়িস?"

"লিট্‌ল পয়েন্ট, কলকাতা। আচ্ছা, ওই পুকুরের হাঁসগুলো এখানেই থাকে? পুকুরের ওই ফুলগুলো লোটাস না?"

"হ্যাঁ," মহিলা উত্তর দেয়।

"তুই একা কী করে এলি? কোন ক্লাসে পড়িস?" পুরুষটি আবার জিগ্যেস করে।

"ক্লাস ফোর। পুলকার স্কুলের গেট অবধি পৌঁছে দিয়েছিল। তারপর আমি ম্যাজিক গাড়ি করে এখানে চলে এসেছি। আচ্ছা, এ জায়গাটার নাম কী?"

"হৃদয়নগর।"

হঠাৎ কানের কাছে মোবাইলের অ্যালার্ম শুনে সুজয় জেগে ওঠে। অ্যালার্ম দেওয়া ছিল। নীলিমা ছেলেকে ঘুম থেকে ওঠাবার জন্য এ রকম করে। ব্যায়ামের টিচার আসেন ছ'টায়। সুজয় জেগে ওঠে। তার মনের মধ্যে ভোরবেলার স্বপ্নের কথাগুলো ঘুরপাক খায়। সে মনে মনে ঠিক করে ফেলে, ওখানে যাবেই। বিছানা থেকে নেমে দেখে, পাশের ঘরের দরজা বন্ধ। প্রতিদিন নীলিমা ছেলের সঙ্গে শোয়। সুজয় ঘুমিয়ে পড়লে, পাশের ঘরে তার বাবার সঙ্গে শুতে চলে যায়। দশ বছরের সুজয়ের এতে ভীষণ অভিমান।
ঘুমিয়ে পড়ার আগে সুজয় মাকে বলেছিল, "মা, আমার একা ঘরে শুতে ইচ্ছে করে না। ঘুমিয়ে পড়লে তুমি চলে যেও না কিন্তু।"
"ঠিক আছে, তুমি ঘুমোও," নীলিমা এই বলে ছেলেকে আশ্বস্ত করেছিল। কিন্তু সুজয় ঘুমিয়ে পড়লে নীলিমা প্রতিদিনের মতো পাশের ঘরে স্বামীর সঙ্গে শুতে চলে যায়।
সুজয় ঘুম থেকে জেগে পাশের ঘরের দরজায় টোকা দেয়। কিছুক্ষণ বাদে পাতলা সাদা হাতাকাটা নাইটি পরা নীলিমা দরজা খোলে। বলে, "গুড মর্নিং বাবু।"
"গুড মর্নিং।"
"সুমিপিসির কাছে যাও। নয়নকাকু এখনই চলে আসবে।"
সুজয় হাই তোলে ও ঘুমজড়ানো গলায় বলে, "যাচ্ছি।"
নয়নকাকু তার ব্যায়ামের শিক্ষক। আসেন সকাল ছ'টায়। সুমির কাছে গেলে, সুমি তাকে মুখ ধোওয়ায় সাহায্য করে। প্রাতরাশ তৈরি করে দেয়। সুমি এ বাড়িতে আছে সুজয়ের জন্মের পর থেকেই। বাড়ি তার মছলন্দপুর। রবিবার সে বাড়ি যায়। সোমবার খুব সকালে চলে আসে সুজয়দের বালিগঞ্জের ফ্ল্যাটে। তার স্বামীর সবজির ব্যবসা। উপার্জনের অর্ধেক দেশি মদেই চলে যায়। বহু অশান্তি করেও যখন কাজ হয়নি, দুই ছেলেকে মায়ের কাছে রেখে সুমি কাজের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছিল। সুজয়কে দেখাশোনার দায়িত্ব, রান্না করা এবং সব সময় থাকার জন্য সে এই বাড়িতে কাজ নেয়। ।
প্রতিদিনের মতোই একটা দিন। সাতটায় যখন ব্যায়ামের শিক্ষক চলে যায়, সুজয় প্রাতরাশ সেরে পড়তে বসে। ইতিমধ্যে ইংরেজির মাস্টারমশাই চলে আসেন। ন'টার কাছাকাছি সময় ইংরেজি পড়া শেষ হলেই স্কুলের সময় হয়ে যায়। সুজয়ের বাবা অফিস যাওয়ার আগে ছেলের সঙ্গে দেখা করে একটা হামি দিয়ে যায়। সে প্রতিদিন বাবাকে এই একবারই দেখতে পায়। রাত এগারোটায় যখন শুভাশিস বাড়ি ফেরে, সুজয় হয়তো ঘুমিয়ে পড়ে বা শুয়ে পড়ে।
নীলিমা সুজয়ের বইয়ের ব্যাগ, টিফিন, জলের বোতল সব গুছিয়ে দেয়। সুজয়ের স্নান হলে খাইয়ে দেয় সুমি। ছোটবেলা থেকে সুমি খাইয়ে দেয় বলে সে নিজে স্কুলে যাওয়ার সময় খেতে চায় না। রাতে নীলিমা খাইয়ে দেয়। সাড়ে ন'টায় পুলকার ফ্ল্যাটের সামনে দাঁড়ায়। নীলিমা ছেলেকে গাড়িতে তুলে দেয়। সুজয়ের ম্যাথসের টিচার সপ্তাহে দু'দিন আসেন বিকেল সাড়ে পাঁচটায়। আর একজন ম্যাম বাকি সাবজেক্টগুলো দেখিয়ে দেন। তিনি আসেন চারদিন। সব টিচারের হোমটাস্ক সামলে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। পাশাপাশি ক্লাস টেস্ট তো লেগেই আছে। গান আর আঁকার প্র্যাকটিস তো হয়েই ওঠে না। অথচ টিচার আসেন।

## ২

শুভাশিসের অফিস ডালহৌসিতে। একটা বড় বিজ়নেস কোম্পানির প্রধান কর্মকর্তা সে। কাজের চাপ এত বেশি যে, রাত সাড়ে দশটার আগে সে কোনওদিন বাড়ি ফিরতে পারে না। নীলিমা যেহেতু চাকরি বা অন্য কিছু করে না, সে একাকিত্বে ভোগে। ঘরের সমস্ত কাজ সুমিই করে, ফলে তার কিছুই করতে হয় না। বই পড়তে সে ভালবাসে না। টিভি দেখে আর মোবাইলে ফেসবুক করে অনেকটা সময় কাটে।
দুপুরবেলা মাঝেসাঝে সজলের অফিসে চলে যায়। সজল ওর কলেজের বন্ধু। কলেজজীবনে একটা সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল, তবে পূর্ণতা পায়নি। তার মধ্যেই শুভাশিসের সঙ্গে নীলিমার বিয়ে হয়ে যায়। তবে বন্ধুত্ব এখনও অটুট। সজল এখনও বিয়ে করেনি।
সুজয় যেহেতু ফেরে সাড়ে চারটেয়, নীলিমা আজ সজলের অফিসে ফোন করে। সজল ওকে সাড়ে তিনটের পর যেতে বলে। তার আগেই অবশ্য নীলিমা পৌঁছে যায়। ফোন করার কিছুক্ষণের মধ্যেই সজল বেরিয়ে আসে। নীলিমা সজলের বাইকে ওঠে। সার্কাস রেঞ্জের কাছাকাছি একটা কফিশপের সামনে নামে ওরা। বাইক থেকে নেমে ভিতরে ঢোকে। সজল জিগ্যেস করে, "কী রে, কী খাবি?"
"শুধু কফি। তুই ইচ্ছে করলে অন্য কিছু খেতে পারিস।"
"না না, আমিও আর কিছু খাব না। কিছুক্ষণ আগেই লাঞ্চ করলাম।"
সজল দু'টো কফির অর্ডার দেয়। নীলিমা জিগ্যেস করে, "বল, তোর খবর কী?"
"কোনও নতুন খবর নেই। অফিস, বাড়ি আর বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা। দিব্যি আছি। মাঝে মাঝে তুই আসিস।"
"আমি যে না এসে পারি না! একটা অপরাধবোধ সবসময় মনের মধ্যে জেগে থাকে। মনে হয়, তোকে আমি ঠকিয়েছি।"
"আরে না না, মেসোমশাই যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তা একদম ঠিক। আমার চাকরিটা প্রাইভেট কোম্পানিতে। একটা অনিশ্চয়তা তো আছেই। শুভাশিসদার ব্যাপারটা আলাদা। তাঁর নিজস্ব বিজ়নেস। কোটি কোটি টাকা বছরে আয়।"
"জানিস তো, একদম সংসারে সময় দিতে পারে না। বছরে এক-দু'বার বিদেশ যাই। তখনই একসঙ্গে থাকা হয়। তা-ও তো ফোনের পর ফোন।"
"সে তো হবেই। তবু যে স্বাচ্ছন্দ্য দেন, সেটা তো তোকে আমি দিতে পারতাম না।"
"সজল, এভাবে বলিস না। আমি..."
"জানি, তুই কী বলতে চাস," সজল দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।
"সজল, তুই বিয়ে করছিস না কেন? জীবনটা এভাবে নষ্ট করিস না।"
"না রে। জীবনের কাছে আর আমার কিছু চাওয়ার নেই। আমি তো সব তোর কাছে পেয়ে গিয়েছি। এই স্মৃতি অন্তরে রেখে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে চাই। তোর মনে পড়ে শান্তিনিকেতনের কথা? আমি কিন্তু তোকে আমার ভাবী স্ত্রী ভেবেই... তুইও আপত্তি করিসনি। পরবর্তী চার-পাঁচটা বছর কীভাবে যে কেটে গেল! ওফ্, যেন এক স্বপ্নের অতীত!"
"অতীতকে সম্বল করে জীবন কাটিয়ে দেওয়া যায় না। এখনও তুই ছেলেমানুষই রয়ে গেলি। এটা ঠিক, আমাদের পুরনো দিনগুলোর কথা ভাবলে আমারও কষ্ট হয়। কিন্তু কী করব বল? আমাদের সম্পর্কটা মা কিন্তু মেনে নিয়েছিল।"
ইতিমধ্যে বেয়ারা এসে কফি দিয়ে যায়। সজল কথা থামিয়ে বাইরের দিকে উদাসভাবে তাকিয়ে থাকে। নীলিমা কাছে এলেই একটা অন্তর্ভেদী যন্ত্রণা অনুভব করে। অথচ সে এই যন্ত্রণাটা সে পেতে চায়। ইচ্ছে করলে সে নীলিমাকে এড়িয়ে যেতেই পারে। না পাওয়ার বেদনাই যেন নীলিমার প্রতি ভালবাসাকে গভীরতর করেছে। অন্যদিকে নীলিমাও সপ্তাহে একদিন অন্তত দেখা করার চেষ্টা করে। এই মধ্য-ত্রিশেও, দু'জনের জীবন ভিন্ন পথে বয়ে গেলেও একে অপরের প্রতি দুর্বলতা বা মনের টান এখনও কমেনি। নীলিমা গুছিয়ে সংসার করেও, স্বামীর প্রতি কর্তব্যপরায়ণ হয়েও স্মৃতির মণিকোঠায় সযত্নে লালন করে সজলের প্রতি ভালবাসা। সজলের কাছে আসা মানে স্বপ্নময় অতীতের মুখোমুখি হওয়া। তবে বর্তমানকে উপেক্ষা করে নয়।
কফি খেতে খেতে সজল বলে, "ছাড় ও সব কথা। ছেলে কেমন আছে বল।"
"আর বলিস না, ভীষণ ব্যস্ত। সকাল-বিকেল টিচারের কাছে পড়া,

ক্লাস টেস্ট, আঁকার ক্লাস, গানের ক্লাস, ব্যায়ামের ক্লাস— সব সামলে বেচারা আর পেরে উঠছে না। সপ্তাহের সবক'টা দিন ব্যস্ত।"
"সব বাচ্চারই এই অবস্থা। খেলাধুলো করার সুযোগই পায় না।"
"খেলাধুলো? করবেটা কখন? রোববার বিকেলটাও গানের জন্য দিতে হয়। সন্ধে সাতটার পরে ওর বাবা আর আমি একসঙ্গে ওকে নিয়ে একটু বেরই।"
"সত্যি, ওদের কথা ভাবলে কষ্ট হয়।"
কফি খেতে খেতে নানা কথায় সাড়ে চারটের বেশি হয়ে যায়। সুজয়ের তখন বাড়ি ফেরার কথা। নীলিমা সজলের কাছ থেকে বিদায় নেয়।

৩

বাড়ি ফিরে নীলিমা দেখে, সুজয় ফেরেনি। পুলকারের ড্রাইভারকে ফোন করে জানতে পারে, চারটে চল্লিশ নাগাদ সে সুজয়কে নামিয়ে দিয়ে চলে গিয়েছে। সুমিও দেখেছে সুজয়কে নামতে। সে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে সুজয়কে রিসিভ করতে গিয়ে দেখে সুজয় নেই। আবাসন গেটের দারোয়ানও নামতে দেখেছে সুজয়কে। কিছু একটা কেনার জন্য পাশের গলির দিকে যেতে দেখেছে। সুমি এগিয়ে যায়। কিন্তু সুজয়কে দেখতে না পেয়ে, আশপাশের সবক'টা গলি দেখে যখন নীলিমাদের আবাসনের গেটের দিকে এগিয়ে আসে, তখনই নীলিমা ফেরে এবং জানতে পারে সুজয় ফেরেনি।
সে তখনই শুভাশিসকে ফোন করে। শত ব্যস্ততা ফেলে রেখে শুভাশিস চলে আসে। নীলিমা ও শুভাশিস আশপাশের সবক'টা গলি ঘুরে, নানাজনকে জিগ্যেস করে শুধু একটাই সূত্র পায়। তা হল, অটো ধরে সুজয় বালিগঞ্জ স্টেশনের দিকে গিয়েছে। বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজন সকলকে জানানো হয়। কিন্তু রাত ন'টা অবধিও কোনও খবর না পেয়ে, বালিগঞ্জ থানায় গিয়ে শুভাশিস ও তার বন্ধুরা ছেলের বিস্তারিত বিবরণ সহ ছবি জমা দিয়ে মিসিং ডায়েরি করে। বালিগঞ্জ স্টেশন ম্যানেজারের মাধ্যমে জানানো হয় শিয়ালদহ স্টেশনের জি আর পি-কে।
লালবাজারে শুভাশিসের পরিচিত গোয়েন্দা প্রধান কল্যাণ সেনকেও বিষয়টি দেখার অনুরোধ জানায় সে। হোয়াটস্অ্যাপ করে ছেলের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানায়। নীলিমা ছেলের যে ক'জন সহপাঠীর মায়ের সঙ্গে আলাপ আছে, তাদের প্রত্যেককে ফোন করে। না, কোনও তথ্যই মেলেনি।
দু'জনেই অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। নীলিমার বুকের মধ্যে একটা হাহাকার, একটা শূন্যতাবোধ এতটাই পীড়া দিচ্ছে, মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরচ্ছে না। মাথা নিচু করে সে কেঁদেই চলেছে। কাজের মহিলা সুমি সান্ত্বনা দেয়। শুভাশিস উত্তেজনায় সিগারেট খাচ্ছে আর পায়চারি করছে। পাশের ফ্ল্যাটের সব প্রতিবেশীরা ঘর ভর্তি করে বসে। সকলেই যে যার সোর্স অনুযায়ী খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করছে।
নীলিমার মধ্যে একটা অপরাধবোধ কাজ করে। সে ভাবে, আজ যদি সজলের সঙ্গে দেখা করতে না যেত, হয়তো ছেলেকে এভাবে হারাতে হত না। শুভাশিস জানে না সজলের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা। সে শুধু জানায়, সে শপিংয়ের জন্য একটু বাইরে গিয়েছিল। এরই মধ্যে এই ঘটনা। শুভাশিস এই বাইরে যাওয়ার ব্যাপারটাকে স্বাভাবিক ভাবেই মেনে নেয়। একজন মহিলা সারাদিন ঘরে বসে থাকবে, বাইরে কাজের জন্য বেরবে না, এটা তো হতে পারে না! সজল নীলিমার ক্লাসমেট ছিল, এটা সে শুনেছে। ওর সঙ্গে সম্পর্ক বা এখনও দেখা করতে যাওয়া— এ সব সে জানে না। ফলে বাড়ি ফিরে নীলিমাকে কিছুই বলেনি। কী অবস্থায় সুজয় হারিয়ে গেল, সে কোথায় ছিল— শুধু এইটুকুই জানতে চেয়েছিল। ছেলেকে না পেয়ে একটা তীব্র হাহাকার ওদের দু'জনকেই গ্রাস করে। রাত এগারোটা নাগাদ প্রতিবেশীরা এক এক করে সান্ত্বনা দিয়ে চলে যায়।

৪

সুজয় সকালে যে স্বপ্ন দেখেছিল, সেই স্বপ্নের দ্বারা প্ররোচিত হয়েই ঠিক করেছিল, বাড়ি থেকে পালাবে। কাউকে কিছু বলেনি। পুলকার নামিয়ে দেওয়ার পর সে পাশের গলি দিয়ে তাড়াতাড়ি হেঁটে বড় রাস্তায় এসে, অটো ধরে বালিগঞ্জ স্টেশনে আসে। তারপর শিয়ালদহের ট্রেনে চড়ে বসে। শিয়ালদহ নেমে, লোকজনের পিছু পিছু শিয়ালদহ মেন স্টেশনে এসে, ফের কৃষ্ণনগর লোকাল ট্রেনে ওঠে। ভিড়ের মধ্যেও সে বসার জায়গা পেয়ে যায়। পাশের নিত্যযাত্রীরা মোটামুটি ধরেই নেয়, সঙ্গে কেউ আছে। প্রথমে কেউ কিছু জিগ্যেস করেনি। ক্লান্ত সুজয় ভারী বইয়ের ব্যাগ কোলে নিয়ে ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ট্রেন নৈহাটি ছাড়লে পাশে বসা জীবন তরফদার জিগ্যেস করে, "বাবু, কোথায় নামবি?"
ঘুমজড়ানো গলায় সুজয় বলে, "হৃদয়নগর।"
"হৃদয়নগর? এই নামে তো কোনও স্টেশন নেই! তোর সঙ্গে কে আছে?"
"কেউ নেই।"
"তোর বাড়ি কোথায়?"
"কৃষ্ণনগর," সুজয় ইচ্ছে করে মিথ্যে বলে। এই নামটা সে ট্রেনে ওঠার আগে দেখেছিল।
"সে কী! তুই একা একা যাবি?"
সুজয় কোনও উত্তর দেয় না। সামনের সিটে বসা রানাঘাটের সুনীল দে ও তার স্ত্রী বাড়ি ফিরছিল। সুনীলের স্ত্রী রূপালি জিগ্যেস করে, "এই, তুই মিথ্যে বলছিস না তো? তোর বয়সি কাউকে কোনও মা-বাবা একা ছাড়বে, আমার তো বিশ্বাস হয় না।" কথাটা জীবন তরফদারও সমর্থন করে। সুনীল বলে, "ঠিক করে বল, তোর মা-বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিই। বাজে লোকজনের পাল্লায় পড়লে তোকে ধরে নিয়ে যাবে।" সুজয় একটু ভয় পায়। কিন্তু চুপ করে থাকে।
ইতিমধ্যে বাদামওয়ালা এলে, সুনীলের স্ত্রী তিন প্যাকেট বাদাম কেনে। তারপর সুজয়কে জিগ্যেস করে, "কী রে, বাদাম খাবি?"
সুজয় মাথা কাত করে সম্মতি জানায়। রূপালি সুজয়ের হাতে বাদাম তুলে দিয়ে বলে, "এই নে, খা। সুজয় বাদাম খেতে খেতে জানালার বাইরে উদাসভাবে তাকিয়ে থাকে। নৈহাটি ছেড়ে গেলে জীবন তরফদার নেমে যায়। যাওয়ার আগে সুনীল, রূপালি ও পাশে বসা অন্য যাত্রীদের বলে যায়, ছেলেটিকে ওর বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিতে। রূপালির ছেলেটিকে দেখে ভীষণ মায়া হচ্ছিল। দেখেই মনে হচ্ছে কোনও সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলে। বাদাম খাওয়া শেষ হলে রূপালি জিগ্যেস করে, "তোর নাম কী?"
"সুজয় সরকার।"
"সঙ্গে কেউ নেই কেন? তোকে একা ছাড়ল?"
"আমি নিজেই চলে এসেছি।"
"এবার ঠিক করে বল, তোর বাড়ি কোথায়?" সুনীল জিগ্যেস করে।
"বালিগঞ্জ।"
"বালিগঞ্জ? সে তো সাউথ লাইনে। আগে কৃষ্ণনগর বলছিলি কেন?"
পাশের একটি যুবক তখন বলে, "দাদা আপনারা ওর মা-বাবার সঙ্গে কনট্যাক্ট করুন।"
"বাবু, তোর বাড়ির ফোন নম্বরটা বল," বলে সুনীল। সুজয় বলতে চায় না। অনেকক্ষণ ধরে 'না না' বলার পর রূপালির চাপাচাপিতে শেষে সে বাড়ির ফোন নম্বর বলে। কিন্তু মা-বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বারণ করে।
পাশের অন্য এক বৃদ্ধ যাত্রী সুনীল ও রূপালিকে বলেন, "আপনারা ওকে নিয়ে নেমে যান।" স্টেশন মাস্টারকে এবং জি আর পি-কে বলুন, ওর বাবা-মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিতে।
রূপালি তার স্বামীকে বলে, "উনি ঠিকই বলেছেন, চলো তাই করি।"
রানাঘাটে নামার আগে সুজয়কে বলে, "বাবু, চল এই স্টেশনে নামি।"
সুজয় ওদের সঙ্গে রানাঘাটে নামে। সুনীল বলে, "তোর বাবা-মা কত চিন্তা করছে, বল তো? এই যে ফোন করছি, কথা বল।"
"আন্টি, এখন কথা বলব না।"
"সে কী! তা হলে চল স্টেশন মাস্টারের ঘরে। উনিই যোগাযোগ করিয়ে দেবেন তোর বাবা-মায়ের সঙ্গে।"
"বাবা-মায়ের সঙ্গে কাল কথা বলব।"

"সে কী! আজ কোথায় যাবি?"
সুজয় কোনও কথা বলছে না দেখে রূপালি বলে, "তোকে আমাদের বাড়ি নিয়ে যেতেই পারি। যাবি?"
"হ্যাঁ, যাব। বাড়ি গেলেই শুধু পড়া, টিচার আর স্কুল। আমার কিচ্ছু ভাল লাগে না।"
রূপালি হেসে বলে, "তাই? তবে চল।"
কিন্তু সুনীল কোনও ঝামেলায় যেতে নারাজ। সে বলে, "শোনো, আগে থানায় যাই। পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করি। ওকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে যদি বিপদে পড়ি, কে সামলাবে বলো তো?"
থানা পুলিশের কথা শুনে সুজয় ভয় পেয়ে যায়। সে চোখের জল মুছে বলে, "প্লিজ় আঙ্কল, আমাকে থানায় নিয়ে যেও না। পুলিশের কাছে নিয়ে যেও না!"
সুজয়ের কান্না দেখে রূপালির মায়া হয়। সে তার স্বামীকে বলে, "আচ্ছা, একটা কাজ করলে হয় না? বাড়ি ঢোকার আগে বাপির সঙ্গে দেখা করে কথাটা জানিয়ে গেলেই তো হয়। তারপর কাল দেখা যাবে।"
"কথাটা মন্দ বলোনি। ও তো কাউন্সিলর। ফলে কোনও সমস্যা হলে সামাল দিতে পারবে," এই বলে ওরা সুজয়কে নিয়ে রওনা দেয়।
আসলে এই ঝুঁকি নেওয়ার কারণও আছে। রূপালি আর সুনীলের বিয়ে হয়েছে দশ বছর। ওদের কোনও সন্তান হয়নি। অনেক ডাক্তার কবিরাজ দেখিয়েও কোন কাজ হচ্ছে না। হরেক রকমের পরীক্ষা করা হয়েছে। এখনও কোনও নামকরা ডাক্তারের নাম শুনলে পরামর্শের জন্য যায়। আজও কলকাতা গিয়েছিল ডাক্তার দেখাতে। সুনীল পেশায় কৃষক। প্রচুর জমিজমা, পাকা বাড়ি ও পুকুর তার। আছে হাঁস ও মুরগির ব্যবসা। দুই বোনের বিয়ে হয়েছে। বাড়িতে শুধু মা আছেন। বাড়ির কাজে সাহায্য করার জন্য দু'জন মহিলা সর্বক্ষণের জন্য রয়েছে। হাঁস ও মুরগির প্রতিপালনের জন্য রয়েছে দু'জন বেকার ছেলে। সুনীল ওদের মাইনে দেয় এবং তার বাড়িতেই ওদের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা।
সুনীলের ব্যস্ততা আছে। সম্পন্ন বা বিত্তবান বলতে যা বোঝায়, তার পরিবার তা-ই। কিন্তু এই মুহূর্তে দুঃখ বা অভাব একটাই। সন্তানের। রূপালি বাচ্চা দেখলেই কোলে নেয়। আদর করে। ওর ননদের ছেলেমেয়েরা এলে ওদের নিয়েই সারাক্ষণ মেতে থাকে। সুজয়কে দেখেও তার মনে হয় তার সময়মতো সন্তান এলে ওর মতোই তো বয়স হত! ইশকুলে যেত। তাকেই হয় তো আনা-নেওয়া করতে হত। মা ডাক শোনার জন্য তার মনটা আকুলি-বিকুলি করে। শাশুড়ির কথা অনুযায়ী সন্তানের জন্য নানা ধর্মস্থানে মানত করে। কিন্তু ভগবান তার প্রতি এখনও সদয় হননি।
রানাঘাটে নেমে সুজয়ের ভারী ব্যাগটা রূপালি নিজেই কাঁধে নেয়। তারপর সুজয়ের হাত ধরে সুনীলের সামনে হেঁটে যায়। সুনীল একটি হাতল ব্যাগ নিয়ে পিছনে। সুনীলও ভাবে, ইশ, এরকম একটি ফুটফুটে ছেলে যদি তার থাকত! এই মুহূর্তে কে বলবে সুজয় তাদের ছেলে নয়? তারও মনটা এত উতলা হয় যে সে-ও গিয়ে সুজয়ের একটা হাত ধরে। নরম হাতের ছোঁওয়ায় বড় তৃপ্তি পায়। একটা অদ্ভুত স্নেহ মনে উথলে ওঠে তার।
স্টেশনের পাশে রাখা বাইকে করে ওরা তিনজন প্রথমে কাউন্সিলর বাপি মজুমদারের বাড়ি যায়। সেখানে সব ঘটনা খুলে বলে। বাপি সুজয়ের বাড়ির ফোন নম্বর চেয়ে নেয় এবং সুনীলকে বলে, "ঠিক আছে, আপাতত বাড়ি নিয়ে যা। আমি বিষয়টা দেখছি।"
রানাঘাট নোকারি এলাকায় সুনীলের বাড়ি। বাড়ি ঢুকে রূপালির মনে হয়, ইশকুলের পোশাক পরা সুজয় চেঞ্জ করে পরবে কী! রূপালি সুনীলকে ফের বাজারে পাঠায় সুজয়ের জন্য দুই সেট জামা-প্যান্ট কিনে আনার জন্য। পরিচ্ছন্ন বসার ঘরে ঢোকার আগে, সুজয়ের ব্যাগটা রূপালি বারান্দায় রাখে এবং জুতো খুলে নিতে বলে। তারপর বলে, "আমাদের বাথরুম কিন্তু বাইরে। দোতলায় শুধু অ্যাটাচ্‌ড বাথরুম। আমার চটি পরে বাথরুমে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে আয়।" সুজয় বাধ্য ছেলের মতো তাই করে। বাথরুম থেকে ফিরলে রূপালি গামছা দিয়ে সুজয়ের হাত-পা মুখ মুছিয়ে দিয়ে বলে, "তোর আঙ্কল তোর জন্য জামা-প্যান্ট আনতে গিয়েছে। এখনই চলে আসবে। কী খাবি বল।"
"তোমরা যা দেবে, তা-ই খাব।"
"বাঃ, লক্ষ্মী ছেলে," বলে রূপালি সুজয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।
ইতিমধ্যে রূপালির শাশুড়ি ঘরে ঢোকেন। জিগ্যেস করেন, "কী গো বউমা, এই গোপালকে কোথায় পেলে গো?"
"ট্রেনে। ও একা একা বাড়ি থেকে পালিয়েছে। যা দিনকাল, বাজে লোকের পাল্লায় পড়তেই পারত! নানা দিক ভেবে বাড়িতেই নিয়ে এসেছি।"
"খুব ভাল করেছ। তা গোপাল, তোমার নাম কী?"
"সুজয় সরকার।"
"বাড়িতে কে কে আছে?"
"মা, বাবা, আমি আর সুমিপিসি।"
"ভাল।"
ইতিমধ্যে রূপালি চেঞ্জ করতে অন্য ঘরে চলে যায়। বলে যায়, "মা, একটু ওর সঙ্গে থাকুন। আমি হাতমুখ ধুয়ে ওর জন্য কিছু খাবার নিয়ে আসছি। এখন কিছু একটা খাক। রাতে পরে আমাদের সঙ্গে ভাত খাবে।"
রূপালির শাশুড়ি ফের জিগ্যেস করেন, "তা গোপাল, তুমি যে এভাবে বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছ, মা-বাবা চিন্তা করবে না?"
সুজয় মাথা নিচু করে থাকে। কোনও উত্তর দেয় না। সে জানে, এর উত্তর নেই। কিন্তু একটা একঘেয়ে জীবন, শুধু পড়া,পড়া আর পড়া তার ভাল লাগছিল না। স্কুল, দমবন্ধ-করা ফ্ল্যাটবাড়ি, টিচার, হোমটাস্ক, ব্যায়াম, গান আর আঁকা। তার দশ বছরের জীবনে কোনও বন্ধু নেই। কোনও খেলার সুযোগ নেই। পড়ার জন্য রোজ মায়ের বকুনি। কখনও হাতে চিমটি দিয়ে শাস্তি। টিচারদের হোমটাস্ক না করলে টিচারদের বকুনি, অঙ্ক ভুল করলে ম্যাথস টিচারের দাবড়ানি, গানের টিচারের আফশোস, 'তোর দ্বারা কিচ্ছু হবে না'— এইসব শুনতে শুনতে এবং সহ্য করতে করতে সে অতিষ্ঠ হয়ে উঠছিল। সে চাইছিল মুক্তির আনন্দ। সেটা যেভাবেই হোক। আজ ভোরে এ রকমই একটা স্বপ্ন দেখছিল। তখনই সে ঠিক করে ফেলে, অন্তরের সেই একান্ত বাসনার জগতে সে যাবেই। সে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, "আমাকে গোপাল বলে ডাকছ কেন? আমার নাম সুজয়।"
"ওই হল। গোপালও যা, সুজয়ও তাই। তোমার মতো একটা ফুটফুটে গোপাল ঠাকুর আমাদের বাড়িতে থাকলে কী যে ভাল লাগত!"
"ঠাম্মি, তোমাদের বাড়িতে কোনও ভাই, বোন বা দিদি-দাদা নেই?"
"না গো। সেই জন্যই তো তোমাকে এত ভাল লেগেছে," এই বলে সুজয়ের দু'টো ফরসা নরম হাত বৃদ্ধা কপালে ঠেকায়।
ইতিমধ্যে রূপালি দু'টো রসগোল্লা আর এক গ্লাস দুধ নিয়ে ঘরে ঢোকে। শাশুড়ির কাণ্ড দেখে তার চোখের কোণে জল আসে। সে কোনওরকমে সামলে নিয়ে বলে, "এই নে, এগুলো খেয়ে নে।" এই বলে সে নিজেই খাইয়ে দিতে থাকে। সুজয় বলে, "জানো আন্টি, মা-ও এমন করে আমাকে খাইয়ে দেয়। এমনিতে সুমিপিসিই আমাকে সব সময় খাইয়ে দেয়।"
ইতিমধ্যে সুনীল সুজয়ের সব সময় পরার জন্য একজোড়া জামা-প্যান্ট কিনে নিয়ে আসে। সঙ্গে দু'তিন রকমের মাছ ও মিষ্টি। উঠোনে বাইক রেখে, দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা একজন কাজের মাসির হাতে মাছ ও মিষ্টির ব্যাগটা দিয়ে সুনীল ঘরে ঢোকে। তারপর রূপালিকে বলে, "এই নাও, ওকে স্কুলের পোশাক খুলে এই জামা-প্যান্ট পরতে বলো।"
খাওয়া শেষ হলে সুজয় পাশের ঘরে চেঞ্জ করতে যায়। তখন সুনীল রূপালিকে বলে, "জান, বাপি ফোন করেছিল। কাল সকালে একবার দেখা করতে বলেছে। ছেলেটাকে নিয়ে যেতে বলেছে।"
"ঠিক আছে। নিয়ে যেও। এখন কী খাবে?"

"মুড়ি-চানাচুর আর লিকার চা। ছেলেটাকে কী খেতে দিয়েছ?"
"মিষ্টি আর দুধ দিয়েছি। আটটা তো বেজেই গিয়েছে। ন'টায় খেতে দিয়ে দেব।"
"ঠিক আছে।"
ইতিমধ্যে সুজয় চেঞ্জ করে ফিরে এলে রূপালি স্কুল ইউনিফর্ম, টাই, আই কার্ড বারান্দায় মেলে দেয়। কাজের মাসি লিকার চা আর মুড়ি-চানাচুর দিয়ে যায়। সুনীল মুড়ি চিবোতে চিবোতে জিগ্যেস করে, "কী রে বাবু, এখানে কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো? আমাদের এখানে সবকিছু খোলামেলা। কাল সকালে আমাদের ফার্ম দেখাতে নিয়ে যাব। দেখিস, কত মুরগি আর হাঁস। দিনে ওদের খাঁচা খুলে দিলে নিজেরাই পুকুরে চলে যায়। সারাদিন ওখানেই থাকে। সন্ধেবেলা নিজেরাই নিজেদের খাঁচায় ঢুকে যায়। বক দেখেছিস?"
"বক মানে ক্রেন? হ্যাঁ, ছবিতে দেখেছি।"
"ছবিতে? কাল আমাদের জমিতে নিয়ে যাব। দেখিস কত বক। একসঙ্গে যখন উড়ে আসে, দারুণ লাগে।"
"বাঃ, দারুণ মজা হবে।"
"আচ্ছা, তুই কোন ক্লাসে যেন পড়িস?"
"ক্লাস ফোর।"
"ক্লাস ফোরের ছেলে একা একা বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছিস? তোর সাহস তো কম নয়! তোর মা-বাবার কী অবস্থা এটুকুও ভাবলি না?"
সুজয় চুপ করে যায়। সুনীলের মা বসেছিল পাশেই। সুজয়ের চুপ করে যাওয়া দেখে বলেন, "থাক না সুনো, গোপালকে আর এ কথা না-ই বা বললি!"
রূপালিও শাশুড়ির সঙ্গে একই কথা বলে। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর, সুনীলের মুড়ি আর চা খাওয়া শেষ হলে সুজয়কে নিয়ে সে বাইরে বেরয়। বিরাট এলাকা নিয়ে তার বাড়ি ও ফার্ম। ফার্মের অদূরে পুকুর। পুকুরের এক পাশে সবজি ও নানা ফুলের চাষ করে সে। সব ঘুরিয়ে দেখায় সুজয়কে। আধো-অন্ধকারে সুজয় সব দেখে। চাঁদের আলোয় যতটুক দেখা যায়, তাই দেখায় সুনীল। দূরের গাছপালা ও বাঁশঝাড়গুলোকে এক-একটা অন্ধকারের স্তূপ মনে হয়। পুকুর থেকে ডাহুকের ডাক কানে আসে। পাশেই ঝিঁঝিঁ পোকার আওয়াজ। সুজয়ের মনে হয় সে স্বপ্ন দেখছে। সে সুনীলের হাত শক্ত করে ধরে রাখে। সুনীল জিগ্যেস করে, "কী রে, ভয় পাচ্ছিস?"
"না। তুমি তো আছই।"
"একটু তো পাচ্ছিস। ঠিক আছে, চল পাড়ার রাস্তায় একটু হেঁটে আসি," এই বলে ওরা পাড়ার আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরে হেঁটে বেড়ায়। কেউ সুজয়ের পরিচয় জানতে চাইলে সুনীল তার ভাইপো বলে পরিচয় দেয়। রূপালি রান্নাঘরে গিয়ে সুজয়ের জন্য দু'রকমের মাছ নিজের হাতে রাঁধে। সবজি, ভাত, ডাল করাই ছিল। একজন কাজের মাসিকে দিয়ে বেগুনি ভাজায়। সুনীলের আনা ল্যাংচা ও সন্দেশ একটা প্লেটে সাজায়। গ্রামের বাড়ি হলেও ডিনার টেবলে খাওয়ার ব্যবস্থা। রান্না শেষ হলে রূপালি টেবল সাজায়। সে নিজেও বুঝতে পারে না, এক অপরিচিত ছেলের জন্য কেন এমন আয়োজন করছে! হয়তো কালই স্বপ্নভঙ্গ হবে। সুজয়কে ফিরিয়ে দিতে হবে তার মা-বাবার কাছে।
রাত ন'টা নাগাদ সুনীল সুজয়কে নিয়ে ফিরে এলে রূপালি জিগ্যেস করে, "বাবু, এখন ভাত খাবি?"
"তোমরা এখন খাবে?" ফুরফুরে সুজয় জিগ্যেস করে।
"আমরা এই সময়েই খেয়ে নিই। তারপর টিভি দেখি।"
"তোমাদের এখানে কার্টুন চ্যানেল আসে?"
"আসে নিশ্চয়ই। আমরা তো দেখি না। খেয়েদেয়ে দেখিস। টিভি নিচের ঘরেও আছে, উপরের ঘরেও আছে।"
"ঠিক আছে।"
"খাবার টেবলে বসে সুজয় বলে, বাবা! কত ভাত দিয়েছ, কত কিছু রান্না করেছ! এত কিছু খাব কী করে!"
"শুরু কর, ঠিক পারবি। চল, আমি খাইয়ে দিচ্ছি," সুনীল এই বলে খাওয়াতে যায়।
"না না তুমি খাও। আমি খাইয়ে দিচ্ছি," রূপালি ব্যগ্রভাবে বলে। তার ননদের ছেলেমেয়েরাও ছোট। ওরা এলেও সে-ই নিজের ছেলেমেয়ের মতো আদর করে খাইয়ে দেয়। ওদের পছন্দের নানা জিনিস কিনে দেয়।
"আন্টি, তুমি খাবে না?" সুজয় জিগ্যেস করে।
"তোদের হয়ে গেলেই আমি আর তোর ঠাম্মি বসে যাব।"
রাত সাড়ে ন'টায় খাওয়া শেষ করে সুজয় সুনীলের সঙ্গে দোতলায় যায়। পরিষ্কার বিছানা। বিছানার পাশেই টেবল। টেবলের উপর টিভির রিমোট। আর একদিকে দেওয়ালে টাঙানো বড় ফ্ল্যাট টিভি। রয়েছে ড্রেসিং টেবল, আলনা, একটা আলমারি ও সুন্দর ডিজ়াইনের আয়না এবং সোফা। পাশেই টয়লেট। সুনীল ঘরে ঢুকে চেঞ্জ করে সোফায় বসে। সুজয় বলে, "আঙ্কল, একটু টিভি চালাব?"
"চালা। কার্টুন দেখবি?"
"হ্যাঁ," বলে সুজয় সলজ্জ হাসে। সুনীল টিভির সুইচ অন করলে সুজয় কিছুক্ষণ চেষ্টা করে, কার্টুন চ্যানেল বের করে দেখতে শুরু করে। দশটা নাগাদ রূপালি উপরে আসে। শোওয়ার আগে সামান্য প্রসাধন ব্যবহার করে। তারপর টয়লেট থেকে ফিরে সুজয়কে বলে, "বাবু, চল শুয়ে পড়ি। বাথরুমে যা।"
সুজয় বাথরুমে গেলে রূপালি সুনীলকে জিগ্যেস করে, "কী গো, ওকে পাশের ঘরে শুতে দেব, নাকি আমাদের সঙ্গেই...?"
"থাক না আমাদের সঙ্গেই। ও আমাকে বলেছে, বাড়িতে চার-পাঁচ বছর বয়স থেকেই আলাদা ঘরে শোয়। কী করে পারে ওর বাবা-মা?"
"আর কী বলেছে?"
"বলেছে অনেক কিছুই। যা বুঝলাম, একটা বাচ্চার মন, মেজাজ, আনন্দ, সে কী চায়— এই সব শহুরে বাবুরা বুঝতেই চায় না। টাকা থাকলেই সব হয় না। শুধু পড়া পড়া পড়া। খেলার সুযোগ নেই। সময় নেই। পাড়ায় কোনও বন্ধু নেই। যন্ত্রের মতো মানুষ করতে গিয়ে ওর ছোটবেলার আমোদ-আহ্লাদকে আমলই দেয়নি। ওর বাবা একজন..."
সুনীল কিছু একটা বলতে যাবে, এমন সময় সুজয় ঘরে ঢোকে। সে জিগ্যেস করে, "আন্টি আমি কোথায় শোব?"
"কেন? আমাদের সঙ্গে। আমাদের মাঝখানে। তোর অসুবিধে হবে? খাট তো অনেক বড়।"
এই কথা শুনে বেচারা হাঁ করে ওদের দু'জনের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর বলে, "না না, আমার কোনও অসুবিধে হবে না।"
"তা হলে আয় আমাদের মাঝখানে। আমি কিন্তু রাক্ষসের গল্প জানি। শুনবি?"
"হ্যাঁ, দারুণ মজা হবে। এই বলে খুশিতে লাফিয়ে বিছানায় এসে শুয়ে পড়ে। রূপালি আলো নিভিয়ে বলে, "সকাল সকাল যদি উঠতে পারিস, তাহলে তোর আঙ্কলের সঙ্গে আমাদের জমি দেখতে যেতে পারবি। পুকুরে বকের আনাগোনা দেখতে পারবি। দেখতে পারবি কেমন করে ওরা মাছ খায়।"
"আমাকে ডেকে দিও প্লিজ়!"
"ঠিক আছে।" এই বলে সুনীল সুজয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

ক্লাস ফোরের ছেলে একা একা বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছিস? তোর সাহস তো কম নয়! তোর মা-বাবার কী অবস্থা এটুকুও ভাবলি না?



রূপালি গল্প বলা শুরু করে। গল্প শোনা শেষ হলে সুজয় ঘুমজড়ানো গলায় বলে, "আমার মা কোনও গল্প জানে না। কোনওদিন বলেনি।"
"ঘুমিয়ে পড়," বলে রূপালিও তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

৫

একটা যন্ত্রণাময় রাত। উত্তেজনা ও দুশ্চিন্তায় নীলিমা, শুভাশিস, সুমি— কেউ ঘুমোয়নি। মোবাইল পাশে রেখে দু'জনেই সোফায় বসে। রাত তিনটে নাগাদ সুমি শুতে যায়। এক সময় নীলিমা এতটাই ভেঙে পড়ে যে সে শুভাশিসকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করে। শুধু একটা কথাই বার বার বলছে, "যে করেই হোক আমার সুজয়কে এনে দাও। ওকে ছাড়া আমি বাঁচব না।"
"দেখলে তো, এই নিয়ে থানায় তিনবার ফোন করলাম। তুমি এত ভেঙে পড়লে আমি কী করে..." বলতে বলতে শুভাশিসও আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ে। সে চোখের জল মোছে। কিছুক্ষণ পর বলে, "কাল সবক'টা কাগজে বিজ্ঞাপন দেব। ইলেকট্রনিক মিডিয়ারও হেল্প নেব। দেখি।"
দু'জনেই কাঁদতে কাঁদতে দরজা খোলা অবস্থাতেই তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। ঠিক সাড়ে ছ'টায় নীলিমা জেগে যায়। সে উঠে, সুজয়ের শোওয়ার ঘরে ঢোকে। ছেলের বইপত্র, খাতা, জামা-প্যান্টের পকেট... সব তন্নতন্ন করে দেখে, কোনও ফোন নম্বর বা অন্য কোনও ক্লু খুঁজে পাওয়া যায় কি না। শেষে কিছুই না পেয়ে ছেলের জামাকাপড়, বইপত্র একজায়গায় জড়ো করে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে শুরু করে। সুমি ছুটে আসে। কান্নার আওয়াজে শুভাশিসও উঠে যায় এবং সুজয়ের ঘরে ঢোকে। ঠিক সাতটা নাগাদ মোবাইল বেজে ওঠে। ওরা তিনজন ছুটে যায়। শুভাশিস দেখে, এক অচেনা নম্বর থেকে ফোন।

৬

সকাল সাতটায় মুখ ধুয়ে প্রাতকৃত্য সেরে, দু'টো বিস্কিট আর এককাপ হরলিক্স খায় সুজয়। তারপর সুনীলের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে। প্রথমে ফার্ম থেকে দেশি মুরগি বাছাই করে একটি ছেলেকে দিয়ে বাড়িতে পাঠায়। আর একটি ছেলের কাছ থেকে সেদিনের মালের অর্ডারের কথাটা জেনে নেয়। ফার্ম থেকে বেরিয়ে, পুকুরের পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় সুজয় দেখতে পায় একদল হাঁস পুকুরে সাঁতার কাটছে। পুকুরের মাঝ-বরাবর প্রচুর পদ্মফুল ফুটে আছে। আর একটু এগিয়ে গিয়ে পুবদিকটায় সুজয় দেখতে পায়, একদল বক উড়ে এসে জলের ধারে বসছে। সুজয় জিগ্যেস করে, "ওগুলো ক্রেন না?"
"মানে?" সুনীল বুঝতে পারেনি। একটু পরে বলে, "ওগুলো বক। তুই কি ইংরেজি নাম বলছিস? আমি ইংরেজি বুঝি না রে বাবা। মাধ্যমিক কোনওরকমে পাশ করে ফার্মের কাজে ঢুকে গিয়েছিলাম।"
"ঠিক বলেছ, বাংলায় বকই বলে। এত সব বক এখানে উড়ে আসছে কেন?"
"রোজই আসে। ছোট মাছ, পোকামাকড়— এই সব খাবে বলে।"
"পুকুরের মাঝখানে ওই ফুলগুলো লোটাস, না?"
"এই রে, আবার ইংরেজি? ওগুলো পদ্মফুল।"
"তোমাদের ফুলবাগানটা দারুণ।"
"এটা আমি করেছি। আমি নিজে বাগানের যত্ন করি।"
এই বলে দোতলা বাড়ির সামনের সরু রাস্তা ধরে এগিয়ে যায় ওরা দু'জন। রাস্তার ডান পাশে ফুলের বাগান আর বাঁ পাশে বিশাল পুকুর। রাস্তাটা যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকেই সুনীলের চাষের জমি শুরু। চাষের জমির একেবারে পশ্চিম কোণে বড় বাঁশঝাড়। ওই জমিটা একটু উঁচু। ওই জায়গাটায় রয়েছে প্রায় ত্রিশটা সেগুন গাছ, সুনীলের বাবার লাগানো। তিন-বছর আগে তার বাবা মারা গিয়েছেন।
সুজয়কে সঙ্গে নিয়ে সেগুন বাগিচায় যায় সুনীল। মানুষের আসার শব্দে বাঁশঝাড় থেকে একদল চড়ুই ও শালিক উড়ে যায়। সুজয় জিগ্যেস করে, "ওই পাখিগুলো এখানেই থাকে, আঙ্কল?"
"হয় তো। অনেক পাখিই তো এখানে থাকে।"
রূপালি সুজয়কে না দেখে থাকতে পারছিল না। ফলে সে-ও সেগুন বাগিচায় আসে। সবুজ ঘাসের উপর সে খালি পায়ে পায়চারি করা শুরু করে। শিশিরস্নাত সবুজের উপর হাঁটায় তার পা ভিজে গিয়েছে। আলতা-পরা পায়ে ছিল ঝুমুর। ঝুম-ঝুম শব্দে সুনীল রূপালির দিকে তাকায়। হেসে বলে, তুমিও চলে এলে? সুজয় বলে, "আন্টি, তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে? তোমার কত লম্বা চুল! আমার মায়ের চুল এত লম্বা নয়। আমার মা একটু রোগা। তোমার একটু ভাল চেহারা।"
"তাই? তুই তো খুব পাকা ছেলে, আমার সঙ্গে তোর মায়ের তুলনা করছিস?" এই বলে সে হাসে।
ওদের হাঁটার আর কথার শব্দে দলবদ্ধ পাখির উড়াল দেখে সুজয় আনন্দে আত্মহারা। প্রাণখুলে সে সকালের নরম সূর্যের আলো উপভোগ করে। পুরো আকাশটাকে মাথার উপর দেখে, আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। অদূরে বড় পুকুরে দলবদ্ধ হাঁসের সাঁতার, পুকুরের মাঝখানে অপরূপ ফুটে থাকা পদ্মফুল, নতুন আঙ্কলের ফুলবাগান, বাঁশঝাড়ে পাখির কাকলি— এই সব দেখে আর শুনে তার সেদিন শেষরাতের স্বপ্নের কথা মনে পড়ে যায়। তা হলে এটাই কি হৃদয়নগর? আঙ্কল আর আন্টিই কি তবে অচেনা নারী-পুরুষ? সে বলে, "আন্টি একটা গান গাইব?"
"হ্যাঁ, গা না।"
"আসলে রেওয়াজ করার সময়ই পাই না। গানের স্যার ভীষণ রাগারাগি করেন। ভাল হবে কি না জানি না।"
এই বলে সে প্রাণখুলে গেয়ে ওঠে, "আকাশ ভরা সূর্য-তারা, বিশ্বভরা প্রাণ,/ তাহারই মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান/ বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান..." সুনীল আর রূপালি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে এই বিস্ময়-বালকের গান শুনতে থাকে।

ওদিকে অচেনা নম্বর থেকে আসা ফোন ধরে শুভাশিস। ওপার থেকে জিজ্ঞাসা আসে, "আমি কি শুভাশিস সরকারের সঙ্গে কথা বলছি?"
"হ্যাঁ, আপনি কে বলছেন?"
"আমি বাপি মজুমদার, রানাঘাট নোকারী এলাকার একজন কাউন্সিলর। সুজয় সরকার আপনার ছেলে তো?"
"হ্যাঁ হ্যাঁ, ওর কী হয়েছে? ও ঠিক আছে তো?"
"হ্যাঁ, একদম ঠিক আছে। গতকাল কৃষ্ণনগর লোকাল ট্রেনে ওকে দেখে সন্দেহ হওয়ায়, প্যাসেঞ্জারদের পরামর্শে ওকে রানাঘাট নামিয়ে নেয় আমারই এলাকার এক দম্পতি। আজ বিকেল পাঁচটায় রানাঘাট থানায় চলে আসুন। আমি থাকব। এবং আপনার ছেলেকে নিয়ে ওরাও থাকবে। কোনও চিন্তার কারণ নেই। একদম নিজের ছেলের মতোই ওরা আপনার ছেলের দেখভাল করছে। ভীষণ আনন্দেই আছে ও।"
"ওফ, কী বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাব, বুঝতে পারছি না। একটা বিরাট দুশ্চিন্তা থেকে আমার পরিবারকে বাঁচালেন।"
"ধন্যবাদের কিছু নেই। আপনার ছেলে যাদের কাছে আছে, তারা আমার এলাকার অত্যন্ত ভাল মানুষ। ওদের ভাল-মন্দের দিকটা বিবেচনা করেই প্রশাসনের সহযোগিতায় আপনাদের ছেলেকে আপনাদের হাতে তুলে দিতে চাই। এইটুকুই বলার। ঠিক আছে?"
"বেশ।"


**অলংকরণ:** প্রসেনজিৎ নাথ



বিরল বিস্ময়...

# নীল আয়নার টানে

আকাশে-জলে-পাহাড়ে নীলের নানা শেড যেন মিলেমিশে একাকার! প্রকৃতি তার অপার সৌন্দর্য মেলে ধরেছে সিকিমে। সেই রূপবর্ণনায় পায়েল বিশ্বাস।



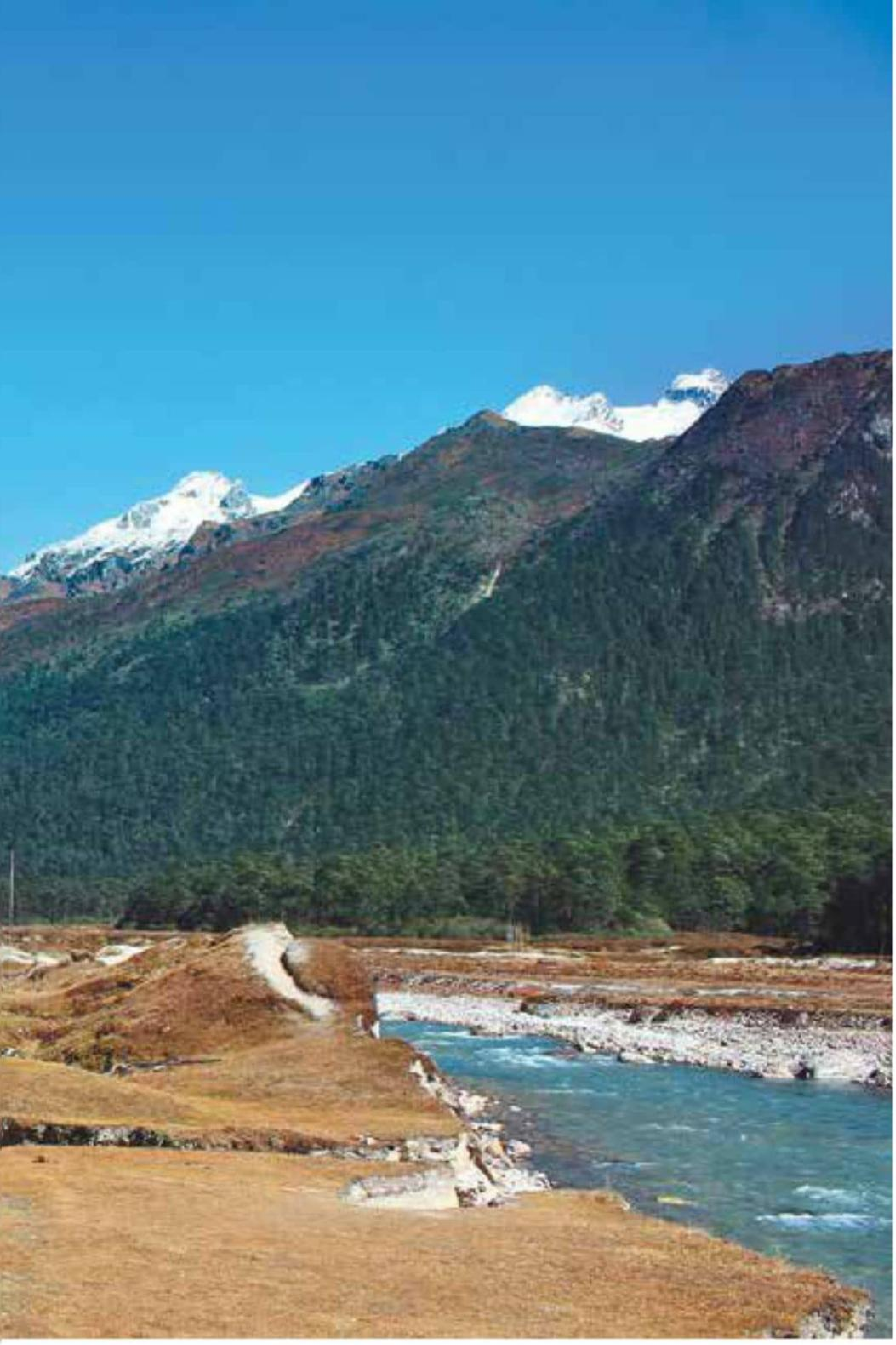


আকাশে হেলান দিয়ে...



একঘেয়ে জীবনযাপনের মাঝে মন উচাটন হলেই লোটাকম্বল গুটিয়ে ইতিউতি বেরিয়ে পড়ার উপদেশ সেই প্রাচীনকাল থেকে মুনিঋষিরা দিয়ে গিয়েছেন (তাই বলে আবার জিজ্ঞাসা করে বসবেন না যেন ঠিক কোন মহাত্মা পুণ্যপ্রাণের উপদেশ এটি, মাফ চাইছি, এর উত্তর আমার জানা নেই, আশা করি, সহৃদয় পাঠক/ পাঠিকা নিজগুণে আমার এ ত্রুটি মার্জনা করবেন)। ঋষিবাক্য তো আর উপেক্ষা করা যায় না, তাই কোথায় যাব ভাবতে ভাবতে ঘরের দেওয়ালে ঝোলানো ক্যালেন্ডারের পাতায় চোখ পড়ল। মসৃণ পাতাজুড়ে ঝকঝকে নীল আকাশ আর শুভ্র বরফে ঢাকা পাহাড়শ্রেণির নীচে ততোধিক ঝকঝকে এক হ্রদের ছবি। গুরুদোংমার। ১৭,৮০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত এবং উচ্চতার নিরিখে এটি বর্তমানে বেশ জনপ্রিয় এক টুরিস্ট ডেস্টিনেশনও বটে। আমাদের চেনাজানা বহুজনেরই পা পড়েছে এই হ্রদের ধারে। ভাবলাম, আমরাই বা কেন বাদ থাকি? এই সুযোগে সিকিমের অন্য কিছু জায়গারও রূপ নয়ন ভরে দেখে নেওয়া যাবে।

যাবতীয় গোছগাছ শেষ করে ট্রেনে চেপে বসলাম। আপাতত গন্তব্য এনজেপি। ওখানে পৌঁছনোর পর আগে থেকে বুকিং করা গাড়ি যখন আমাদের নিয়ে গ্যাংটকের



উদ্দেশ্যে পাড়ি দিল, তখন ভিনরাজ্যে পা রাখার রোমাঞ্চ পেয়ে বসল। তিস্তাবাজার, মেল্লি পেরিয়ে গন্তব্য ক্রমশই কাছে এগিয়ে আসতে লাগল আর জানালা দিয়ে পাহাড়ি মানুষজন আর তাদের ঘরবাড়ি, দোকানপাট, বাজারহাট সব দু'চোখ ভরে গিলে নিচ্ছিলাম। গ্যাংটক পৌঁছতে বিকেল গড়িয়ে এল। শহরটা যেন সব সময় উৎসব মুখরিত। রাস্তার দু'ধারে সুসজ্জিত দোকানপাট, সুবেশ মানুষজনের ভিড়, কৃত্রিম ফোয়ারার রঙিন জলবিন্দু— সবকিছু থেকেই চুঁইয়ে পড়ছে জীবনের গ্ল্যামার!

আপনি যদি ভোজনরসিক হন তো গ্যাংটকের রাস্তায় বেশ কিছু বিখ্যাত সিকিমিজ় ও নেপালি রেস্তরাঁ আছে, যেখানে নেপালি থালি থেকে সিকিম ও নেপালের স্ট্রিট ফুড—সবই মজুত। যেহেতু আমাদের হাতে সময় ছিল কেবল এক সন্ধে— তাই আমরা ওইটুকুর মধ্যেই দু'টি রেস্তরাঁয় আলাদা আলাদা খাবার ট্রাই করলাম। একটিতে পর্ক মোমো ও চিকেন শাফালের মতো তিব্বতি খাবার এবং অন্যটিতে ড্যানিশ পেস্ট্রি, মাদেলিন ও জ্যাসমিন টি সহযোগে বিদেশি মিষ্টিমুখ।

পরদিন সকাল-সকাল রওনা দিলাম উত্তর সিকিমের দিকে। গন্তব্য, লা চেন। গুরুদোংমার দেখতে গেলে একরাত্রি লা চেনে কাটিয়ে পরদিন খুব সকাল সকাল বেরিয়ে পড়তে হয়। লা চেন থেকে গুরুদোংমারের দূরত্ব প্রায় ৬৫ কিমি, যা আঁকাবাঁকা পাহাড়ি পথে পাড়ি দিতে অনেকটাই সময় লেগে যায়। বেলাবেলি লেকে পৌঁছতে না পারলে অতটা উচ্চতায় আবহাওয়া প্রতিকূল হয়ে উঠতে থাকে। বাতাসে অক্সিজেন লেভেলের তারতম্য আর ক্রমাগত বেড়ে চলা জোরালো ঠান্ডা বাতাসে লোকালয়বিহীন এলাকায় অসুস্থ হয়ে পড়াও বিচিত্র নয়।

লা চেন যাওয়ার পথে ঝকঝকে নীল আকাশে তুলো-মেঘের আনাগোনা দেখে ভরসা হল, আগামীকালও হ্রদের দর্পণে এই নীলের প্রতিবিম্বই দেখব। ধূসর মেঘেরা বোধহয় শেষ মুহূর্তে আর আমাদের বিষণ্ণ করবে না। পথে পড়ল বাকথং, নাগা সমেত আরও কিছু জলপ্রপাত এবং তিরতিরে, আপনভোলা লা চেন চু ('চু' মানে স্থানীয় ভাষায় 'নদী')।

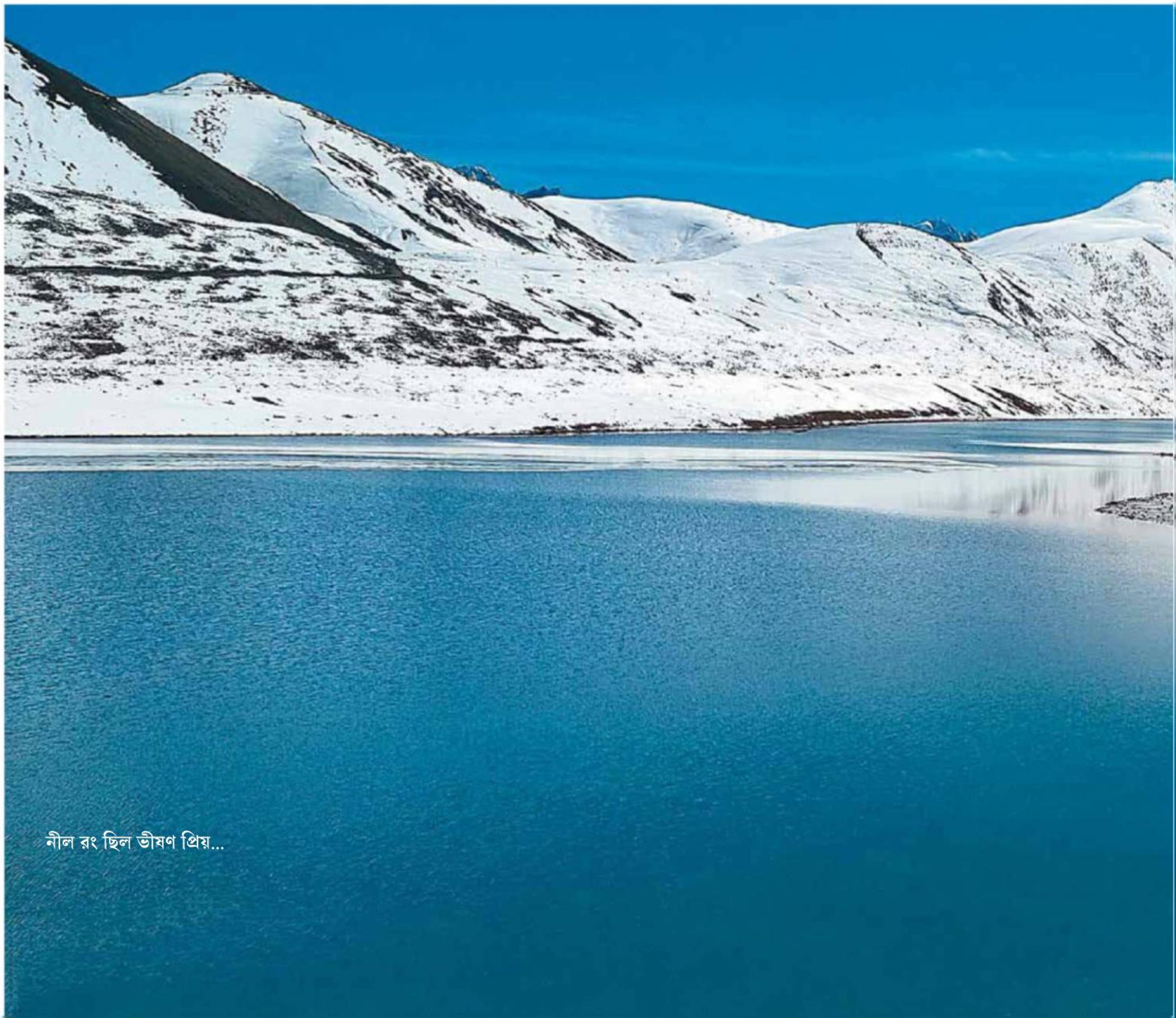
লা চেন পৌঁছতে বিকেল গড়িয়ে প্রায় সন্ধে নেমে এল। মাঝরাস্তায় যানজটে বেশ খানিকক্ষণ ফেঁসে থাকতে হয়েছিল। তবে সবুজ গাছের সারির মাঝে, সোনা-রোদের জাফরি বিছানো পথে আটকে থাকতেও মন্দ লাগে না। গাড়ির জানলা দিয়ে বাইরে ফুটে থাকা নানা রঙের নাম-না-জানা ঘাসফুল আর হরেক পাখির ডাক শুনতে শুনতেই কখন যে রাস্তা পরিষ্কার হয়ে গাড়ির চাকা আবার গড়াতে শুরু করেছিল, সত্যি খেয়ালই করিনি।

লা চেনে গাড়ি থেকে নেমে মালুম হল উত্তর সিকিমের শীত এই নভেম্বরের গোড়াতেই কেমন জোরদার! লাগেজ নিয়ে রুমে ঢুকে হিটার না অন করা অবধি দাঁতকপাটি লেগে যাচ্ছিল প্রায়। ফ্রেশ হয়ে ডাইনিং হলে গিয়ে দেখলাম বাকি ট্যুরিস্টরাও আমাদেরই মতো তাড়াতাড়ি খেয়েদেয়ে হাত-পা গুটিয়ে শুয়ে পড়াই


তুষার-সাম্রাজ্যে...

শ্রেয় মনে করছেন। কেউ কেউ তো আবার রুম থেকে কম্বল জড়িয়েই খেতে চলে এসেছেন! যাই হোক, খাওয়ার পর্ব দ্রুত মিটলেও পরদিন ভোরের যাত্রার কথা ভেবে উত্তেজনায় ঘুম আসছিল না। পরদা সরিয়ে বাইরে দেখি, হালকা জ্যোৎস্না আর কুয়াশায় মাখামাখি ছোট্ট শহরটাকে কেমন রূপকথার দেশ মনে হচ্ছিল। ভাবলাম আর একটু অপেক্ষা করি, তা হলে ঠিক মেঘলোকের ওপার থেকে পরিদেরও নেমে আসা দেখতে পাব। কিন্তু ওই যে পরিরা কেমন জানি আগে থেকেই জানতে পেরে ঠিক আসার আগেই ঘুম পাড়িয়ে দেয়!

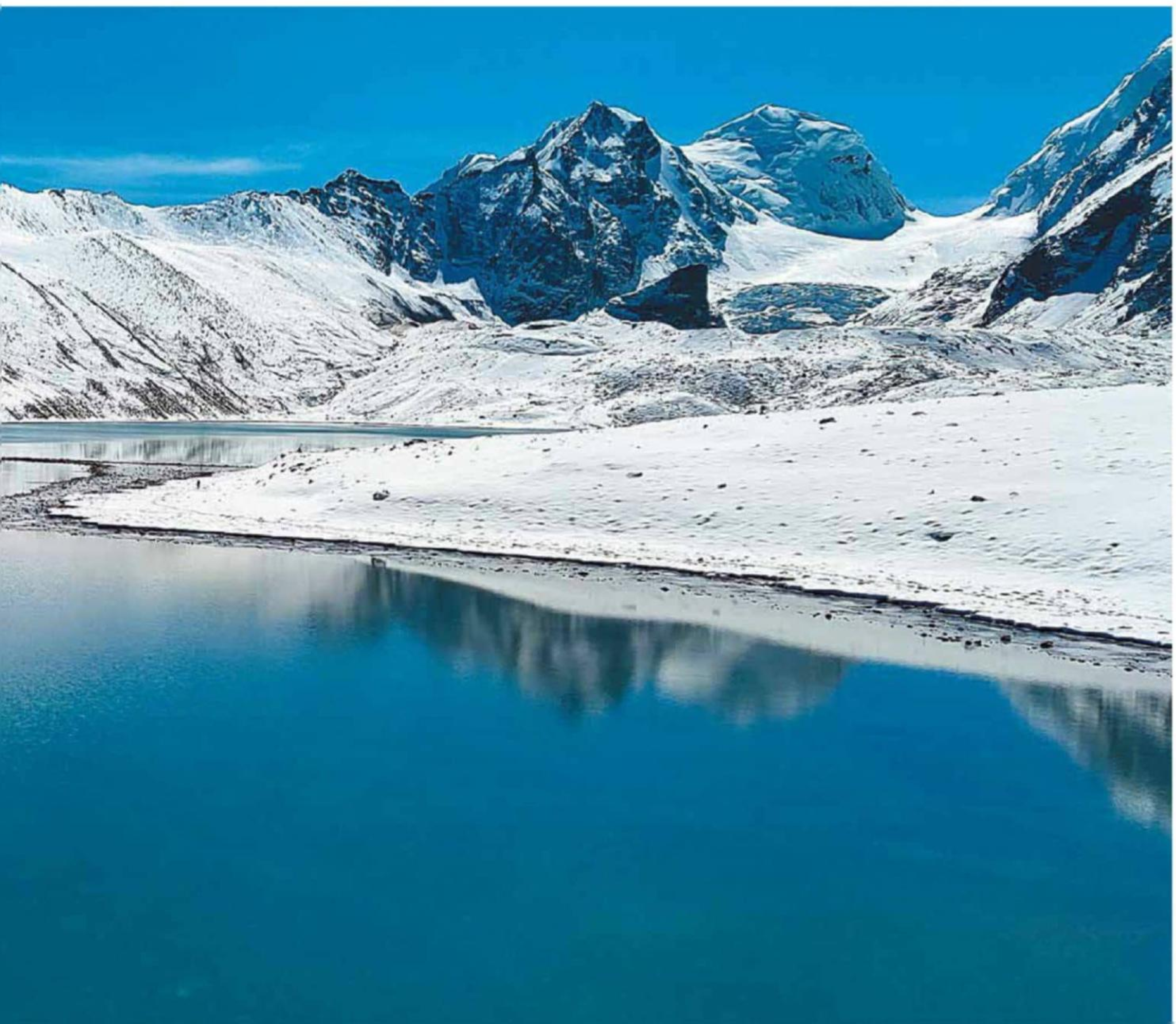
পরদিন অ্যালার্ম বাজার সঙ্গে সঙ্গেই তড়িঘড়ি রেডি হয়ে বাইরে বেরতেই এক অপূর্ব দৃশ্য! হোটেলের সামনের রাস্তা থেকে নাক বরাবর একটু


নীল রং ছিল ভীষণ প্রিয়...

উপরে তাকালেই সোজা সামনে দৃশ্যমান সকালের প্রথম রোদে স্বর্ণালি বরফমোড়া এক পাহাড় চূড়া। যেন এই ক্রমাগত উঁচু হতে থাকা পাহাড়ি পথ গিয়ে শেষ হয়েছে ঠিক ওই অচলেই। বাকি টুরিস্টদের থেকে চাপা হর্ষধ্বনি শুনতে পেয়ে বুঝলাম, যাত্রার শুরুতেই এ অপরূপের দেখা পেয়ে খুশি বাঁধ মানছে না কারওরই। দু'চোখ ভরে তাকে দেখে নিয়ে শুরু হল পথচলা।

পথের মাঝে পড়ল একটি ছোট্ট খাবারের দোকান। রেস্তরাঁর যাবতীয় দেখনদারির বদলে কাঠের দোকানটি রাস্তার ধারে ইতিউতি ছড়ানো বরফের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে। একটি সাদাসিধে নেপালি পরিবার দোকানটি চালান। ভিতরে গনগনে কাঠের আগুনের চারপাশে গোল হয়ে বসে কিছু মানুষ আগুন পোয়াচ্ছেন। বাইরের কনকনে ঠান্ডা থেকে ভিতরে এসে সেই আগুনের ওমে প্রাণে আরাম লাগল। ঠকঠকানি থামলে দেখি দড়িতে টাঙানো শুকনো লালচে বাদামি রঙের কী যেন সব ঝুলছে। ওঁদের জিজ্ঞেস করাতে বললেন, ওগুলো স্থানীয় চমরি গাইয়ের মাংস। শুকোতে দিয়েছেন। আরও ঠান্ডা বাড়লে তীব্র তুষারপাতে যখন কাজকর্ম আর পর্যটনের ঢল কমে যায়, তখন ওগুলোই ওঁদের খোরাক জোগায়। শুনেছিলাম চমরি গাইয়ের মাংস নাকি খুব সুস্বাদু। আমাদের ইচ্ছে থাকলেও সে যাত্রায় আর খাওয়া হয়ে ওঠেনি। সুস্বাদু মোমো খেয়ে বাইরে বেরিয়েই মনটা আরেকদফা ভাল হয়ে গেল। শুভ্র বরফের উপর একটা কালোকুলো নাদুসনুদুস কুকুরছানা তার মা-বাবার সঙ্গে খেলায় মত্ত। নিষ্পাপ প্রাণগুলো মনের জমা সব ক্লেদ যেন ঘুচিয়ে দিল।

আবার যাত্রা শুরু হল। পথে পড়ল বিশ্বের উচ্চতম দোসা পয়েন্ট। আর এক দফা থেমে খাওয়াদাওয়া করে আবার পথচলা শুরু হল। যত এগোচ্ছি, পথ তত বন্ধুর হচ্ছে। প্রকৃতি থেকে সবুজ হারিয়ে গিয়ে তার জায়গা নিচ্ছে তিব্বতীয় মালভূমির রুক্ষ ধূসরতা আর তার উপরে নীলাভ শুভ্র বরফের প্রলেপ। মাঝেমধ্যে পাশ দিয়ে পেরিয়ে যাচ্ছে মিলিটারি গাড়ি। না হলে যতদূর চোখ যায় সীমাহীন শুভ্রতা। কোথাও বরফের উপর রোদ ঠিকরে পড়ছে, আবার কোথাও বা বরফ গলে তিরতির করে ছুটছে ছোট নালা। বেলা আন্দাজ দশটা নাগাদ আমরা একেবারেই বরফঢাকা সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরে এসে পড়লাম। ড্রাইভার দাদা জানালেন আমরা গন্তব্যের কাছাকাছি এসে গিয়েছি। রাশি রাশি বরফের উপর চড়ে বেড়াচ্ছে চমরি গাইয়ের দল, আর তাদের গলায় বাঁধা ঘণ্টার টুংটাং আওয়াজ যেন ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছে প্রায়। সমতলের ঘিঞ্জি ছেড়ে জাদুবলে এ কোন মায়ালোকে এলাম? অবশেষে পৌঁছে গেলাম গন্তব্যে। নীচে গাড়ি থামিয়ে কিছুটা হেঁটে উপরে উঠে যেতে হল। উঠে পৌঁছতেই দীর্ঘদিনের স্বপ্নপূরণ। চোখের সামনে কে যেন একটানে বরফের সাদা পরদা



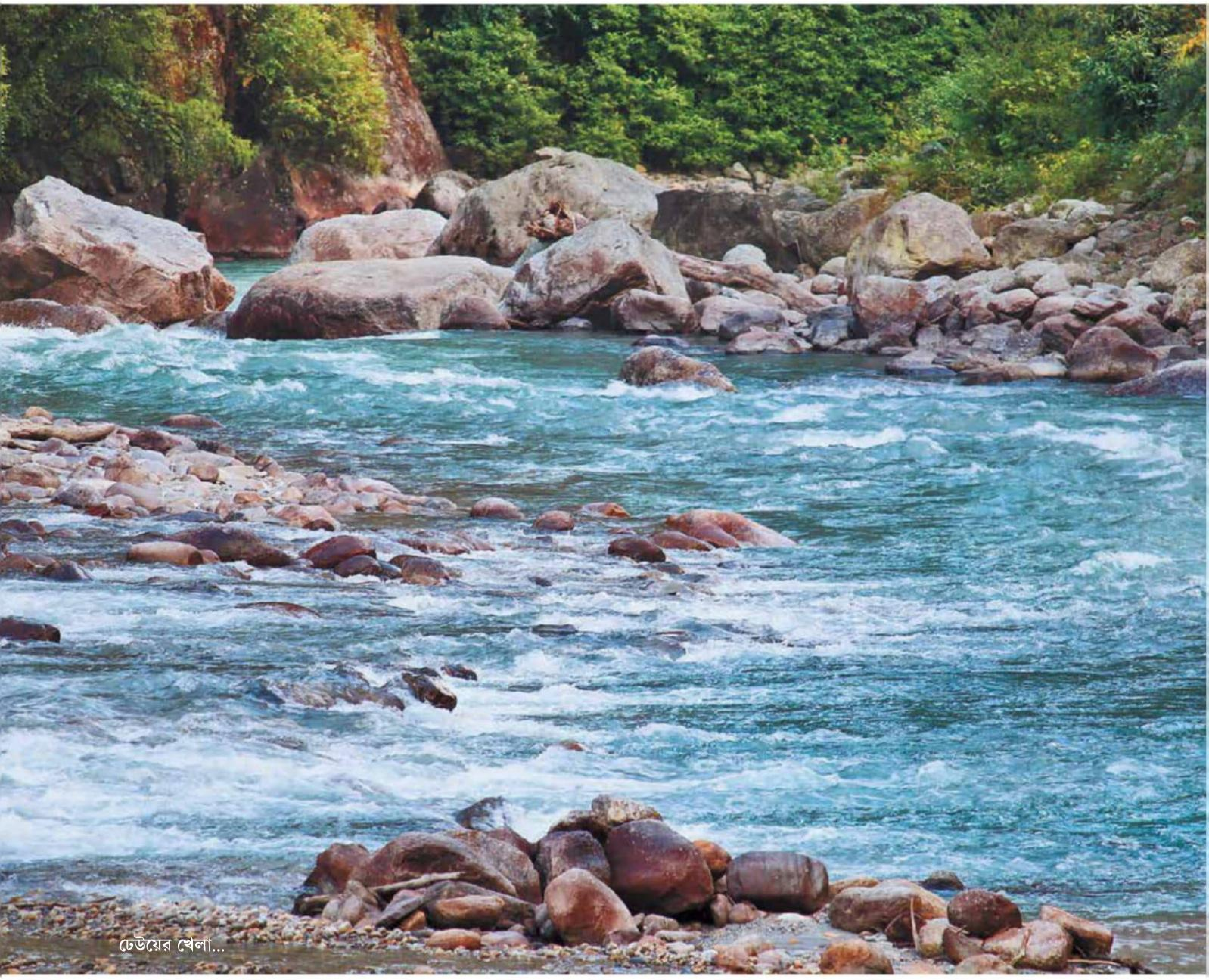

প্রকৃতির নানা রং


ফুল বলে...

টেনে সরিয়ে দিয়ে মেলে ধরেছে বিশাল এক আয়না। তাতে ঝকঝক করছে আকাশের নীল। হ্রদের ধারে পতপত করে উড়ছে রংবেরংয়ের তিব্বতি বৌদ্ধ পতাকা। শান্ত গাম্ভীর্যে প্রকৃতি তার নিজের দর্পণে নিজেরই রূপ দেখতে ব্যস্ত।

স্থানীয় লোকগাথা অনুযায়ী, গুরু পদ্মসম্ভবের আশীর্বাদধন্য এই হ্রদ। প্রাচীনকালে প্রচণ্ড শীতে হ্রদের সমস্ত জল জমে বরফ হয়ে গেলে, পাহাড়ি লোকেরা পানীয় জলের অভাবে কষ্ট পেত। তিব্বত থেকে ফেরার পথে গুরু পদ্মসম্ভব হ্রদের একটি বিশেষ স্থানে হাত রাখেন, যেটি শীতকালেও সবসময় টলটলে জলে ভর্তি থাকে। প্রকৃতিকে ভালবেসে কিছু চাইলে প্রকৃতিও সেই ডাকে সাড়া দেয় তা হলে। আর যা কিছু দৃষ্টিনন্দন, যা কিছু ভালবাসার, তাকে ঘিরেই তো গড়ে ওঠে গল্প। মন ভাল করার গল্প।

‘সীমার মাঝে, অসীম, তুমি বাজাও আপন সুর।’—নীল জলের হ্রদটি ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে দুধসাদা তুষারশৃঙ্গেরা। ফিরে আসতে ইচ্ছে করছিল না, তবু ফিরতে তো হবেই। আবেশ জড়ানো চোখে গাড়িতে উঠে বসলাম। এবার গন্তব্য কালাপাথ্থর। গুরুদোংমার থেকে চোপতা ভ্যালি হয়ে এখানে যেতে হয়। হেলতে দুলতে গাড়ি এগিয়ে চলল। দুপুর নাগাদ ঢুকে পড়লাম কালাপাথ্থরের এলাকায় আর ঢুকেই বুঝলাম এর নাম সার্থক। চারিদিকে রাশি রাশি বরফ আর তার মাঝে মাঝে তলা থেকে গাঢ় কালো পাথরেরা উঁকি দিয়ে সাদরে সাদা-কালোর রাজত্বে আহ্বান জানাচ্ছে। বরফেরা যেন পেঁজা তুলোর মতো নরম। এখানেও চারিদিকে তুষারাবৃত পাহাড়চূড়ারা, আর তাদের গা-মাথা থেকে মেঘের মতো ক্রমাগত উড়ে চলেছে ঘন জলীয় বাষ্প। আর এরই ফাঁকে চমৎকৃত হয়ে



ঢেউয়ের খেলা...

দেখলাম, দুধসাদা পাহাড়ের পাশে ঘন নীল আকাশে বিশাল রামধনু ভেসে উঠেছে। জন্ম যেন সার্থক হল। প্রকৃতি যেন রূপের খনি আলগা করে দিয়েছে! নীচের রাস্তার দিকে চোখ পড়তেই দেখি দুটো পাহাড়ি ছাগল লাফিয়ে লাফিয়ে খেলায় ব্যস্ত। ঘন তুষাররাজ্যে দু'টি স্থানীয় অধিবাসী। ফেরার পথে লা চেন থেকে ব্যাগপত্র নিয়ে পাড়ি দিলাম আর একটি পাহাড়ি জনপদ লা চুংয়ে। রাত্রিবাস ওখানেই। পরদিন গন্তব্য ইয়ুমথাং উপত্যকা। গরম ফুলকো রুটি আর আলুভাজা দিয়ে ব্রেকফাস্ট সেরে রওনা দেওয়া গেল। ২৩ কিমি দূরে ইয়ুমথাংয়ে পৌঁছে দেখি চারিদিকের গুরুগম্ভীর পাহাড়ের মাঝে এ যেন সবুজ গালিচা বিছানো বিশাল এক ঢালু খেলার মাঠ। সবুজের মাঝ দিয়েই বয়ে চলেছে উচ্ছল নীল এক নদী। আপন কলতানে আপনি মুখর। অজস্র গোল নুড়িপাথরেরা তার খেলার সঙ্গী। তীব্র হাওয়ার দাপটে ইয়ুমথাং যেন আমাদেরও ছেলেখেলার পাগলামির নেশায় মাতিয়ে ছাড়বে। শুনলাম এপ্রিল-মে মাসে রডোডেনড্রন সহ নানা ফুলের সমারোহে সেজে ওঠে এই উপত্যকা। এ যাত্রায় সেই নন্দনকাননকে দেখা হল না। হয়তো সেই সৌন্দর্যও উপভোগ করে নেব, পরে কখনও। আপাতত নয়নাভিরাম উপত্যকায় চমরি গাইয়ের পিঠে চড়ে আর নদীর তীরে নুড়িপাথর সাজিয়ে রওনা দিলাম দক্ষিণ সিকিমের দিকে। সে এক অন্য গল্প।

ছবি: লেখক ও আইস্টক

## কীভাবে যাবেন

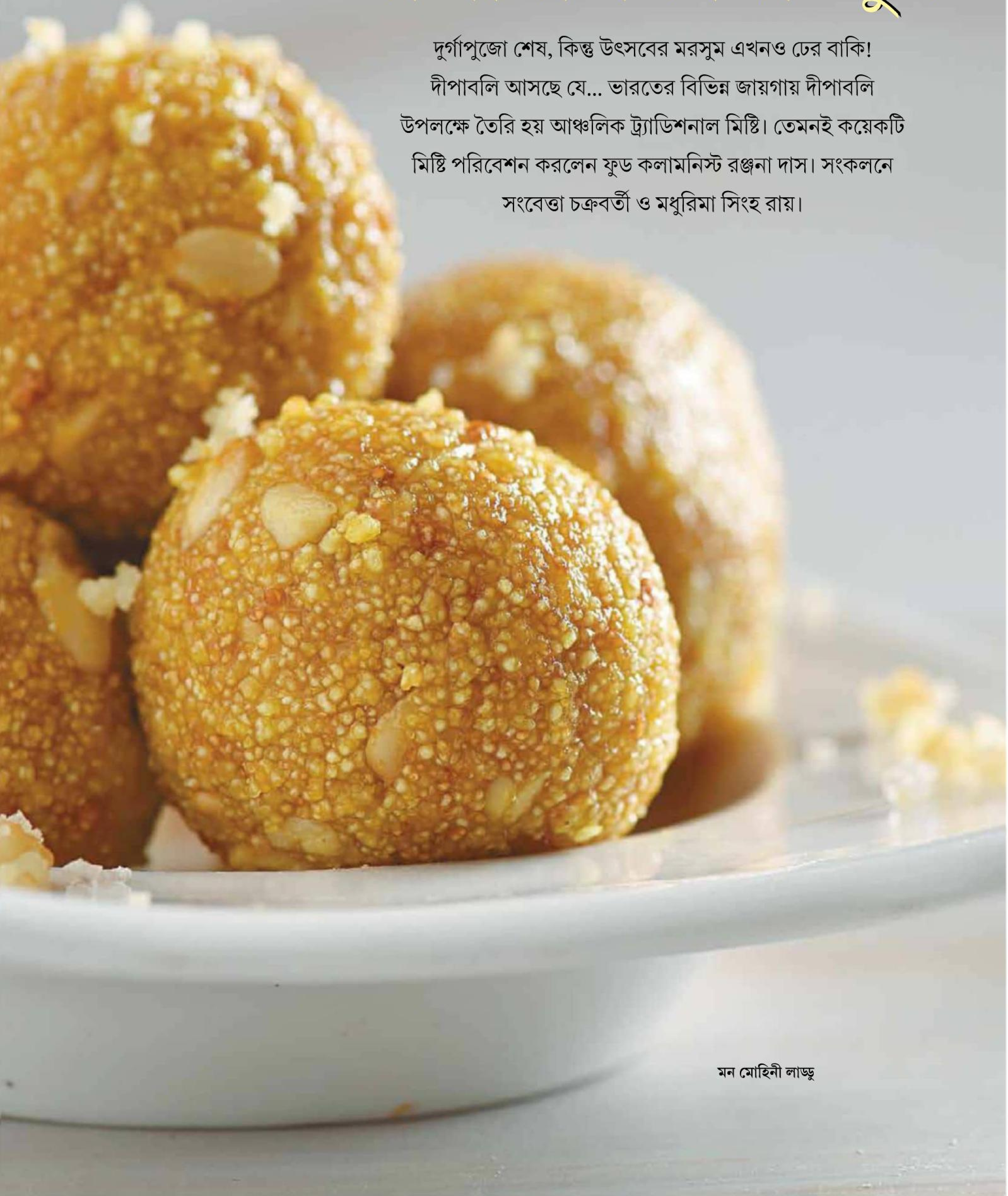
সিকিমে বহু স্থানীয় টুরিস্ট এজেন্সি আছে, তাদের সঙ্গে আগে বুকিং সেরে রাখলে এনজেপি স্টেশনে তাদের গাড়ি অপেক্ষা করবে। না হলে এনজেপি থেকে গাড়ি ভাড়া করে গ্যাংটক, এবং সেখান থেকে গাড়ি নিয়ে লা চেন, লা চুং যাওয়া যায়।

## কখন যাবেন

বছরের সবসময়ই সিকিমের এক এক রূপ, তবে তারই মধ্যে ভাল হল অক্টোবরের মাঝ থেকে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি অথবা মার্চ থেকে মে।

# দীপাবলির মিষ্টিমুখ

দুর্গাপুজো শেষ, কিন্তু উৎসবের মরসুম এখনও ঢের বাকি! দীপাবলি আসছে যে... ভারতের বিভিন্ন জায়গায় দীপাবলি উপলক্ষে তৈরি হয় আঞ্চলিক ট্র্যাডিশনাল মিষ্টি। তেমনই কয়েকটি মিষ্টি পরিবেশন করলেন ফুড কলামনিস্ট রঞ্জনা দাস। সংকলনে সংবেত্তা চক্রবর্তী ও মধুরিমা সিংহ রায়।



মন মোহিনী লাড্ডু

মিষ্টিপ্রিয় আমরা, পুজোর ক'দিন চুটিয়ে মিষ্টি খেয়েছি। বিজয়াতে তো কথাই নেই, মিষ্টি না হলে বিজয়াই অসম্পূর্ণ! এবার মিষ্টি ছেড়ে আবার রোজকার ডায়েটে ফিরতে হবে ভেবে মন খারাপ করছেন নাকি? আরে দাঁড়ান! আলোর উৎসব দীপাবলি তো এল বলে, মিষ্টি বাদ দিয়ে তাকেও বা ভাবা যায় নাকি? এবার মিষ্টিতে বরং একটু স্বাদবদল হোক। দেশের নানা প্রান্তে দীপাবলি উপলক্ষে বানানো হয় রকমারি মিষ্টি। সেই সব আঞ্চলিক মিষ্টির সুগন্ধে ম-ম করে উঠুক আপনার রান্নাঘর। ভাবছেন, গোটা দিনটা মিষ্টি বানানোতেই কেটে গেলে প্রদীপ জ্বালানো, বাজি পোড়ানো— এ সব করবেন কখন? রেসিপি দেখলেই বুঝতে পারবেন, বানানো ঝামেলার নয়। আর স্বাদ? সে আপনারা নিজেরাই চেখে দেখুন!

## মন মোহিনী লাড্ডু

*উত্তর ভারতে যে কোনও উৎসব-অনুষ্ঠানেই জনপ্রিয় লাড্ডু। দীপাবলিতেও এই মিষ্টি আবশ্যক...*

**উপকরণ:** বেসন ১ বাটি, সুজি ১ বাটি, গুঁড়ো দুধ ৪ চা-চামচ, নুন স্বাদমতো, ঘি ৪ চা-চামচ (ময়ানের জন্য), জল প্রয়োজনমতো, সাদা তেল (ভাজার জন্য), চিনি ২ কাপ, জল ১ কাপ।

**প্রণালী:** বেসন, সুজি ও নুন একসঙ্গে মিশিয়ে তাতে ঘি ও অল্প অল্প জল দিয়ে ভাল করে মেখে নিন। ডো তৈরি হয়ে গেলে ১০ মিনিটের জন্য রেখে দিন। অন্য একটি পাত্রে চিনি ও জল ফুটিয়ে চিনির রস তৈরি করে রাখুন। ডো থেকে চ্যাপ্টা আকারে লেচি তৈরি করে তেলে ভেজে নিন। ঠান্ডা করে মিশ্রণটি মিক্সিতে গুঁড়ো করে নিন। ভেজানো চারমগজ আর কাজু ঘি দিয়ে ভেজে নিন। মিশ্রণটিতে চিনির রস একটু একটু করে ঢালুন। ভেজে রাখা ড্রাই ফ্রুটস দিন। সব একসঙ্গে মেখে গোলাকার লাড্ডু গড়ে নিন। পরিবেশন করুন।

## মাওয়া কচুরি

*রাজস্থানের বিখ্যাত মিষ্টি মাওয়া কচুরি। মুচমুচে মিঠে ক্রাস্ট এবং ড্রাই ফ্রুটসের মিলমিশ জিভে জল আনতে বাধ্য।*

**উপকরণ:** ময়দা ২ কাপ, ঘি ১/৪ কাপ, মাওয়া ১ কাপ, ড্রাই ফ্রুটস পরিমাণ অনুযায়ী, চিনি প্রয়োজনমতো, এলাচগুঁড়ো সামান্য, কেশর সামান্য, ভাজার জন্য ঘি। চিনির সিরাপের জন্য: চিনি ১ কাপ, জল ১/২ কাপ।

**প্রণালী:** ময়দায় ঘি মিশিয়ে, ভাল করে ময়ান দিন। অল্প জল ব্যবহার করে, মেখে নরম ডো বানিয়ে নিন। ডো-টা ঢাকা দিয়ে রাখুন ২০ মিনিট। এরপর কড়াই বসান অল্প আঁচে। মাওয়া দিয়ে, ভালভাবে নাড়াচাড়া করতে থাকুন। মাওয়া থেকে ঘি বেরিয়ে এলে, নামিয়ে নিয়ে ঠান্ডা করতে দিন। ঠান্ডা হয়ে গেলে মাওয়ার মধ্যে চিনি এবং ড্রাই ফ্রুটস মিশিয়ে একটা মণ্ড তৈরি করে নিন। অন্য একটা প্যানে এক কাপ চিনি এবং ১/২ কাপ জল দিয়ে চিনির সিরাপ বানিয়ে নিন। সিরাপের মধ্যে কেশর এবং এলাচগুঁড়ো মিশিয়ে ঢাকা দিয়ে রাখুন। এরপর মেখে রাখা ময়দা থেকে ছোট ছোট কচুরি বানিয়ে নিন। মাওয়া ভরে নিন প্রতিটা কচুরির ভিতর। কচুরিগুলো হালকা গরম ঘিয়ে, একদম নিভু-নিভু আঁচে ভেজে নিন। নামিয়ে, চিনির সিরাপে বেশ খানিকক্ষণ ডুবিয়ে রাখুন। তারপর তুলে নিয়ে ড্রাই ফ্রুটস ছড়িয়ে দিন কচুরিগুলোর উপর। মাওয়া কচুরি তৈরি!

## চিরঞ্জি বরফি

*চিরঞ্জিকে বলা যায় এক ধরনের 'আমন্ড-ফ্লেভার্ড সিড'। এই চিরঞ্জি দিয়ে তৈরি বরফি শুধু দীপাবলিতেই নয়, নবরাত্রিতেও ভালবেসে*



মাওয়া কচুরি



চিরঞ্জি বরফি

*খান মানুষ।*

**উপকরণ:** চিরঞ্জি ১ কাপ, গুঁড়ো চিনি ১ কাপ, গ্রেট করা খোয়া ১০০ গ্রাম, গলানো ঘি পরিমাণমতো, আমন্ড স্লাইস সাজানোর জন্য।

**প্রণালী:** প্রথমে শুকনো কড়াইয়ে চিরঞ্জি রোস্ট করে নিয়ে, গুঁড়ো করে নিন। পাত্রে ঘি বসিয়ে, চিরঞ্জিগুঁড়ো দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে নিন। ঝুরঝুরে হয়ে এলে, সরিয়ে রাখুন। অন্য পাত্রে কুরনো খোয়া নিন। পরিমাণ অনুযায়ী চিনি দিয়ে, ভাল করে মিশিয়ে কড়াইয়ে নেড়ে নিন কিছুক্ষণ। যখন খোয়া থেকে ঘি ছেড়ে আসবে, তখন এর সঙ্গে চিরঞ্জি মিশিয়ে, আবার ভাল করে নাড়াচাড়া করতে থাকুন। এই মিশ্রণে আরও একটু ঘি মিশিয়ে নিন। একটু মাখামাখা হয়ে এলে, একটা গ্রিজ় করা পাত্রে সেট করে নিন মিশ্রণটা। উপর দিয়ে আমন্ড স্লাইস ছড়িয়ে, ফ্রিজে রেখে দিন কিছুক্ষণ। বের করে, বরফির আকারে কেটে পরিবেশন করুন।

## উক্কারাই

*তামিল নাড়ুর ট্র্যাডিশনাল দীপাবলির মিষ্টি। চেট্টিনাড় কুইজ়িনের অন্যতম অঙ্গ এই মিষ্টির মূল উপাদান ডাল ও গুড়। অনেকে মুগডাল দিয়েও বানান এটি।*

**উপকরণ:** ছোলার ডাল ২৫০ গ্রাম, ঘি ৪ চা-চামচ, কাজু ২৫ গ্রাম, গুড় ১ কাপ, জল আধ কাপ।

**প্রণালী:** ছোলার ডাল শুকনো কড়াইতে রোস্ট করে দু'ঘণ্টা জলে ভিজিয়ে রাখুন। জল ঝরিয়ে গ্রাইন্ডারে ডাল বেটে নিন। একেবারে মিহি করার দরকার নেই, একটু দানা-দানা রাখতে পারেন। একটি জলভর্তি পাত্রের উপরে অন্য একটি পাত্র রাখুন, যার নীচের দিকে অনেকগুলো ছিদ্র আছে। এই পাত্রে ডালবাটা ছড়িয়ে ১০-১২ মিনিট মতো স্টিমারে স্টিম করে নিন। ডাল জমাট বাঁধা অবস্থায় এলে আবার একবার মিক্সিতে পিষে নিন। একটি পাত্রে গুড় ও জল ফুটিয়ে সিরাপ বানিয়ে নিন। ডালবাটায় এলাচগুঁড়ো,





উক্কারাই

নুন মিশিয়ে তাকে গুড়ের সিরাপে দিন। ভাল করে মিশিয়ে অল্প আঁচে পাঁচ মিনিটের জন্য ফুটিয়ে নিন। এক চামচ ঘি দিন। আঁচ থেকে নামিয়ে মিশ্রণটি ক্রমাগত নাড়াচাড়া করতে থাকুন, ভিতরের গরমভাব কেটে ঠান্ডা হয়ে আসবে। হয়ে গেলে উপর থেকে ঘিয়ে ভাজা কাজু ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

## করাঞ্জি

*শুধু দীপাবলিতেই নয়, গণেশ চতুর্থীতেও মহারাষ্ট্রের পরিবারে করাঞ্জি তৈরি হয়। গুজিয়া বা ঘুগরা নামেও পরিচিত এই মিষ্টি।*

উপকরণ: ময়দা ২ কাপ, ঘি ২ টেবলচামচ (ময়ানের জন্য), গরম জল ও নুন পরিমাণমতো, সাদা তেল (ভাজার জন্য)। **স্টাফিংয়ের জন্য:** ঘি ২ চা-চামচ, নারকেল (কুরনো) ১ কাপ, কাজু-কিশমিশ পরিমাণমতো, চিনির গুঁড়ো পরিমাণমতো।

প্রণালী: ময়দায় নুন ও ঘি ময়ান দিয়ে মেখে নিন। অল্প অল্প গরম জল দিন। নরম ডো তৈরি করে মিনিট কুড়ির জন্য ঢেকে রেখে দিন। কড়াইতে কাজু, কিশমিশ, নারকেল সামান্য ঘিয়ে ভেজে নিন। ঠান্ডা করে তাতে গুঁড়ো চিনি মেশান। মেখে রাখা ডো-এর থেকে ছোট ছোট লেচির আকারে গড়ে ভিতরে কাজু-কিশমিশ-নারকেলের পুর ভরে দিন। পুলির আকারে গড়ে ঘি ও সাদা তেলে ভেজে তুলুন। দু'পিঠ লালচে হয়ে এলে নামিয়ে নিন।



## রসবালি

*ওড়িশার 'হেরিটেজ ডেসার্ট'। দীপাবলিকে মিঠে করে তুলতে রসবালির জুড়ি নেই।*

উপকরণ: দুধ ২ কাপ, কেশর অল্প, চিনি ৩ টেবলচামচ, গুঁড়ো দুধ ৩ টেবলচামচ, এলাচগুঁড়ো $^{১}/_{৪}$ চা-চামচ, পনির ১০০ গ্রাম, সুজি ১ চা-চামচ, ময়দা, ১ চা-চামচ, ভাজার জন্য সাদা তেল, সাজানোর জন্য ড্রাই ফ্রুট এবং তবক।

প্রণালী: প্রথমে পরিমাণ অনুযায়ী দুধ, চিনি, গুঁড়ো দুধ এবং কিছুটা কেশর একসঙ্গে ভালভাবে জ্বাল দিয়ে, ঘন ক্ষীরের মতো করে নিন। মিশ্রণটা নামিয়ে, তাতে এলাচগুঁড়ো মিশিয়ে, ঢাকা দিয়ে রাখুন। অন্যদিকে একটি চওড়া পাত্রে পনির গ্রেট করে, তার মধ্যে সুজি আর ময়দা মেশান। হাতের তালু দিয়ে ভালভাবে মেখে নিতে হবে। চ্যাপ্টা-চ্যাপ্টা টিকিয়ার মতো গড়ে, সাদা তেলে ভেজে নিন। টিকিয়াগুলো গরম থাকা অবস্থাতেই ক্ষীরের ভেতর দিয়ে দিন। ঢাকা দিয়ে, বেশ খানিকক্ষণ রাখুন। উপর



করাঞ্জি

থেকে তবক লাগিয়ে, ড্রাই ফ্রুট ছড়িয়ে পরিবেশন করুন এই মিষ্টি।

## পিন্নি

*আদতে আটার লাড্ডু। বানানো যেমন সহজ, খেতে তেমনই সুন্দর।*

**উপকরণ:** আটা ২৫০ গ্রাম, গলানো ঘি ৩০০ গ্রাম, জল ৪ টেবলচামচ, গুঁড়ো চিনি ১$^{১}/_{৪}$ কাপ, গ্রেট করা খোয়া ১০০ গ্রাম, ঠান্ডা দুধ ৪ টেবলচামচ, এলাচগুঁড়ো সামান্য, মিক্সড ড্রাই ফ্রুট পরিমাণমতো।

**প্রণালী:** প্রথমে আঁচে পাত্র বসান। তাতে গলানো ঘি নিয়ে, মাপ অনুযায়ী আটা মিশিয়ে নিন। ভাল করে রান্না করুন, ১২ থেকে ১৫ মিনিট। মিশ্রণের রং বাদামি হয়ে এলে, ১ চা-চামচ জল মিশিয়ে আবার কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করুন। খানিকক্ষণ পরে আবার ১ চামচ জল মেশান এবং নাড়তে থাকুন। এভাবে চার চামচ জল মিশিয়ে, ভাল করে মিশ্রণটা তৈরি করে, গ্যাস থেকে নামিয়ে নিন। একটা ট্রে-তে ভালভাবে ছড়িয়ে, ঠান্ডা করতে দিন। খোয়া, এলাচগুঁড়ো,



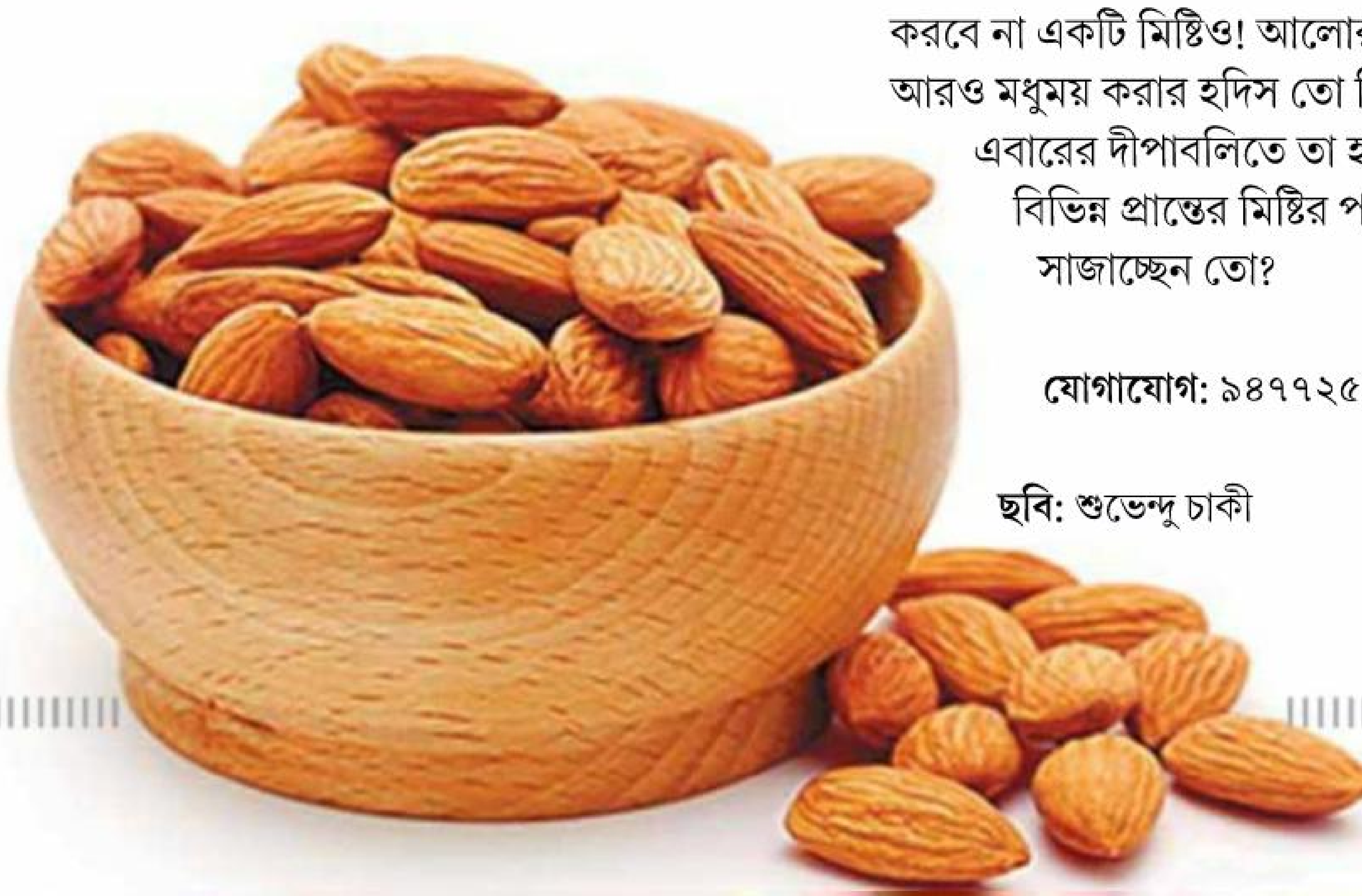
রসবালি



পিন্নি

প্রয়োজন অনুযায়ী চিনি এবং ড্রাই ফ্রুট্স ভালভাবে মিশিয়ে নিন একসঙ্গে। মিশ্রণে খুব সামান্য দুধ দিয়ে, আর একবার ভালভাবে মিশিয়ে নিন। তারপর হাতের সাহায্যে গোল গোল বলের আকারে গড়ে নিন। পেস্তাকুচি দিয়ে সুন্দর করে গার্নিশ করে, পরিবেশন করুন পিন্নি।

এর বাইরেও সারা দেশের নানা প্রান্তে অসংখ্য রকমের ট্র্যাডিশনাল মিষ্টি সহযোগে দীপাবলি উদযাপন করেন মানুষ। শুধু তো আলোর উৎসব নয়, স্বাদেরও উৎসব বটে! রেসিপিগুলো যতটা সম্ভব অথেন্টিক রাখার চেষ্টা করলেও, হয়তো আঞ্চলিক কিছু ভ্যারিয়েশন এখানে তুলে ধরা গেল না। কিন্তু বাড়িতে বানাতে চাইলে, এভাবেই ট্রাই করে দেখতে পারেন। স্বাদে আপনাকে হতাশ করবে না একটি মিষ্টিও! আলোর উৎসবকে আরও মধুময় করার হদিস তো দিয়ে দিলাম। এবারের দীপাবলিতে তা হলে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মিষ্টির পসরা সাজাচ্ছেন তো?



**যোগাযোগ:** ৯৪৭৭২৫০৬৬৫

**ছবি:** শুভেন্দু চাকী



ছবি: আর্কাইভ

কিছুদিন আগে মঞ্চের টানে কলকাতায় এলেন বর্ষীয়ান অভিনেতা অমোল পালেকর। রিহার্সালের ফাঁকে গ্রিনরুমে তাঁর মুখোমুখি পায়েল সেনগুপ্ত ও মধুরিমা সিংহ রায়।

# “৭৫-এ পা দেওয়ার পরে স্ত্রী বললেন আবার স্টেজে পারফর্ম করছ না কেন?”

**এত বছর পরে কলকাতায় এলেন। এই শহরটার সঙ্গে নিশ্চয়ই অনেক স্মৃতি, ভাল লাগা জড়িয়ে আছে। সেগুলো একটু ভাগ করে নিন না...**

কলকাতা আমার মনে সবসময় বিশেষ একটি স্থান দখল করে আছে। শুধু মনে নয়, আমার জার্নি ও আমার জীবনেও কলকাতা খুব স্পেশ্যাল। ইটস অলওয়েজ় আ প্লেজ়ার কামিং টু কলকাতা। এখানে এলে পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করি। যে নাটকটির জন্য এবারে আসা, সেটিও খুব স্পেশ্যাল। এই কলামন্দিরের মঞ্চেই আমি ১৯৭৪ সালে পারফর্ম করেছিলাম। প্রায় ৫০ বছর হতে চলল! ‘অনামিকা’র উদ্যোগে সেবার কলকাতায় একটি ইয়ুথ ফেস্টিভ্যালের আয়োজন করা হয়েছিল। সে সময়ে আমি একজন তরুণ থিয়েটার-উৎসাহী ছিলাম বলা যেতে পারে (হাসি)! সেখান থেকে আজ পর্যন্ত বেশ সুদীর্ঘ জার্নি। ইট’স গুড টু বি ব্যাক। বাঙালি পরিচালকদের সঙ্গেও কাজ করেছি। সত্যজিৎ রায়, তপন সিনহা, হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়, বাসু চট্টোপাধ্যায়... বাংলার সঙ্গে আমার যোগাযোগ নিবিড় বলতে পারেন। তবে শহরটা অনেক বদলে গিয়েছে। গতকাল যখন আসছিলাম (সাক্ষাৎকারের আগের দিন), রাস্তা দিয়ে দেখলাম পুজোর আগে শহরটা বিজ্ঞাপনে মুড়ে গিয়েছে প্রায়।

**আপনি তো বাংলা ছবিতেও অভিনয় করেছেন। বাঙালি সংস্কৃতি আপনার অভিনয়কে কতটা প্রভাবিত করেছে?**

এই কথাটা মহারাষ্ট্রে আমার বাড়িতে

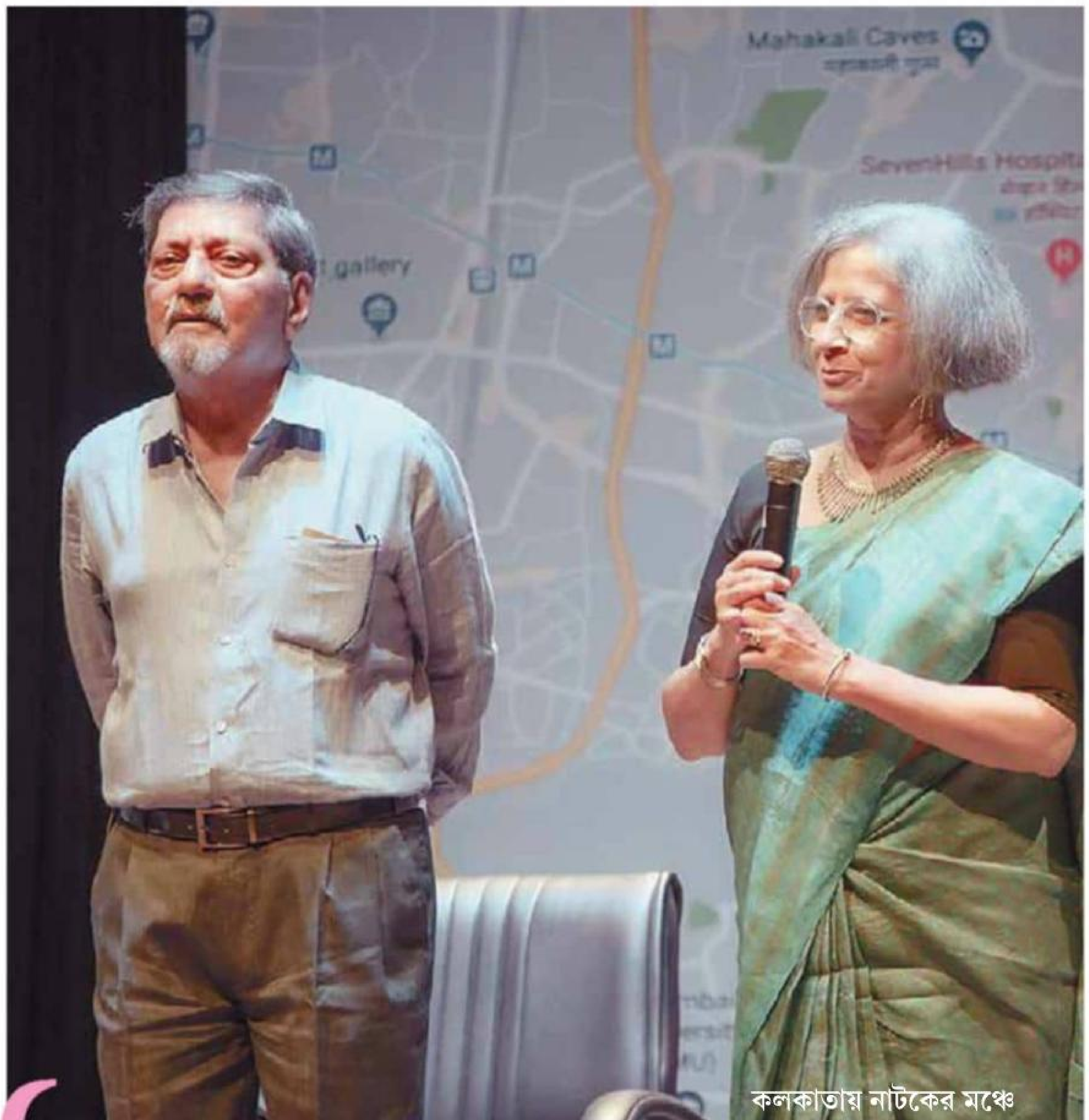
শুনলেই লোকজন রেগে যান। মরাঠি সংস্কৃতির চেয়ে বাঙালিয়ানাই বোধহয় বেশি আমার মধ্যে। মহারাষ্ট্রের মানুষেরা আমাকে যেভাবে ভালবেসেছেন, তাতে মনে হয় ওঁরা তো আমার ঘরেরই লোক। তাই ভাল তো বাসবেনই। কিন্তু বাঙালিরাও অকুণ্ঠ ভালবাসা দিয়েছেন।

**এতবছর পরে থিয়েটারে ফিরলেন। দর্শকদের এতদিন অপেক্ষা করিয়ে রাখলেন কেন?**

বছর চারেক আগে যখন ৭৫-এ পা দিলাম, আমার স্ত্রী বললেন পার্টি বা আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গে সেলিব্রেট না করে, স্টেজে পারফর্ম করছ না কেন? প্রায় ২৫ বছর আমি মঞ্চে অভিনয় করিনি। স্ত্রী বললেন, 'আবার শুরু করছ না কেন?' আমি একটু দ্বিধায় ছিলাম, বললাম, 'আমি ঠিক জানি না এখন আবার এতদিন পরে পারফর্ম করতে পারব কি না!' ও-ই তখন একটি নাটক লেখে, 'কুসুর'। লিখে এনে আমাকে বলল, 'এবার দ্যাখো এই নাটকে অভিনয় করবে কিনা'। ইট ওয়াজ় আ হিউজ চ্যালেঞ্জ। একটু ভয়ও পেয়েছিলাম। এতদিন ধরে অভ্যেস নেই যে! সিনেমার ক্ষেত্রে তো রিটেকের সুবিধে আছে। একটি লাইন শিখে বুঝে নিয়ে শট দিতে পারেন। শট শেষ হয়ে গেলে সেই দৃশ্যটি ভুলে পরেরটিতে মনোনিবেশ করতে পারেন। থিয়েটারে অন্তত টানা দেড় ঘণ্টা ধরে রাখতে হয়। একদম আলাদা ধরনের এনার্জির প্রয়োজন হয়। আমি নিশ্চিত ছিলাম না, সেই এনার্জি, সেই প্যাশন আমি এখন ধরে রাখতে পারব কিনা। ৮০-৮৫ মিনিট এই বয়সে স্টেজে থাকা ও পারফর্ম করা খুব সহজ নয়। নিজে ভুল করলে অন্য কাউকে দোষ দেওয়ারও নেই এখানে। নিজেকেই সেই ভুল শুধরে এগোতে হয় (হাসি)।

**এরকম কখনও হয়েছে যে কোনও চরিত্র, তা সে থিয়েটারের হোক বা সিনেমার, আপনার সঙ্গে দীর্ঘদিন থেকে গিয়েছে? মানে, শুটিং শেষ হওয়ার পরেও চরিত্রটি থেকে আপনি আলাদা হতে পারেননি...**

না। তবে তা হয়তো আমার নিজস্ব পদ্ধতি। কোনও সিনেমা বা থিয়েটার প্রডাকশনের কাজ শেষ হয়ে গেলে আমি সেই চরিত্রের মোড়ক থেকে বেরিয়ে আসি। যা হয়েছে ভুলে গিয়ে মনকে একেবারে ক্লিন স্লেটের মতো গড়ে নিই। ছবি সফল হোক, বা ব্যর্থ হোক, আমি প্রশংসিত হই...যা-ই হোক না কেন, আই স্টার্ট অল ওভার এগেন। পরের প্রজেক্টে আমি একেবারে নবাগত হিসেবে কাজ শুরু করি।




কলকাতায় নাটকের মঞ্চে

মরাঠি সংস্কৃতির চেয়ে বাঙালিয়ানাই বোধহয় বেশি আমার মধ্যে। মহারাষ্ট্রের মানুষেরা আমাকে যেভাবে ভালবেসেছেন, তাতে মনে হয় ওঁরা তো আমার ঘরেরই লোক। তাই ভাল তো বাসবেনই। কিন্তু বাঙালিরাও অকুণ্ঠ ভালবাসা দিয়েছেন।

**সম্প্রতি আপনি ওটিটি-তেও কাজ করলেন। গত বছর '২০০ হাল্লা হো'-তে অভিনয় করলেন। ওটিটি-তে নানাধরনের কনটেন্ট নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ রয়েছে। সেন্সরশিপও অত কড়া নয়। ওটিটি কি একজন শিল্পীকে অনেক বেশি সৃজনশীল স্বাধীনতা দিচ্ছে বলে মনে হয়?**

সেন্সরশিপের কথা বললে শুধু অফিশিয়াল সেন্সরশিপের কথাই বলা হয়। সেন্সরবোর্ড কী বলছে, তাদের নানা নিয়ম-কানুন ইত্যাদি। কিন্তু আনঅফিশিয়াল সেন্সরশিপের কথা কে বলবে? এটি তো আমাদের দেশে ক্রমশই মাথাচাড়া দিচ্ছে। কোথাও ধর্মীয় আবেগে আঘাত লাগলে সেই ছবির প্রদর্শন বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। সেক্সুয়াল ফ্রিডম পছন্দ নয়, অতএব তার উপরে ফতোয়া। এটিও তো সেন্সরশিপ! আমি কী দেখতে চাই, আর কী দেখতে চাই না, সেটি আমার সেন্সিবল সিদ্ধান্ত হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু অন্য কেউ যদি আমাকে বলে দেন, আমি কী দেখব, আমি কী পোশাক পরব বা পরব না...এ ধরনের নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে আমি সবসময় প্রতিবাদ করেছি।



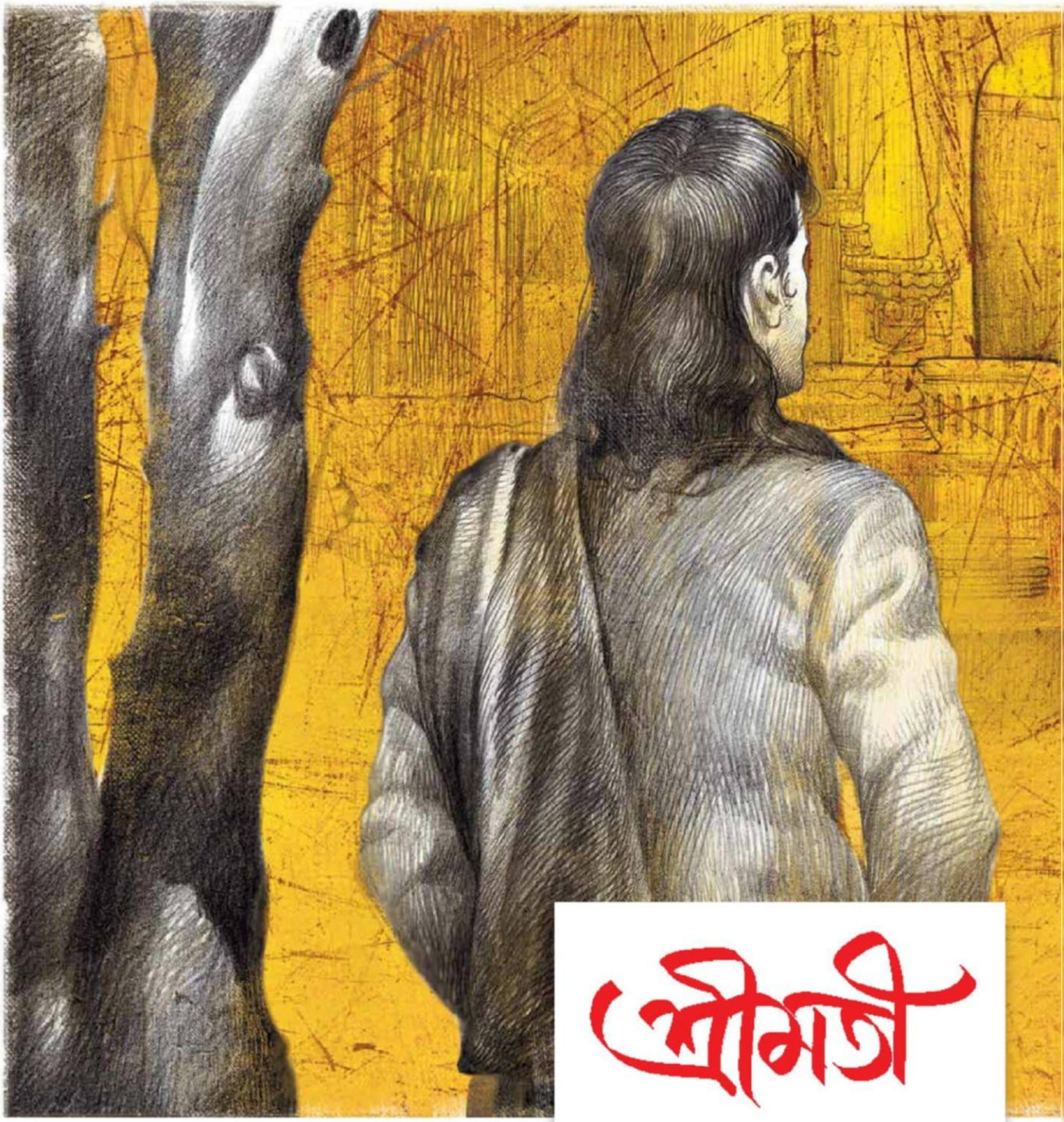
**আপনার সেরা সময়ে আপনি মূলত বয় নেক্সট ডোর ইমেজের জন্যই জনপ্রিয় ছিলেন। সব সময় এ ধরনের ইমেজ পছন্দ হত?**

'বয় নেক্সট ডোর' ইজ় আ ব্রড টার্ম। 'খামোশ', 'ভূমিকা', 'ঘরোন্দা'-র মতো ছবি করেছি। এ সব ছবিতেই গ্রে শেড থাকলেও তা সাধারণ মানুষের জীবন থেকে উঠে আসা চরিত্র ছিল। যত ছবি করেছি, প্রতিটির চরিত্রকে, তাদের নানা শেডকে এক্সপ্লোর করার চেষ্টা করেছি।

**শেষ প্রশ্ন, ছবি আঁকা কেমন চলছে?**

এক্সেলেন্ট! একটা বড় শো করতে চলেছি পেন্টিংয়ের। কলকাতাতেও হতে পারে প্রদর্শনী।

**দ্বিতীয় পাতার প্রথম ছবি সৌজন্যে: 'গুঞ্জন'**



# শ্রীমতী

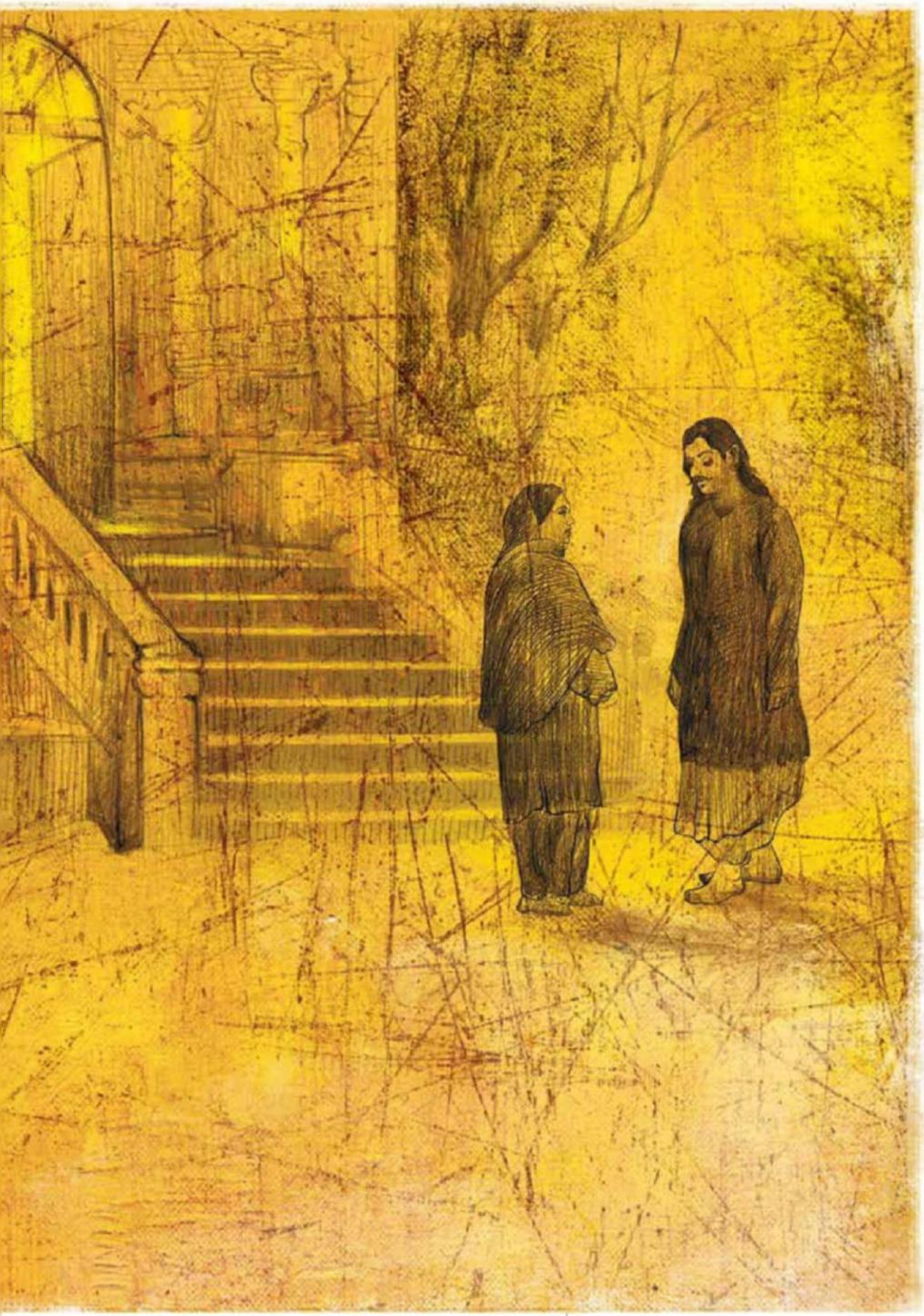
## তাপস রায়

আগের ঘটনা

শ্রীমতির বাড়িতে রাত কাটায় মোহনচাঁদ। ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ে তারা। বিদায় নেওয়ার আগে, মোহনচাঁদকে শ্রীমতী বলে তাকে সিঁদুর পরিয়ে দিতে। রাম বসুর বাড়িতে যায় নিত্যানন্দ। হরু ঠাকুরের উপর বেজায় চটে রয়েছে সে। রাম বসু তাকে তাড়াতাড়ি বিদায় করতে পারলে বাঁচে। কিন্তু নিত্যানন্দ নানা গল্প শুরু করে হরু ঠাকুরকে নিয়ে। তারপর...

{৭}

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, বেশ তো বেশ তো, তারপর!" নিতে গোঁসাই থেমেছে। কারণ তার কল্কেয় নতুন টিকে লাগিয়ে দিয়েছে এ বাড়ির চাকর রাখহরি। আগুন দেওয়ার পর কতকখানি পর পর না টান দিলে আগুন ধরবে না তামাকের মণ্ড-সহ নারকোলের ছোবড়ায়। তাড়াহুড়োর



টানে মুখের ভিতর নারকোল মালায় থাকা জল চলে এসেছে। নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী এক হাতে ধুতি সামলে অন্য হাতে হুঁকো নিয়ে দরোজার বাইরে গিয়ে মুখের জল ফেলে এলেন।

“তারপর তো নীলু নিজের ভবানী গীত আর টানতে পারে না। শেষের আগেই শেষ করে দিয়ে নিজের সেরা অস্ত্র ছাড়ে। সে জানে বাংলায় আর কোনও দলে এ রকম মহিলা, সুন্দরী গাইয়ে নেই। সুন্দরী কেন, তেমন মহিলা কবিয়ালই নেই! এক যজ্ঞেশ্বরী ছাড়া।”

অনেকদিন দেখাসাক্ষাৎ নেই। মানে রাম বসু সময় করে নীলু ঠাকুরের গানের আসরে যেতে পারছে না। তবে যে কোনও গান বাঁধার সময় যজ্ঞেশ্বরীর মুখটা মনে পড়ে। বিশেষ করে রাম বসু যখন খেউড় অংশ লেখে, তখন চোখের সামনে সুন্দরী যজ্ঞেশ্বরীকে দাঁড় করিয়ে নেয়। তার মুখ দিয়ে গান বের হলে দর্শকদের কী প্রতিক্রিয়া হবে ভেবেই সব গান রচনা। সে যে দলই গান নিক না কেন।

রাম বসু বলল, “তা যজ্ঞেশ্বরী কী গান ধরল?” যজ্ঞেশ্বরী সম্পর্কে বেশি বেশি শুনতে চায় রাম বসু।

“যজ্ঞেশ্বরী উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ‘বাবুরা, এ আমার নিজের বাঁধা গান। আপনারা শুনে বলবেন তো, কেমন হয়েছে?’”

রাম বসু ফোড়ন কাটল, “যজ্ঞেশ্বরী তো বেশ চালাক হয়েছে। গাহনার আগেই নিজেকে জাহির করে রাখে!”

“ঠিকই বলেছে ভায়া। যজ্ঞেশ্বরী শত্রু-মিত্র সকলকে নিজের দলে টেনে নেয় এই বাক্যখান বলে। তবে সে সেদিন খুব ভাল গেয়েছিল। সে গান ধরল—

কর্ম ক্রমে আশ্রমে সখা
হলে যদি অধিষ্ঠান
হেরে মুখ, গেল দুখ
দুটো কথার কথা বলি প্রাণ।
এখন ক্ষ্যান্ত হলে হে ক্রমে ক্রমে
দিয়ে জলাঞ্জলি এ আশ্রমে।

যজ্ঞেশ্বরীর গান থামতেই এমন তালির আওয়াজ আর হর্ষধ্বনি, যে কান বাঁচানো দায়! শিস উঠেছে দর্শকদের মধ্যে। একেবারে হাটুরে ব্যাপার যেন! মনে হয় দর্শকদের এই শিস সহ্য করতে পারেননি হরু ঠাকুর। তিনি প্রতিবাদ করলেন।”

“কেন কেন! কীসের প্রতিবাদ!”

“আরে শোনোই না ভায়া। সাধে আমি এই হরু ঠাকুরের সঙ্গ ছেড়েছি! অনেক, অনেক দিন ঘর করেছি তাঁর সঙ্গে। সেই কবে ছোটবেলায় তাঁর দলে জিল দিতাম। আমি তো জানি, হরু ঠাকুর গান লিখে তা রঘুনাথ দাসের কাছ থেকে শুধরে আনতেন। তারপর সেই গান করে আসরে হর্ষধ্বনি কুড়োতেন। মানেটা বুঝলে না ভায়া! ডিম পাড়ে হাঁস, আর ডিম খায় দারোগাবাবু। কলকাতার বড়লোক মানুষও তেমনি হরুচাটা। বিশেষ করে ওই রাজা নবকৃষ্ণ। তিনি তো হরুকে দিয়ে চিকের ওপারে বসা তাঁর মহিষীদের খুশি করতে অশ্লীল গানও গাওয়াতেন।”

রাম বসু বলল, “কই তেমন অশ্লীল গান তো আমি শুনিনি! কৃষ্ণচন্দ্রের সভার খেউড় কলকাতায় এসে কবে পালটে বাবু হয়ে গিয়েছে!”

“পালটে গিয়েছে বলেই তো রাজা নবকৃষ্ণ অর্ডার দিয়ে গান বানাতেন।”

“আচ্ছা বৈরাগী মশাই, আপনার কি এমন কিছু মনে আছে? মানে হরু ঠাকুর অশ্লীল গান বাঁধেন?’’

‘‘তেমনটা...”

নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী তাঁর লম্বা চুলের ভিতর হাত ডুবিয়ে দিয়ে নিজেও ভাবনার ভিতর ঢুকলেন। আর অতি কষ্টে একখানা টুকরো মনে করে ফেলে নিজে নিজেই খুশি হয়ে বললেন, “তা হলে আমি গেয়ে শোনাই ভায়া!’’

“হ্যাঁ, শোনান।”

"নবকৃষ্ণ একদিন হরু ঠাকুরকে উসকে দিতে বলেছিলেন, 'এই একটা পদ দিচ্ছি, তুমি পুরণ করো দেখি হরু!' বলে, পদ শোনালেন, ' পিরীতি নাহি গোপনে থাকে।' হরু ঠাকুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সুমধুর কণ্ঠে গান ধরলেন—

পিরীতি নাহি গোপনে থাকে।
শুন লো সজনি বলি তোমাকে।
শুনেছ কখনও, জ্বলন্ত আগুনো,
বসনে বন্ধনো, করিয়া রাখে।।"

রাম বসু গালে হাত রেখে বললেন, "আরে বাবা! পেটে পেটে অ্যাতো! বলি তুমি কোথায় বসনে বুক বাঁধা দেখেছ হে, অ্যাঁ! ও সব তো লাল মুখোদের বাড়ির মহিলারা ব্যবহার করে! আমাদের সাধারণ বাঙালি ঘরে সব এক কাপড়ে চলে। তুমি এ সব কোথায় শিখেছ, ঠাকুর হে!"

"ঠিকই বলেছ ভায়া। আর হরু আসরে থাকলে তো কাউকে পাত্তাই দিতেন না নবকৃষ্ণ। তাঁর লহর শুনে নবকৃষ্ণ বলতেন, উঁচু জাতি না হলে, উঁচু মন আর উঁচু ভাবনা হয় না। হরু ব্রাহ্মণ, তাই সে শাস্ত্রাদিতে সেরা। সে ভাল গান লিখবে না তো কি কেষ্টা মুচি লিখবে!"



রাম বসুর সঙ্গে যজ্ঞেশ্বরীর একটু ইয়ে আছে, তা তো তিনি বিলক্ষণ জানেন। সেটা দিয়েই কবজা করা গিয়েছে রাম বসুকে। হরু ঠাকুরকে শায়েস্তা না করতে পারলে তাঁর যে ঘুম নেই!

রাম বসু দাঁত কড়মড় করে বলে, "কার কোথায় ক্যাদ্দারি, সব আমি জানি। তাঁর তো সংস্কৃত বা ইংরেজি— কোনওটাতেই কোনও পড়াশুনো নেই। কিন্তু এমন ভাব করে, যে শাস্ত্রজ্ঞদের বাড়া! শুধু উপর উপর ফেরেব্বাজিতে ওস্তাদ। আপনি ওই দিনের কথা বলুন। হরু ঠাকুর কি যজ্ঞেশ্বরীকে অপমান করল?"

" হ্যাঁ, এটা অপমান ছাড়া আর কী! এক হাট লোকের মাঝে সে, বিচারক হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল—কবিয়ালদের এ রকম রাতের আসরে কোনও মেয়েছেলের থাকা ঠিক না। আসরে হর্ষধ্বনি উঠতে পারে। কিন্তু এমন শিস্ ছড়াবে কেন! সম্ভ্রান্ত গানের আসরকে তো পথে নামিয়ে দেওয়া হল! রাতজাগা সোনাগাজির ঘরবন্দি জলসায় মেয়েছেলেরা গান করুক। এ রকম রাজা জমিদারদের বাড়িতে তাঁদের সম্মানকে ধুলোয় টেনে নামানো যায় না!"

রাম বসু চেঁচিয়ে উঠল, "ওর বাপের জমিদারি নাকি! ও বলে দেবে কে গান করবে, আর কে গান করবে না! আচ্ছা বৈরাগী মশাই, আপনি রবিবার সকালে এখানে একবার আসুন তো। কবিয়ালদের অনেকেই এখানে আসেন ওদিন। তখন আমরা আলোচনা করে ঠিক করব এই অন্যায়ের কী প্রতিকার করা যায়!"

নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী জোড়াসাঁকো থেকে বেরিয়ে গরাণহাটার রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে নিজে নিজে বেশ উল্লসিত হলেন। রাম বসুর সঙ্গে যজ্ঞেশ্বরীর একটু ইয়ে আছে, তা তো তিনি বিলক্ষণ জানেন। সেটা দিয়েই কবজা করা গিয়েছে রাম বসুকে। হরু ঠাকুরকে শায়েস্তা না করতে পারলে তাঁর যে ঘুম নেই! এজেন্সি হাউসগুলোর ঘুম ছুটেছে। মাল পড়ে আছে গোডাউনে অথচ বিক্রি নেই। তাদের টাকার অভাব। নীল চাষীরা দাদন পাচ্ছে না। টাকার অভাব। লবণ ব্যবসায়ীরাও মার খাচ্ছে। লন্ডনের কাউন্সিলের কাছ থেকে নেওয়া লোন শোধ করতে করতেই তাদের টাকা ফুরিয়ে যাচ্ছে। মেসার্স পামার অ্যান্ড কো, মেসার্স ম্যাকলিনটক অ্যান্ড কো, ডেভিডসন এন্ড কো-র মতো চোদ্দটা কোম্পানি সরকারের কাছে দরবার করেছে, হয় ছয় মাসের জন্য তাদের টাকা ধার দেওয়া হোক, নয় তো লন্ডনের পথে জাহাজে মাল পাঠানোর জন্য অগ্রিম দিক।

কলকাতার বড় বাবুদেরও ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছিল এ সময়। তাঁরা তো সব দালাল শ্রেণীর। বিভিন্ন ধনী লোকজনের কাছ থেকে টাকা তুলে তা কোম্পানির কাগজে লাগিয়েছেন। সেই কাগজের দাম পড়ে গেলে তো হয়ে গেল। ঝাড়েবংশে নিকেশ হয়ে যাবেন। বাবু রামচন্দ্র মিত্রর ছেলে বাবু জয়চন্দ্র মিত্র কথায় কথায় রামনিধিকে সহজ করে বলছিলেন কলকাতার মানি মার্কেটের কথা।

রামনিধি বললেন, "জয়বাবু, তা হলে উপায়! আমার টাকা তো বাজারে খাটছে। সে সব গেলে আমি খাব কী!"

"না কবি। অত ভাবনার কারণ ঘটেনি। শুনেছি গভর্নর সাহেব আশু একটা ঋণের ব্যবস্থা করে দেবে এজেন্সি হাউসগুলোকে। এটাতে তো দু'পক্ষেরই লাভ। এজেন্সি হাউস ছাড়া কোম্পানির ব্যবসা-বাণিজ্য কিছুই চলবে না। যেটা হতে পারে, তা হল, ব্যবসা এরা একটু ছড়িয়ে দিতে পারে। চিনের সঙ্গে আফিংয়ের একটা ব্যবসা খুলে গেলে আবার এজেন্সি হাউসের রমরমা হবে।"

রামনিধি বটতলায় জয় মিত্রর কথা শুনে নিজের জন্য যতটা না ঘাবড়েছে, তার চেয়ে ঢের বেশি, শ্রীমতীর জন্য। সে তো অনেক টাকা বাজারে ঢেলেছিল। তা ঠিক কোথায়, মনে নেই। তাকে এখনই সতর্ক করে দিতে হবে। পারলে লাভের আশা না করে, সরকারি কাগজ বিক্রি করে দিয়ে নিজের টাকা ঘরে ফেরাক সে। তার তো অনেক টাকা! প্রায় পাঁচ লাখের মতো।

এতক্ষণ তো দাঁড়াতে হয় না! বাড়ির দরোজায় একবার কড়া নাড়লে উপর থেকে কেউ নেমে এসে দরোজা খুলে দেয়। জ্যোৎস্নায় ধুয়ে যাচ্ছে গোটা তল্লাট। রামনিধি আর একবার দরোজার কড়া নেড়ে একটু পিছিয়ে আসেন। উপরে বারান্দার দিকে দেখার চেষ্টা করেন। তারপর রাস্তার বাঁদিকে-ডানদিকে চাইতে, চোখে পড়ে একটা লোক যেন কাছের পাকুড়গাছের নীচে দাঁড়িয়ে আছে। আর তাঁর দিকে নজর রাখছে।

মানে কী! ডাকাত-টাকাত নয় তো! যদি খালি হাতে থাকে, তবে রামনিধি যে কোন লোকের সঙ্গে মুখোমুখি হতে ভয় পান না। রোজ সকালে কুস্তির আখড়ায় যান। আর আজও, এই বয়সেও অনুশীলন করেন।

"মা ঠাকরুন, তিনি তো যাচ্ছেন না। সেই থেকে কড়া নাড়ছেন!"

শ্রীমতী দাসীর দিকে তাকিয়ে বলল, "আচ্ছা, তুই নীচে নেমে বল গিয়ে, মা এখন দেখা করতে পারবে না। তার শরীর খারাপ।"

আলতাবালা ঠাকরুণের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে রইল। এই লোকটাকে বাড়িতে ডেকে আনতে সে পালকি করে বটতলায় গিয়েছে একদিন। এই বাবুকে ডেকে, তার হাতে চিঠি ধরিয়ে তবে বাড়িতে এসেছে। এই বাবুটির গান শোনার জন্য রাজামশাই মহানন্দ রায় পাগল থাকতেন। আর আজ কী কথা বলতে লেগেছে শ্রীমতী ঠাকরুণ! তার শুনতে কোনও ভুল হয়নি তো!

"কী রে দাসী, দাঁড়িয়ে রইলি যে বড়! যেমন বললাম, তেমন গিয়ে বল। আজ দেখা করতে পারছে না ঠাকরুণ।"

রামনিধি পিছন ফিরে দেখছিলেন, কে যেন দাঁড়িয়ে আছে পাকুড় গাছের তলায়! গাছের ছায়ার বাইরে বেরলেই হয় তো চিনে নিতে পারবেন। এমন সময় ডাক। "বাবু শুনুন না, আজ মায়ের শরীর খুবই খারাপ আছে। উনি

বললেন, আপনি যেন বাড়ি চলে যান।”
রামনিধি কথাগুলো ভাল করে বোঝার চেষ্টা করলেন। তারপর দেখলেন সে, মানে এ বাড়ির দাসী দরোজা বন্ধ করে উপরে চলে যাচ্ছে। তার ভারী শরীরের ওজন পায়ে এসে পড়েছে। সঙ্গে রাগ। রামনিধির করুণ মুখ তার সহ্য হয়নি। হয়তো সে মনের রাগ শরীরের উপর ছেড়ে খানিক মুক্ত হতে চাইছে।
সিঁড়িতে থপ থপ করে শব্দ উঠছে। রামনিধি একবুক নিঃশ্বাস ছেড়ে ফিরে যেতে চেয়ে সেই পাকুড় গাছের দিকে লক্ষ করতেই দেখলেন, কেউ নেই। তার মানে! এখানেই তো কেউ একজন ছিল। রামনিধি মনে দু'রকম সংশয় পুরে রওনা দিলেন কুমারটুলির পথে। কে ছিল ওই গাছের তলায় ছায়াময় হয়ে! অতক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে কী করছিল সে! রাস্তাঘাট তো শুনশান। চোর-ডাকাত নয় তো! এই সন্ধেবেলায় জ্যোৎস্নার ভিতর তারা আসবে না। আর রামনিধি ভূত-প্রেতেও বিশ্বাস করেন না। তা হলে কে ছিল!
খুবই দাগা দিয়েছে শ্রীমতী। একেবারে বাড়িতে ঢুকতেই দিল না! রাতের বেলায় রামনিধি কিছু খেলেন না। হাত-পা ধুয়ে, একঘটি দুধ আর একটু আফিং নিয়ে নিজের শোওয়ার ঘরে ঢুকে গেলেন। রাতে তাঁর ঘরে কেউ বড় একটা যায় না। তিনি যে সে সময় নেশায় ঢুলতে ঢুলতে গান লেখেন, তা এ বাড়ির সকলেই জানে। রামনিধি কাগজ আর দোয়াত-কলম নিয়ে, কুলুঙ্গির আলো উসকে দিয়ে সামনে লেখার জলচৌকি টেবিল কোলের কাছে টেনে নিয়ে বসলেন। আজ তাঁর গান আসবে। তিনি জানেন না আঘাত থেকে মন সারিয়ে তুলতে আসে গান, না আঘাতকে আশ্রয় করে।
এক ঝোঁকেই রামনিধি লিখে ফেললেন,
‘দুখেতে কহিত আঁখি, আর না হেরিব সখী,
এখন নয়ন তার অধীন হইল।।
অঙ্গের অঙ্গ অবশ, কার বলে করি রোষ,
সময় পাইয়ে দিব, সমুচিত ফল।’
রামনিধি নিজের মনেই ঠিক করে নিলেন, না। আর ও-মুখো তিনি হবেন না। নিজের গায়ে খুব জোরে চিমটি কাটলেন। আফিংয়ের ঘোরে না। সজ্ঞানে। শরীরের ব্যথা দিয়ে মনের ব্যথা তিনি ভুলিয়ে দিতে চাইছেন। যে রামনিধিকে বর্ধমান রাজা, রাজা নবকৃষ্ণ দেব, যশোরের জমিদার বরদাকণ্ঠ রায় শত সাধনা করেও নিয়ে যেতে পারেননি তাঁদের বাড়িতে, সেই রামনিধির মুখের উপর দরোজা বন্ধ করে দেয়, একজন সামান্য রক্ষিতা!
“খবর ঠিক ছিল প্রভু নিত্যানন্দ। আমি রামনিধিকে অনুসরণ করে গতকাল হাতেনাতে ধরে ফেলেছি। সোনাগাজীর বাইজিবাড়ি তুমি যাও না। কিন্তু বাপু, তুমি যে ডুবে ডুবে জল খাও, তা রাজা জমিদার-রা জানুক এবার। তাদের রামনিধি যে ধোওয়া তুলসিপাতা নয়, তা দেখুক।”
ঢ্যাঙা বক, রূপচাঁদ পক্ষীকুলের গেঁজেল ভোর হতেই ছুটে এসেছে সিমলায়। খবর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিত্যানন্দদাস তাকে এক টাকা দেবেন বলেছিলেন, সেটাও তো নিতে হবে।
রাম বসুর বাড়ির আড্ডায় সকালবেলায় চলে এসেছেন নিত্যানন্দ । তিনি আজ এক ঢিলে অনেক পাখি মারা দেখতে চাইছেন। সঙ্গে নিয়ে এসেছেন সেই বাগবাজারের রূপচাঁদ পক্ষীর দলের ঢ্যাঙা পক্ষীকে। যে আগের দিন রাতে রামনিধিকে অনুসরণ করে গরাণহাটায় রামনিধির নিধির বাড়ি দেখে এসেছে। এদিকে রাম বসু ভরসা দিয়েছে, অন্যান্য কবিয়ালদের সামনে হরু ঠাকুরের কীর্তি সে ফাঁস করে দেবে। ফাঁস করে দেবে, কীভাবে মধ্যস্থতার কাজ করে হরু ঠাকুর এক একটা দলের কাছ থেকে সুযোগ নেয়।
বেশ বড় বৈঠকখানা। অন্য রবিবারে দু-পাঁচজন আসে, গান নেয়, গল্প করে, তামুক খায়। কিন্তু আজ পুরো বৈঠকখানা ভরে গিয়েছে। মাটিতে মাদুর পাতা হয়েছে। দু-তিনটে চেয়ার ছিল, সেগুলো সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সবাই ভূমি আসনে আজ। ঘরে ঢুকে নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী থমকে গেলেন। এত লোক! তিনি দরোজার সামনে দাঁড়িয়ে দেখে নিতে চাইলেন সকলকে চেনেন কি না! হ্যাঁ, চোখে পড়েছে জোড়াসাঁকোর আখড়াই দলের নেতা রামচাঁদ মুখোপাধ্যায় বসেছেন রাম বসুর বাম দিকে। ভবানী বেনে, নবাই ঠাকুর, নীলু ঠাকুর, ভোলা ময়রা, রামসুন্দর রায়, গৌর কবিরাজ, কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য, ঠাকুরদাস সিংহ, মোহন সরকার— আরও কতক কতক লোকজন।
রাম বসু হাঁক পাড়ল, “কী হল বৈরাগী মশাই, ভিতরে আসবেন না!”
একটু লজ্জা পেলেন নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী। তাঁর অমন করে লোকজনের দিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা উচিত হয়নি। লোকজনও পিছন ফিরে তাঁকে দেখছে।
“বৈরাগী মশাই, আপনি ভিতরে আসুন। আরও কবিয়াল আর গুণী মানুষজন এসে পড়বেন। আপনি একটু সামনে থাকুন তো। আমি বলি কী, আজকের সভা আপনিই পরিচালনা করুন।”
কীসের সভা! নিতাই বৈরাগী তো আকাশ থেকে পড়লেন। এ তো ধরে আনার নামে বেঁধে এনেছে। তাঁর অভিপ্রায় ছিল হরু ঠাকুর আর রামনিধিকে একটু শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা। তার জন্য এত লোক ডাকার কী আছে! নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী ভাবেননি এই ছোকরার কথায় এত লোকজন জমায়েত হতে পারে। সবই তো মহা মহা ব্যক্তিত্ব। আবার ভোলা ময়রাকেও দেখা যাচ্ছে। সে তো হরু ঠাকুরের খাস লোক। এখান থেকে বেরিয়েই সিমলে চলে যাবে। হরু ঠাকুরকে সব খবর দিয়েই সে ঘরে ফিরবে নিশ্চিত।
নিতাই বৈরাগী ঘামতে লাগল। এখন রাম বসু যদি এত লোকের মাঝে যজ্ঞেশ্বরীর অপমানের কথা তোলে তবে তো বিপদ। ঘটনা তো তেমন কিছুই ঘটেনি। এখানে সেদিনকার আসরের অনেকেই উপস্থিত আছে। কী দিয়ে কী যে হয়ে পড়বে! নিত্যানন্দ দাস এত লোকজন চাননি। গোপনে, চুপিচুপি যে সব কাজ করা যায়, তা খোলামেলা করাটা কি সম্ভব! তিনি চাইছিলেন সাপ মরবে, কিন্তু লাঠির কথা যেন জানাজানি না হয়।
নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী আসন গ্রহণ করতে না করতেই আবার রাম বসুর গলা, “তা হলে বৈরাগী মশাই, আপনিই এই সভার হাল ধরুন। আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ, আর নামী দলের অধিকারী। আপনাকেই মানাবে। আপনি তো জানেনই যে আজকে এত মানী লোকজন জমায়েত হয়েছেন, আমাদের আখড়াই গানের ভবিষ্যৎ ভাবনার ভিতর ঢুকে পড়েছে বলে। কলকাতার নতুন ফ্যাসান হয়েছে বাইজি নাচ। ইংরেজরা নাকি সে সব নাচ-গান পছন্দ করে, তাই কলকাতার ধনী মানুষরা, জমিদারেরা জলসাঘরে বাইজি নাচিয়ে ইংরেজদের সন্তুষ্ট করতে চাইছেন।”
জোড়াসাঁকোর কাশীনাথ মুখোপাধ্যায় যেন স্বয়ং মহাপ্রভু রূপে উপস্থিত হলেন নিতাই বৈরাগীকে উদ্ধার করতে। তিনি ধনাঢ্য ব্যক্তি। তাঁর নিজের আখড়াই দল আছে। তাঁর এলাকায় এসে কে এক নিতে বোষ্টম ছড়ি ঘোরাবে, তা হয় নাকি! কাশীনাথ বললেন, “সভাসমিতিতে উদ্যম ক্ষয় হয়। কাজের কাজ কিছু হয় না। এখানে আজ কলকাতার সব মানী লোকেরা উপস্থিত আছেন, যাঁরা প্রাণ দিয়ে আখড়াই গান ভালবাসেন। আমার মনে হয় সকলে মিলে যদি আমরা বেশি বেশি করে এই গানের আসর বসানোর জন্য যোগাযোগ তৈরি করতে পারি, তা হলে বাইজি নাচ বা নতুন যে যাত্রার আসর তৈরি হচ্ছে, তারা আমাদের সঙ্গে পেরে উঠবে না। আপনারা দেখেছেন, এই বৈঠকি সংস্কৃতির সঙ্গে হাটুরে মজার লড়াই চলছে। এক দিকে আপনারা

যেমন আখড়াই, টপ্পা ইত্যাদি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে বাংলার সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইছেন, উলটো দিকেও দল ভারী করে চটুল বাইনাচ, তরজা, খেউড় আপনাদের পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে। এ সময় আমাদের একসঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে সব অশুভকে হটিয়ে দিতে হবে।"

হরু ঠাকুরের একটা ব্যবস্থা রাম বসুর বাড়ি থেকেই সকলে মিলে করে ফেলেছে।

কাশীনাথবাবুই বললেন, "এখন যে সব আখড়াই লড়াই হচ্ছে, তা ভাল কথা। তাতে নিজেদের আর ভাল করে তৈরি করার তাগিদ থাকে। কিন্তু বার বার যদি একই দল পুরস্কার পেতে থাকে, তবে মনোবল ভেঙে যায়। আর নিজেদের ভাল করার চেষ্টা থাকে না। এই ব্যাপারটা থেকে অব্যাহতি পেতে হবে আমাদের।"

রামমোহন বসু ঠিক সময় ঠিক কাজটি করতে পারে। সে সঙ্গে সঙ্গে বলল, "কিন্তু পরিত্রাণ কোথায়! সেই তো বিচারক একজন। বাংলাদেশে যেন আর কোনও শাস্ত্রজ্ঞ, সঙ্গীতপ্রেমী নাই।"

"তুমি কার কথা বলছ রামমোহন?"

নিত্যানন্দ এবার আর মুখ না খুলে পারলেন না। বললেন, "কার কথা আবার, যিনি আমাদের মাথার উপরে সব সময় ডান্ডা ঘুরাইতেছেন। তিনি আমাদের গানপুলিশ হরু ঠাকুর।"

একচোট হাসি উঠল বৈঠকখানায়।

কাশীনাথ মুখোপাধ্যায় গম্ভীর মুখে বললেন, "পরিত্রাণের পথ নিজেদেরই খুঁজে নিতে হবে। তবে সহজ যেটা, আমরা এ রকম গানের লড়াইয়ের আমন্ত্রণ পেলেই বাবুদের বলতে পারি, বিচারক হরু ঠাকুর হলে গাহনা করা সম্ভব না। তা হলেই হয়ে গেল। আর কোনও মধ্যস্থতাকারী পাওয়া যাবে না নাকি! ঠিক পাওয়া যাবে, যার গানের দল নেই।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, আছেই তো। এখানেই আছে। আমাদের রাম বসুর কাছে হরু ঠাকুর কী! রাম বসু পাক্কা গান বাঁধে। গলা অতি মিষ্টি। কালোয়াতি সুরের শিক্ষা আছে। ইংরেজি জানে বলেই তো সাহেব কোম্পানির চাকুরে। সংস্কৃত জানে। এর কাছে হরু ঠাকুরের বিদ্যাবুদ্ধি কী আর!" নিত্যানন্দ দাস বৈরাগীর এ কথায় উপস্থিত কেউই প্রতিবাদ করতে পারল না।

নিত্যানন্দ দাস হরুর বিরুদ্ধে সফল হয়ে, পরের রবিবার মনস্থ করেছেন বাগবাজার অভিযান করবেন। সঙ্গে কেউ একজন থাকলে মনে সাহস আর শক্তি বেশি লাগে। নিত্যানন্দ দাস তাই ফরাসডাঙার রাম বাইতির ছেলে মোহন বাইতিকে নিজের বাড়িতে সকাল সকাল ডেকে এনেছেন। ছেলেটা নিত্যানন্দর খুব ন্যাওটা। নিত্যানন্দ নিজে ভাল ঢোল বাজাতে জানলেও আসরে সাজ বাজনার সময় এই মোহনের হাতেই ঢোল সমর্পণ করেন। আর সে ঢোল বাজিয়ে আসর সাজিয়ে দেয়।

বাগবাজারে মোহনচাঁদের বাড়ি নিত্যানন্দ বা তাঁর দলের ঢুলি মোহন বাইতি, কেউই চেনেন না। তবে তাঁদের আশা, মোহনচাঁদের যা খ্যাতি, জিজ্ঞাসাবাদ করে ঠিক পৌঁছে যাওয়া যাবে।

"আসুন, আসুন। ভিতরে আসতে আজ্ঞা হোক। আমার কী সৌভাগ্য, কবিয়াল নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী এই বাড়িতে পা রেখেছেন। "

যেমন সুদর্শন, যেমন সুকণ্ঠের অধিকারী, যেমন সুগায়ক মোহনচাঁদ, তেমনই বিরাট প্রাসাদের মতো তার উচ্চ অট্টালিকা। দেউড়িতে দরোয়ান আছে। নিত্যানন্দ দরোয়ানের মারফত খবর পাঠালে, মোহনচাঁদ নিজেই তার পিছন পিছন চলে এসেছে। তার হাত জড়ো করা বুকের উপরে। মাথা নুইয়ে অভিবাদন করেছে।

এতদিন দূর থেকে দেখেছেন নিত্যানন্দ বৈরাগী। আসরে বিরোধী দলে বসে অল্প আলোতে দেখেছেন। কিন্তু এখন দিনের বেলায় দেখে একেবারে নির্বাক হয়ে গেলেন। যেমন লম্বা চেহারা, তেমন উন্নত নাসিকা ও কপাল। চোখ আয়ত। গায়ের রং দুধে-আলতা। একেবারে কিন্নরকান্তি, চোখ ফেরানো যায় না। যেন বা দেবদূত! এই ব্যক্তির অমন বিনীত ভঙ্গিও খানিকটা কুঁকড়ে রাখল নিত্যানন্দ দাস বৈরাগীকে। নিত্যানন্দ বোষ্টম কৌচে বসে, তার ভিতর সেঁধিয়ে যেতে যেতে অস্বাচ্ছন্দ্যে বলে বসলেন, "বাবা, কী বিশাল বাড়ি আপনার! শোভাবাজারের নবকৃষ্ণের বাড়ির চেয়েও যেন সুন্দর আর উঁচু।"

"না না, এ সব কি আমি করেছি! বানিয়েছেন আমার দাদু, দেওয়ান রামচরণ বসু। আমার কিছুই নেই।"

নিত্যানন্দ বৈরাগীর সঙ্গে এসেছিল ঢুলি মোহন বাইত। সে বয়সে নবীন। বলল, "আমি কিন্তু এই ঘর-বাড়ি দেখছি না। আমি আপনাকে এত কাছ থেকে দেখে রোমাঞ্চিত হচ্ছি। আপনার যেমন রূপ, তেমন গুণ। একই দেহে এতখানি যিনি ধরেন, তিনি দেবতা ছাড়া অন্য কিছু নন।"

মোহন বাইত যেন মনের কথাটি বলে ফেলেছে। তাকে সমর্থনের ভঙ্গিতে মাথা নাড়েন নিতাই বোষ্টম। তিনি যে দল পাকাতে এসেছেন, তা যেন কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে। এত বাইরে, ভিতরে বৈভব নিয়েও কেমন সহজ চলন এই মোহনচাঁদের! তাঁর চেয়ে বয়সে অনেক ছোট, কিন্তু সম্ভ্রমে মাথা নুয়ে আসছে। তবে নিতে বোষ্টম জানে, সুযোগ বার বার আসে না। আজ এত যত্ন করে নিজে বাড়ির বৈঠকখানায় এনে বসিয়েছে, কাল হয়তো দরোয়ানকে দিয়ে বলে পাঠাল, দেখা হবে না। বড়লোকের ছেলে, বড়মানুষ, কখন কী মর্জি হয়!

নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী হলেন ভেকধারী বৈষ্ণব। তিনি খুব ভালই জানেন, দীন থেকে দীনতর হয়ে পায়ে পড়ে গেলে সব প্রাণই গলে যায়। মোহনচাঁদের বিনয়ের উপর তাঁকে টেক্কা দিতে হবে। তিনি ঢুলি মোহন বাইতকে বলে মোহনচাঁদকে শোনাতে চান। বললেন, "সেদিন এই অমৃতকণ্ঠ থেকে কী যে রস সুধা ঝরেছিল! বল, তুই বল বাইত। পাথুরিয়াঘাটার রাজবাড়িতে। আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব কী, হাঁ করে ছিলাম! ইনি গাইছিলেন, 'পিরীতি রতন যদি, যতনে মিলাল বিধি, পাইয়ে এমন নিধি দুখ নাহি গেল,' নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী এক কলি গেয়ে দিলেন।

মোহনচাঁদ বলল, "আহা! আপনি কী সুন্দর করে গাইলেন! প্রাণ ভরে গেল।"

"না, না এমন বলবেন না। আপনার কণ্ঠ থেকে বের হয়ে এসে এমন সুধা নিয়ে কানে ঢুকেছিল যে আপনার সুরটিও অবিকল আমার মনে গেঁথে আছে। আপনি ধন্য।"

নিত্যানন্দ বৈরাগীর কথায় মোহনচাঁদ মনে মনে খুশি হলেও বলল, " না, এতে আমার কোনও বাহাদুরি নেই। আমার গুরুদেব



বাগবাজারে মোহনচাঁদের বাড়ি নিত্যানন্দ বা তাঁর দলের ঢুলি মোহন বাইতি, কেউই চেনেন না। তবে তাঁদের আশা, মোহনচাঁদের যা খ্যাতি, জিজ্ঞাসাবাদ করে ঠিক পৌঁছে যাওয়া যাবে।

রামনিধি গুপ্তের লেখা, সুর দেওয়া গান। আমি শুধু কণ্ঠে ধারণ করেছি।"
"হ্যাঁ, নিধুবাবু কালোয়াতি গানের ঈশ্বর। তিনি যা গানের ভিতর সুরের কারুকাজ দেন, তা খেয়াল বা ধ্রুপদের সঙ্গেই তুল্য। তবে আমি বলি কী, আপনার কণ্ঠ না পেলে ওই গান যেন ডালপালা মেলতে পারত না! কই, তিনি তো সেদিন রাজবাড়িতে ছিলেন না! আপনিই নিধুবাবুর দলকে জিতিয়ে নিয়ে চলে গেলেন। আমরা হেরেছি বলে কোনও মনোকষ্ট নেই। এমন অমৃতস্বর যে প্রাণের ভিতর সারা জীবনের জন্য ঢুকে বসে রইল!"
"আপনাদের জন্য এই লুচি আর মণ্ডাটুকু এনেছে। আপনারা গ্রহণ করুন।"
"আরে না না। এ সব বাহুল্য করতে গেলেন কেন," মুখে বললেও খুবই খিদে পেয়েছিল নিত্যানন্দ বৈরাগীর। এক টুকরো লুচি ছিঁড়ে কপালে ঠেকিয়ে, বড় পেতলের থালার পাশে রেখে খাওয়া শুরু করে দিলেন। খানিকটা ক্ষুধা নিবৃত্তির পর তিনি কথায় ফিরলেন।
"যে কথা বলছিলাম, আপনার গানের সুনাম শুধু তো কলকাতায় নয়, এই বাংলার বাইরেও যেখানে বাঙালিরা আছে, সেখানে পৌঁছে গিয়েছে। আপনি নিজে একটা দল করছেন না কেন?"
মোহনচাঁদ খুব অর্থপূর্ণ চোখ মেলল নিতে বোষ্টমের চোখে। সে ভড়কে গিয়ে বলতে থাকে, "না, আমি বলছিলাম কী, এই যে এত পুরস্কার জেতে আপনাদের দল, তার কৃতিত্ব কিন্তু পুরোটাই আপনার। কিন্তু নামগান হয় রামনিধির। যদি আপনি একটা দল করতেন..."
মুখে স্মিত হাসি ধরে রেখে মোহনচাঁদ বলল, "দেখুন, আমি তো সেই বটতলার পক্ষীদলের সূচনাকাল থেকে গুরু রামনিধির সঙ্গে আছি, এখন একটু নাম হয়েছে বলে গুরুর পিঠে ছুরি মেরে বেরিয়ে যেতে পারিনে। অনেকেই তা করে। কিন্তু আমার কোথায় যেন বাধে। গুরুদেবের অবর্তমানে নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে ভেবে দেখব।"
নিত্যানন্দ দাস হরু ঠাকুরের দল ভেঙে এসে নিজেই দল করেছেন তা সকলেই জানে। মোহনচাঁদ কি তবে তাঁকে খোঁচা মারল! মারলে মারুক। যে কাজে এসেছেন তিনি, তার একটা হিল্লে করে তবেই ফেরা। তাতে একটু-আধটু খোঁচা খেতে হলে খাবেন।
"আচ্ছা মোহনবাবু, আপনার কি মনে হয় না, রামনিধি গুপ্ত একটু অহঙ্কারী? আমার তো মনে হয় আমার মতো ছোটমোটো গাহনাকারদের তিনি নস্যবৎ জ্ঞান করেন!"
মোহনচাঁদ পূর্ণ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল নিত্যানন্দ দাস বৈরাগীর দিকে। গুরুনিন্দা শোনা উচিত নয়। কিন্তু এই শিল্পী যে বাড়িতে এসেছেন! নিজেদের বাড়িতে বসে অন্য কাউকে কটু কথা শোনানোও তো এ বাড়ির রুচি, আভিজাত্যের বিরোধী। সে কাজ মোহনচাঁদ করতে পারে না। তাকে ধৈর্য ধরে অতিথির কথা শুনতে হবে।
এই যে বাজিয়ে দেখার সহজ পদ্ধতি, তাতে মোহনচাঁদ অংশগ্রহণ না করায় নিতে বোষ্টম একটু থমকালেন। তারপর বললেন, "না, দেখুন মোহনবাবু, রামনিধি গুপ্তর সঙ্গে আমার কোনওদিন মুখোমুখি দেখা হয়নি। কিন্তু শুনেছি, তিনি গানের আসরে যেতে চান না। কারও বৈঠকি আসরে যেতে অস্বীকার করেন। মানী মানুষরা ডাকলে সে ডাকে সাড়া দিতে হয় না! এই যে গত মাসে কত করে বড়বাজারের মল্লিকরা বলল, সরস্বতী পুজো উপলক্ষে একটা গানের আসর বসবে, তাতে যদি রামনিধি আসেন খুবই ভাল হয়! তিনি গেলেন না। কত লোক আশা করে বসে থাকে! তাদের আশা যে পুরণ করেন না, তাতে মনে হয় না, তিনি অহঙ্কারী!"
মোহনচাঁদ মুখের হাসিটি বহমান রেখে বলল, "মাননীয়, শুনুন। তিনি তো শুধু গাহনাকার নন, যে গান গাইতে ডাকলেই তিনি ছুটে যাবেন। রামনিধি গুপ্ত প্রথমত কবি। একজন কবি অন্য কারও ইচ্ছেয় চালিত হতে পারেন না। তিনি নিজের ইচ্ছের মালিক। স্বাধীন মানুষ। কোথায় যাবেন, কখন যাবেন, তা কেউ ঠিক করে দিতে পারে না। রাজা নবকৃষ্ণ ডেকেছেন, যাননি। বর্ধমানের মহারাজা তেজশচন্দ্র ডেকেছেন, যাননি। যশোরের রাজা বরদাকণ্ঠ রায় সভাকবি হিসেবে নিয়ে যেতে চেয়েছেন, যাননি। মুর্শিদাবাদের রাজা মহানন্দ রায় এই সভাবাজারের বটতলার আটচালায় এসে তাঁর গান শুনে গিয়েছেন।"
"আমি তো সে কথাই বলছি মোহনবাবু। তিনি এত বড় কেউকেটা মনে করেন নিজেকে, যে রাজা জমিদারদের ইচ্ছেকে হেলায় ফেলে দেন আস্তাকুঁড়ে!"
মোহনচাঁদ এবার একটু শব্দ করে হাসল। "তা হলেই বুঝে দেখুন মাননীয়, বার বার প্রত্যাখ্যান করলেও রাজা, জমিদার, কলকাতার ধনী মানুষরা তাঁকে কিছু বলতে চাননি। কিন্তু আপনি তো জানেন, নদীর ঘাটে স্নান করতে গিয়েছেন কবিয়াল হরু ঠাকুর। সেখান থেকে লোক পাঠিয়ে তাঁকে নিয়ে গিয়েছেন রাজা নবকৃষ্ণ শোভাবাজার রাজবাড়িতে। আর আপনি তো এ-ও জানেন যে, কলকাতায় পঞ্চাশের বেশি ধনী জমিদার যাঁরা আছেন, তাঁর সকলেই রামনিধি গুপ্তকে সমীহ করে চলেন। তাঁর একটু চরণস্পর্শ পেতে চায় এইসব বড়লোক বাড়ির বৈঠকখানা। বাংলা গানের জগতে রামনিধি গুপ্ত নতুন আবেগ আর আলোড়ন নিয়ে ঢুকেছেন। এলেবেলে কিছু নয়। টপ্পা এর আগে বাংলায় কেউ কোথাও গায়নি। তিনি, রামনিধি গুপ্ত, বাংলা গানের প্রধান পুরুষ হয়ে থাকবেন।"
নাহ্, এ তো সহজ ঠেক নয়! নিত্যানন্দ দাস মোহনচাঁদের ঘাড়ে উঠে বসতে পারছেন না কোনওভাবেই। কিন্তু শেষ একটা সুযোগ নিতেই হয়। শেষ অস্ত্রটা ছেড়েই উঠবেন এখান থেকে। "আচ্ছা মোহনবাবু, আপনি কি শোরি মিঞার নাম শুনেছেন?"
"না।"
"অবাক কান্ড! আপনি তাঁর প্রধান শিষ্য, আপনি কেন জানবেন না? একবার শুধোবেন তো তাঁকে শোরি মিঞার কথা। আমি বলি কী, তিনি ইচ্ছে করেই শোরি মিঞার কথা চেপে গিয়েছেন। তিনি যে শোরি মিঞার টপ্পাকে হিন্দি থেকে বাংলায় নিয়ে এসে গান! আপনি জিজ্ঞাসা করবেন, ছাপরায় এই শোরি মিঞার টপ্পা তিনি শিখেছিলেন কি না! তিনি যদি শোরি মিঞার টপ্পা চেপে রেখে গুরুমারা বিদ্যা প্রয়োগ করে বাংলাদেশে নাম কিনতে পারেন, আমার বিশ্বাস, আপনিও পারেন কোনও একটা জায়গায় রামনিধিকে ছাপিয়ে গিয়ে আপনার নিজের পতাকা তুলে ধরতে। আপনার সে যোগ্যতা আছে।"
মোহনচাঁদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে ঢুলি মোহন বাইত বলল, " প্রভু, আপনি কি আসার সময় লক্ষ করেছিলেন, অমন টকটকে লাল মুখের উপর কেমন যেন ছায়া নেমে এসেছে?"
"না দেখিনি। আমি তো আর মুখের দিকে তাকাইনি। কিন্তু তুই যখন বলছিস, মনে হচ্ছে ওষুধ কাজ করবে। মনের ভিতর ঢুকিয়ে দেওয়া গিয়েছে, যে সে নতুন কিছু করতে পারে।"
"তা আপনিও বা রামনিধির পিছনে হাত ধুয়ে পড়ে গিয়েছেন কেন?"
"আরে দেখছিস না, যেখানেই গানের লড়াইতে যাই, সেখানেই রামনিধির নামে জয়ধ্বনি ওঠে। গাহনার আগেই অর্ধেক জয় করে বসে থাকে।"
"তবে বাগবাজারের দল কিন্তু ভাল গায়, সে কথা মানতে হবে," মোহন বাইত বলল।
"হ্যাঁ, ভাল গায় তো! আর গায় এই কিন্নর পুরুষ মোহনচাঁদ। যদি মোহনচাঁদ আর রামনিধিকে আলাদা করা যায়, তো আমার

মনে হয়, বাগবাজার দলের এই একচ্ছত্র আধিপত্য থাকবে না। তখন সমানে সমানে লড়াই। তখন দেখে নেওয়া যাবে বুড়ো নিত্যানন্দ দাস গান জানে কি জানে না!"
দাসী আলতাবালা তো জানে, সেদিন কেন তার ঠাকরুণ এই বটতলার গানের বাবু রামনিধিকে বাড়িতে ঢুকতে দেয়নি। সেদিন যে ওই ছোকরা মোহনচাঁদ ছিল ঘরে! আজ আবার সে-ই রামনিধিবাবুকে ডেকে আনার জন্য চিঠি ধরিয়েছে আলতাবালাকে। গা জ্বলে যায়! রাজা মহানন্দের নুন খেয়েছে বলে ছেড়েছুড়ে চলে যেতেও পারে না।
পালকি চেপে বটতলায় আসতে আসতে ভাবছিল সে। আবার ওই উচ্চিংড়ে ছোকরাদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। তারা বাবুকে ডেকে দেবে। বাবুর হাতে চিঠি না ধরালে যে রক্ষে থাকবে না সে জানে। আলতাবালা নিজের মনে গজর গজর করে।
রামনিধি একবার ভেবেছিলেন, উঠবেন না তাঁর আসন থেকে। কিন্তু যে পক্ষী চিঠি নিয়ে এসেছে, তাকে তো আলতাবালা চোখ-মুখের ভঙ্গি দিয়ে, মিষ্টি করে হেসে পটিয়ে ফেলেছে। আলতাবালা যে দ্বাররক্ষী পক্ষীর বুকে আঙুল ছুঁয়ে দিয়ে অনুরোধ করেছে, বাবুকে ধরে নিয়ে আসতে! সে পক্ষী রামনিধির মুখের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এখন না উঠলে আবার পাখিদের মধ্যে যদি সোরগোল পড়ে!
শ্রীমতী জানে, রামনিধি চিঠিটা পড়লে আসবেনই। গত তিন মাস তাঁর দেখা নেই। মনটা আনচান করছে। বুকের ধকধক শব্দের সঙ্গে 'নিধুবাবু, নিধুবাবু' ডাক শোনা যাচ্ছে। ঘরের ভিতর কাঁহাতক ছটফট করা যায়! দাসী আলতাবালা এখনও ফেরেনি। ও ফিরলে বুঝতে পারবে বাবুর মর্জি। দাসীকে নিশ্চয়ই কিছু বলবে না। ভদ্র, শিক্ষিত লোক। যে অপরাধ সে করেছে, তার শাস্তি শ্রীমতী নিজেই নেবে। দাসীকে যেন কিছু না বলে নিধুবাবু। শেষে দাসী যদি রেগে গিয়ে মুখ ফসকে বলে দেয়, সেদিন মোহনচাঁদ ছিল এখানে! সে বড় অপমানের হবে। তখন মাথা কুটেও তাঁকে এই বাড়িতে আনতে পারা যাবে না।
শ্রীমতী এই তিন মাসে বাবুর বিরহ টের পেয়েছে। সব সময় বুকের ভিতরটা ফাঁকা লাগে। রাজা মহানন্দ চিরকালের মতো তাকে ছেড়ে গিয়েছেন, কিন্তু তাতেও এত ফাঁকা লাগেনি শ্রীমতীর। রামনিধি বেঁচে আছেন, শুধু তিন মাস যোগাযোগ নেই। কিন্তু কেন যে এত হু হু করছে মন! তার কেবলই মনে হয় রামনিধি তো কবি, তাঁর মনের গঠন অন্যদের মতো মোটা নয়। খুবই সূক্ষ্ম তন্ত্রীতে সে বাজে। সেই তার যদি ছিঁড়ে যায়!
শ্রীমতী দোতলার লম্বা বারান্দা ধরে পায়চারি করে। চোখ থাকে রাস্তায়, কোনও পালকি এই দিকে আসছে কি না! তার বাড়ির দরোজায় তা দাঁড়াল কি না! আলতাবালা পালকি থেকে নামলেই ছুটে যাবে। দরোজা খুলতে খুলতেই জিজ্ঞাসা করবে সব।
রামনিধি সকলের সামনে আর চিঠি খুললেন না। দু-একটা যা বিচ্ছু পক্ষী আছে, তারা সব মুখিয়ে থাকে রসের ভিয়েন বসাতে! কোমরে ধুতির সঙ্গে পাঁক দিয়ে গুঁজে রাখলেন চিঠিটা। আর বেশ অন্যমনস্কতায় দু-একটা টপ্পা গান শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে শুনে, নিজে
একটু গেয়ে দিয়ে উঠে পড়লেন। সূর্য পাটে নেমে গিয়েছে।
রামনিধি ক্রোধের ঝোঁকে সেদিন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, আর গরাণহাটার দিকে পা বাড়াবেন না। কিন্তু রাগ কত দিন বা মাথায় চড়ে থাকতে পারে! মন যে ছটফট করছিল! বাড়িতে রাতের বেলায় আফিং নিয়ে ঢুলতে ঢুলতে যে সব গান আসছিল, তা যেন তেমন করে দানা বাঁধছিল না। কী যেন একটা অভাব গানের গায়ে জড়িয়ে যাচ্ছিল! সে সব গানে প্রাণ ছিল কম।
জয় মিত্রদের আটচালা থেকে বেরিয়ে আজ রামনিধির পা নিজে নিজেই গরাণহাটার পথে এগিয়ে গিয়েছে। শ্রীমতীর বাড়ির দরোজায় এসে কড়া নাড়া পর্যন্ত কোনও এক ঘোরের ভিতর থেকেছেন রামনিধি। কড়া নাড়ার পর তাঁর হঠাৎ পুরনো স্মৃতি মনে এসে গেল। আজ আবার সে রকম অপমান যদি করে! না না তা খুবই পীড়াদায়ক হবে। রামনিধি দ্রুত ঘুরে গিয়ে বাড়ির পথ ধরতেই পিছন থেকে হাঁক, "ও বাবু, কোথায় যাতিছেন! আসেন। ঠাকরুণ সেই কহন থে আপনার জন্যি অপেক্ষায় আছেন! আসেন।"
বারান্দায় দাঁড়িয়ে দূর থেকেই নজরে পড়েছিল শ্রীমতীর। তাঁর নিধুবাবু আসছে। শ্রীমতী আলতাবালাকে আগেভাগেই নীচে পাঠিয়ে দিয়েছে। দরোজায় আজ যেন দাঁড়াতে না হয় বাবুকে। দাসীকে বলে সে নিজের ঘরে চলে গিয়েছে। আজ একটু সাজগোজ করবে।
শ্রীমতী বৈঠকখানা ঘর থেকে রামনিধিকে নিয়ে বাড়ির পিছন দিকে রাজাবাবুর ঘরে ঢুকে গেল। এই দোতলার বারান্দা ঘোরানো তিনদিকে। যাওয়ার সময় দাসীর ঘরে উঁকি মেরে বলল, " দাসী, বাবু অনেকদিন পর এয়েচেন। তাঁর সঙ্গে ম্যালা কতা জমে আছে। তুই এখন আর ওদিকে আসিসনি। বাবুর খাবার তৈরি করে রাখ। আমি এসে নিয়ে যাবখন।"
আলতাবালা মাথা নেড়ে সায় দিলেও, মুখে বিড়বিড় করল, "আগুনো পোহাই কাপড়ো সেঁকি, যে যা করে তাও দেখি।"
শ্রীমতী দোর বন্ধ করে এসে একেবারে রামনিধির গায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। "বাবু, আমার উপর এমন রাগ! এত দিন এখানে না এসে কাটিয়ে দিলে! আমি চিঠি না লিখলে, আমার মরার দোহাই না দিলে তুমি আসতে না!"
রামনিধি কতদিন বাদে আবার শ্রীমতীর গায়ের গন্ধ পাচ্ছেন। শরৎকালের শেফালি ফুল ফুটে ওঠা ভোরের গন্ধ। কেমন মায়া আর মিষ্টি হাওয়ায় মাখামাখি সে জগৎ! রামনিধি বুকের ভিতর টেনে নিলেন সুন্দরীকে। বুকের উপর চেপে থাকা একটা পাথর সরিয়ে, সেখানে শ্রীমতীর জায়গা হল।
রামনিধি বললেন, "না তো। আমি তো তোমার চিঠি পড়িইনি। কী এমন লিখেছ চিঠিতে!"
"সত্যি পড়োনি? আমি যে রাত জেগে ভাবনা করতে করতে চিঠি লিখলাম! তা পড়লে না! ফেলে দিয়েছ?"
"না না। ফেলিনি। এই তো রয়েছে।" বলতে বলতে রামনিধি শ্রীমতীর বাঁধন একটু আলগা করে নিজের কোমরে থাকা চিঠিকে ধুতির বাঁধন থেকে মুক্ত করে শ্রীমতীর চোখের উপর মেলে ধরলেন।
শ্রীমতী চিঠিটা হাত থেকে নিয়ে, রামনিধির কোলের উপর থেকে নেমে পিছিয়ে আসে। তারপর ঘরের একমাত্র চেয়ারে গিয়ে বসে। সেখানে আলোও একটু বেশি। বলে, "তুমি তো এখন আমাকে দেখতেই পার না। আর আমার চিঠি তো দূর অস্ত। তাকে তুমি দেখবে নাকি! শোনো, আমি কষ্ট করে লিখেছি বলে নয়। চিঠি না পড়া হলে চিঠির রাগ হয়। পরে দরকারের সময় সে বেঁকে বসে। তা তো আমি হতে দিতে পারিনে! এই চিঠি আমি পড়েই তোমাকে শোনাচ্ছি।
'শ্রীচরণকমলেষু,
নিধুবাবু! আমি আর পত্র কী লিখিব! আমার মতো মুর্খ মেয়েমানুষের কথা শোনার কে বা আছে! আপনি তো শিষ্যবেষ্টিত হইয়া মহা সুখে কাল কাটাইতেছেন। আমাকে তো বাজে খরচের খাতায় থুইয়া আখড়াই দলের সঙ্গে লিপ্ত হইয়া কলিকাতাস্থ বড় বড় মানুষের মনোরঞ্জনে উদ্যমী হইয়াছেন। এদিকে আমার গানবাজনা শুনবে এমন মনুষ্য দেখি না। সে সব শিকেয় উঠেছে। খেয়ে ঘুমিয়ে প্রায় এক ঘৃণিত জীবন

কাটাইতেছি।
রাজা মহানন্দের এত আদরের ধন ছিলাম, তিনি মরিতেই আমার কপালে সব দুঃখ-কষ্ট আসিয়া জড়ো হইল। আপনার উপর আমি খুব নির্ভরতা রাখিয়াছিলাম। কিন্তু এক্ষণে তাহা সবই ভ্রান্ত মনে হইতেছে। খুবই মনোকষ্টে রহিয়াছি। আপনার
চরণে আমার বিনীত প্রার্থনা, সত্ত্বর এখানে আসিয়া এই অভাগীর মনোকষ্ট লাঘব করুন।”
“আরিব্বাস! তুমি তো খুব লম্বা চিঠি লিখেছ হে! নৃত্যগীতে যেমন পারদর্শিনী, তেমনই তো দেখছি কথা সাজাতেও খুবই যত্ন করেছ।”
শ্রীমতী উঠে এসেছে তার চেয়ার থেকে। পুনরায় বাবুর বক্ষলগ্ন হয়ে বলল, “ওহ্, এ সব আমার সাজানো কথা মনে হচ্ছে! বেশ! আর কখনও মনের কথা প্রকাশ করব না।”
“আমি কি তাই বলেছি! আমি বলেছি চিঠি লেখা খুব সুন্দর হয়েছে।”
কিছুক্ষণ রামনিধির বুকের ভিতর মুখ গুঁজে থাকার পর শ্রীমতী বলল, “তুমি বসো বাবু। আমি তোমার রাতের খাবার নিয়ে আসি। আজ বাড়ি ফিরে কাজ নেই।”
রামনিধি বাধ্য ছেলের মতো মাথা নাড়েন। গান আসছে মাথার ভিতরে। বেশি কথা বলে তাকে তাড়িয়ে দিতে চান না। তিনি বললেন, “রাতে থাকব যখন, এখন আহারের বন্দোবস্ত না করে তোমার ওই বিলেতি সুরার বোতল আর গ্লাস পাঠিয়ে দাও। মনে হচ্ছে অনেকদিন বাদে আজ গান হবে।”
“আ হা হা! খুব ভাল কথা। কতদিন পর তোমার গান শুনব!”
“তুমি এখন যাও। আগে নিজে সেধে নিই। তারপর রাতে তোমাকে শোনাব। তুমি যাও, তোমার দাসীকে দিয়ে একটু সুরা পাঠিয়ে দাও তো!”
শ্রীমতী ঝুঁকি নিতে চাইছে না আজ। সে নিজেও এসেছে আলতাবালার সঙ্গে। বড় একটা পেতলের রেকাবিতে লাল মদের বোতল। পাশে ইতালীয় ফিনফিনে মদের গ্লাস। আখরোট, কাজুবাদাম, কিসমিসের একটা প্লেট। সব টেবিলে রেখে দিয়ে দাসী বেরিয়ে গিয়েছে।
দরোজার বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল শ্রীমতী। সে দেখল রামনিধি রাজা মহানন্দের সারেঙ্গিটা নিজের কোলের উপর টেনে এনেছেন। তখনও ছড়ে টান দেননি হয়তো। প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। শ্রীমতী সকৌতুকে বলল, “তুমি বাজাতে জানো! কই আগে তো কখনও বলোনি!”
“না, তেমন কি আর জানি! ছাপরায় যখন কালোয়াতি গান শিখতাম, তখন ওস্তাদ মাঝে মধ্যে সারেঙ্গি ধরিয়ে বলত, বাজা বাজা। সারেঙ্গি না জানলে খেয়াল, গজল কিচ্ছুটি তেমন করে গাওয়া যায় না। সুরের উপরে দখল নিতে গেলে, এই যন্ত্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে হয়।”
“খুব ভাল। কিন্তু বাবু, তুমি যন্ত্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পারলে। আর তোমার সামনে একজন জ্যান্ত সুর ও সুরার মানবীমূর্তি দাঁড়িয়ে, তাকে তুমি অবহেলা করছ! আমি কি ফুরিয়ে গেছি?”
শ্রীমতীর কথার ভিতর কেমন কান্না ঝরছিল। রামনিধি সারেঙ্গি থেকে মুখ তুলে দরোজার সামনে দাঁড়ানো শ্রীমতীর দিকে তাকালেন। শ্রীমতী তখন আগুন রঙের মুর্শিদাবাদি সিল্কের শাড়ির আঁচল বুকের উপর থেকে সরিয়ে নিজের বুকের আগুন মেলে দাঁড়িয়ে আছে।
রামনিধির নজরে পড়ল, মখমলের সাদা কাঁচুলি ছিঁড়ে যেন বেরিয়ে আসতে চাইছে শ্রীমতীর যৌবন! নদীতে যখন খুব ঢেউ ওঠে, সে রকম দুটি প্রবল ঢেউ যেন আছড়ে পড়ার অপেক্ষায়। শ্রীমতীর সুরমা টানা দু'চোখে চোখ পড়তে দেখা গেল, সেখানে ঘন কালো মেঘ।
রামনিধি পালঙ্ক থেকে নেমে এলেন। সারেঙ্গিকে তার পুরনো জায়গায় রেখে এসে, শ্রীমতীর হাত ধরে ঘরের ভিতরে টেনে আনলেন। তারপর নিজেই দরোজা বন্ধ করে শ্রীমতীর মাথা দুই হাতে চেপে ধরে মুখ চুম্বন করলেন। শাড়ি, কাঁচুলি নিজের হাতে খুলে চললেন একে একে। আর খুব নিবিড় চোখে এক নগ্ন দেবীমূর্তির প্রতিটি অঙ্গের ছবি যেন নিজের বুকের ভিতর সাজিয়ে নিতে থাকলেন।
শ্রীমতীর নগ্ন শরীর কোলে করে তুলতে তেমন বেগ পাওয়ার কথা নয় শালপ্রাংশু দীর্ঘ চেহারার রামনিধির। প্রতিদিন সকালে তিনি কিছুক্ষণ কুস্তি করেন আখড়ায়। তারপর গঙ্গায় সাঁতার। তাঁর শরীরে কোথাও প্রৌঢ়ত্ব ছায়া ফেলতে পারেনি। শ্রীমতীকে যত্নে পালঙ্কে নামিয়ে রামনিধি শ্রীমতীর চোখের উপর নিজে নিজেকে নিরাবরণ করলেন।
যেন দু'জন কিন্নর-কিন্নরী এই ঘরে দিব্য আলোক তৈরি করেছে। আজ রামনিধি শ্রীমতীর রূপ রস আকণ্ঠ পান করলেন নিজের সমস্ত ইচ্ছা আর সামর্থ দিয়ে।
রামনিধি নিজেকে ধুতি আর আংরাখায় আবৃত করে নেওয়ার পর, শ্রীমতীর নগ্ন শরীর বুকে করে টেনে তুললেন বিছানা থেকে। তারপর শাড়ি ও কাঁচুলি হাতে দিয়ে বললেন, “শ্রীমতী, আজ আমার খুব তৃপ্তি হয়েছে। এখন আমি কিছুটা ক্ষুধার্তও বটে। তুমি যাও, আমার আহারের আয়োজন কর। তারপর সারা রাত আমরা গান শুনব একে অপরের।”
শ্রীমতী ঘর থেকে বেরোতেই রামনিধি খুব দ্রুত গ্লাসে মদ ঢেলে দু'চুমুক দিলেন তাতে। বসে পড়লেন পালঙ্কে। সারেঙ্গিতে ছড় ঘষলেন।
কখন থেকে তাঁর মনে হচ্ছিল একখানা গান আসছে, যা খুব চমৎকার হবে। রামনিধি সারেঙ্গির সুরের সঙ্গে অল্প স্বরে গাইলেন,


“তারে ভুলিব কেমনে।
প্রাণ
সঁপিয়াছি যারে, আপন জেনে।।
আর কি
সেরূপ ভুলি, প্রেম-তুলি করে তুলি,
হৃদয়ে
রেখেছি লিখে, অতি যতনে।।
সবাই
বলে আমারে, সে ভুলেছে, ভুলো তারে,
সেদিনে
ভুলিব তারে, যেদিন লবে শমনে।।”

শ্রীমতী রামনিধির রাতের আহার নিয়ে ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই রামনিধি উত্তেজিত স্বরে বললেন, “শোনো, শোনো শ্রীমতী, গান পেয়ে গিয়েছি।”
শ্রীমতী রামনিধির কথার উত্তর না দিয়ে দাসী আলতাবালাকে বলল, “ওই টেবিলের উপর খাবার নামিয়ে রেখে তুই যা। আর দেখিস তো, বাইরে জালায় হাতমুখ ধোওয়ার জল ঠিকঠাক আছে
কি না!”
আলতাবালা বেরিয়ে যেতে শ্রীমতী বলল, “আগে রাতের আহারটা সেরে নাও বাবু, তারপর গান শুনব।”
“তুমি খাবে না?”
“তুমি তো জান বাবু, আমি সন্ধ্যাবেলায় এক গ্লাস দুধ খেয়ে রাতের আহার সমাপ্ত করি। আর কিছু না।”
খাবার শেষে রূপোলি আর সোনালি তবক দেয়া পান চিবিয়ে ফরসিতে অল্প দু-একটা টান দিয়ে রামনিধি সারেঙ্গিতে ছড়ের ঘর্ষণ জোরালো করলেন। এই বাড়ির পিছন দিকটা যথেষ্ট ফাঁকা। সুরের সাধনায় কোনও গৃহস্থের ঘুম ভাঙার উপায় নেই। মানে এদিকটায় বসতিই নেই।

(ক্রমশ)
অলংকরণ: সৌমেন দাস

# সাজ কাহনে সাবেকিয়ানা

সারা বছর ক্যাজুয়াল পোশাকে কাটালেও দীপাবলি, ভাইফোঁটার সাজে চাই সাবেকি ছোঁয়া। ফেস্টিভ ফ্যাশনে পাঞ্জাবি ও ধুতির এক্সক্লুসিভ লুক নিয়ে এবারের ফ্যাশন ফাইল।



ধূসর রঙের খাদি সিল্কের পাঞ্জাবিতে হ্যান্ড এমব্রয়ডারির কাজ। সঙ্গে জামদানির আদলে সাদার উপর কালো দিয়ে ব্লক প্রিন্ট করা ধনেখালি ধুতি।

পোশাক: সেরিনিটি বাই সৈকত
ফোন: ৮৭৭৭৩৭১৪৪০



লাল সুতির পাঞ্জাবি। ইয়োকে মাল্টিকালার্ড সুতোয় হ্যান্ড এমব্রয়ডরি করা পারসি কাজ। সঙ্গে জিওমেট্রিক ধনেখালি ধুতিতে সাবেকি সাজ।

পোশাক: সেরিনিটি বাই সৈকত



অফ হোয়াইট পাঞ্জাবির উপর লাল ও সবুজের কম্বিনেশনে কাঁথাস্টিচ করা ফুল ও টিয়াপাখির মোটিফ। অন্যজনের পরনে ফুল ও পাখির মোটিফ প্রিন্ট করা নীল পাঞ্জাবি ও চুড়িদার।

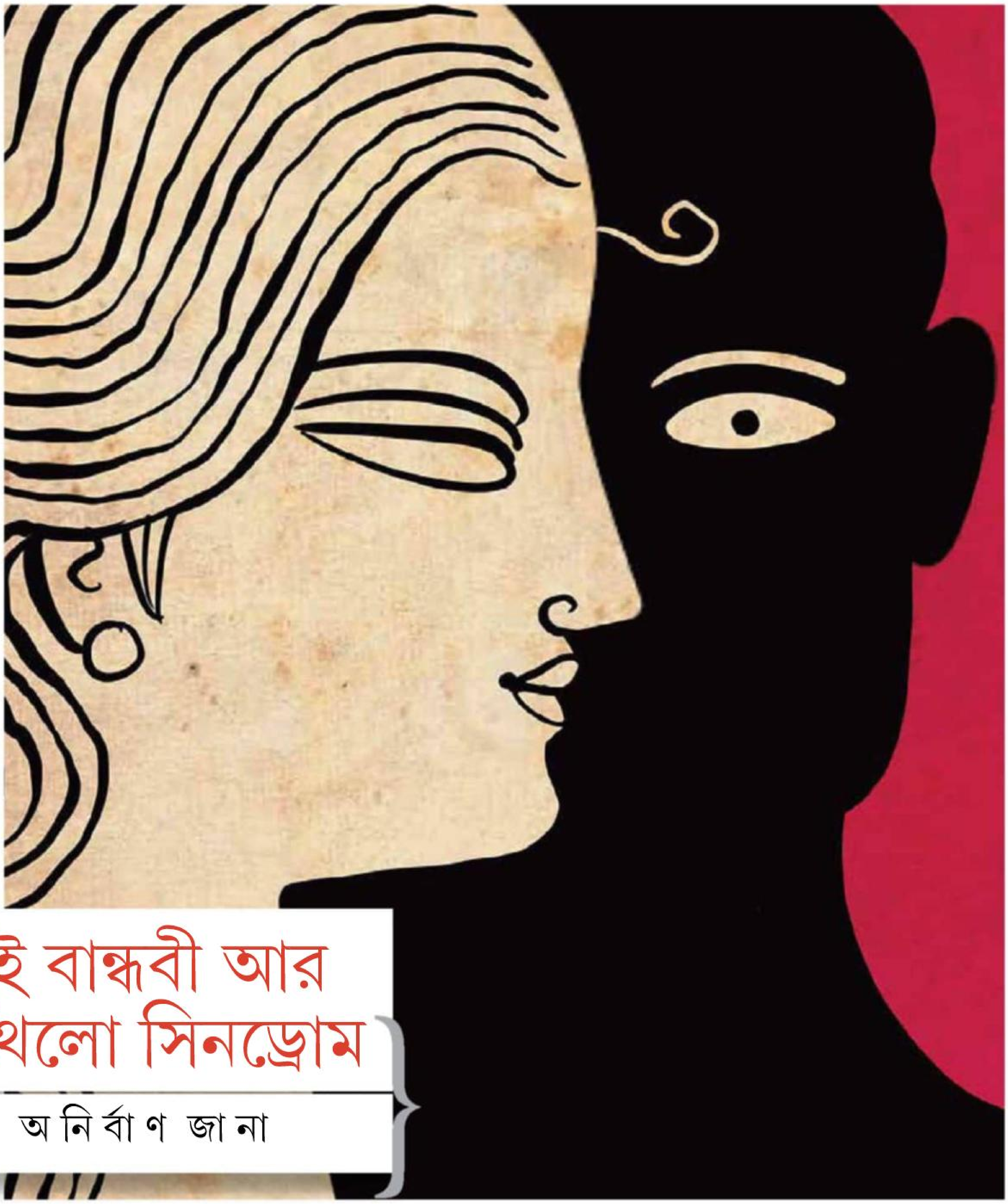
**পোশাক:** সেল্ফ স্টোরি বাই শান্তনু গুহঠাকুরতা ও সুমিত ঘোষ চৌধুরী
**ফোন:** ৯৭৪৮৭৫৬৩৬৪



অঙ্গরাখা স্টাইলের লাল তসর সিল্কের পাঞ্জাবিতে সাদা কালো মধুবনি পেন্টিং। দীপাবলির সকালের আউটফিট হিসেবে একদম পারফেক্ট!

**পোশাক:** সেরিনিটি বাই সৈকত

**মডেল:** শদমন, শুভঙ্কর
**মেক-আপ:** সায়ন্ত ঢালি
**ফোন:** ৯০৫১৪৪৫৩৫৭
**স্টাইলিং:** প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী
**লোকেশন:** দ্য স্ট্যাডেল
সল্টলেক স্টেডিয়াম ক্রিকেট গ্রাউন্ড, গেট নং ৩
**ফোন:** ০৩৩ ৭১৬৪৪৬০০
**ওয়েবসাইট:** www.thestadel.com
**ছবি:** সোমনাথ রায়
**শুটিং কোঅর্ডিনেশন:** মৌমিতা সরকার
**রূপায়ণে:** অসীম হালার, পিয়ালী বালা



# দুই বান্ধবী আর ওথেলো সিনড্রোম

অনির্বাণ জানা

**১. অনমিত্র...**

হাত দিয়ে মাথা কাটা টেকনিক্যালি সম্ভব নয়। অনমিত্র সিংহ ফিজ়িক্সের প্রফেসর। মাথা কাটতে গেলে হাতের যে ভেলোসিটি বা ওজনের প্রয়োজন, তা সাধারণ মানুষের থাকা সম্ভব নয়। এক যদি হাতটা হঠাৎ করে ধারালো অস্ত্রে পরিণত না হয়। একটা বিদেশি সিনেমায় অনমিত্র হাতের এ রকম পরিবর্তন দেখেছিল অবশ্য। তবে যাই হোক, সে আপাতত তার উকিল সাহেব শঙ্খবাবুর বক্তব্য চোখ গোল গোল করে শুনছিল। তার কেসের জজ নাকি হাত দিয়ে গলা কাটেন!

অনমিত্রর পদবি সিংহ হলেও আদতে সে বেশ ভিতু ধরনের মানুষ। মধুজা জীবিতকালে দুঃখ করে বলত যে পদবী অনুযায়ী দুর্গার বাহনের তেজ হবে ভেবে সে অনমিত্রকে বিয়ে করেছিল। কিন্তু আসলে দেখা গেল, সে গণেশের বাহনকে বিয়ে করে বসে আছে। অবশ্য তাদের বিয়েতে মধুজা বা অনমিত্রর কোনও হাত ছিল না। অনমিত্রর জীবন ছিল নারীচরিত্র বর্জিত, আর মধুজার জীবন ছিল পুরুষ বেষ্টিত। টিভি বা মোবাইলে শাড়ির প্রোগ্রামে যেমন যে শাড়িটা পছন্দ হয় তার পরেরটাকে বেশি ভাল লাগে, সে রকমই হয়েছিল মধুজার। ক্লাস নাইন থেকে গ্র্যাজুয়েশন পর্যন্ত বয়ফ্রেন্ডের এক অস্বস্তিকর তালিকা দেখে, বাবা শেষ পর্যন্ত গুচ্ছ গুচ্ছ মিথ্যে কথা (গৃহকর্মনিপুণা, শান্ত, সুশীলা) লিখে কাগজে অ্যাড দেয়। অনমিত্রর ছোটবেলায় মা মারা গিয়েছে। বাবা আর অনমিত্র মেয়ে দেখতে এসেছিল। দুটো তো মাত্র পুরুষমানুষ! মধুজার বাঁয়ে হাত কা খেল। প্রথম দর্শনেই দুই পুরুষ কুপোকাত। তবে এ সব কন্ট্রোভার্সিয়াল নারীবিরোধী কথা অনমিত্র মনেই আনতে চায় না। সমগোত্রের পুরুষমানুষেরও অভাব নেই এই পৃথিবীতে। জীবনের চলার

পথে কুড়িয়ে পাওয়া অভিজ্ঞতায় অনমিত্র হাড়ে হাড়ে এ তথ্য জেনে গিয়েছে।
সুতরাং এখন উকিলের মুখের দিকে তাকিয়ে, জজ সাহেবার রোম খাড়া করে দেওয়া বিবরণ শোনা ছাড়া তার আর কোনও গতি নেই। যে বিচারকের আদালতে মধুজা হত্যা মামলাটা পড়েছে, তিনি একজন মহিলা। সুস্মিতা খান্ডেলওয়ালা। সঙ্গে সঙ্গে আর একজনের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল অনমিত্রর। ভাগ্য ভাল যে সেই সুস্মিতা বাঙালি ব্রাহ্মণ। গঙ্গোপাধ্যায়।
গল্পের শুরুতেই একটা আপাত ভুল কথা বলা হয়েছে। অনমিত্রর জীবনে নারীচরিত্র ঝটিকা সফরের মতো এসেছিল। একবারই। অনমিত্র তখন ক্লাস ইলেভেনে পড়ে। ম্যাথসের প্রাইভেট টিউশনি নিতে যেত সুবীরবাবুর বাড়িতে। প্রচুর ছাত্রছাত্রী। সুবীরবাবুর অনেকগুলো ব্যাচ ছিল। অনমিত্র এমনিতে বয়েজ় স্কুলে পড়ত। ফলে ব্যাচের মেয়েরাই ওর জীবনে প্রথম সহপাঠিনী। অল্প দিনের মধ্যে সকলে জেনে গেল অনমিত্র অঙ্কে দারুণ ভাল। স্যার এবং অন্য সকলে, বিশেষ করে মেয়েরা নেকনজরে দেখত ওকে। আর কে না জানে মেয়েরা পাইলট, সিনেমা স্টার আর অঙ্কে ভাল ছেলেদের প্রেমে দুমদাম পড়ে যায়! তবে টিউশনি পড়তে গিয়ে মেয়েদের দিকে তাকানোর মতো গর্হিত কাজ কখনওই করত না অনমিত্র। তখন দুর্গাপুজো আসি আসি করছে। আশ্বিনের শারদ প্রাতে বেজে উঠেছে আলোকমঞ্জীর, ধরণীর বহিরাকাশে অন্তরিত মেঘমালা... এ রকম এক উলটোপালটা সময়ে একদিন একটা মেয়ে দেরি করে এসে, ধুপ করে অনমিত্রর পাশে বসে পড়ল। মেয়েটার মুখের দিকে তাকানোর মতো গর্হিত কাজটাই করে বসল অনমিত্র। ব্যস, দুম করে গলায় গিয়ে হৃৎপিণ্ডটা আটকে গেল! অনমিত্র পরে একজন ডাক্তার বন্ধুকে গলায় হার্ট আটকানোর ব্যাপারটা বলেছিল। সে যাত্রাদলের ভিলেনের মতো ঘর কাঁপানো একটা হাসি হেসে জানায় যে, গলায় হার্ট আটকানো আর মেট্রোরেলের টানেলে বোয়িং বিমান আটকানো একই ব্যাপার। অবশ্য ডাক্তাররা কখনওই বিশ্বাসযোগ্য কথা বলে না। পাশে বসা সেদিনের সেই মেয়েটি মোটামুটি প্রিয়াঙ্কা চোপড়া ও ঐশ্বর্য রাইয়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারার মতো সুন্দরী। অবশ্য ছেলেদের সেই বয়সটা বড় অন্যরকম, আপন মনের মাধুরী মেশাতে সব সময়ই তার মন তৈরি! মেয়েটির নাম সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়।

অনেকদিন পরে ওদের ব্যাচের অয়ন আলগোছে জিজ্ঞেস করেছিল যে, অনমিত্র কেন সুস্মিতাকে ওদের বাড়ি থেকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিল?



এরপরে দেখা গেল, প্রতিদিনই সে অনমিত্রর পাশে বসছে এবং কিছু না বুঝতে পারলেই ওকে জিজ্ঞেস করছে। অনমিত্রর তখন দ্বৈত রোল। সামনে মুখ করে বসলে ছাত্র, আর পাশের দিকে তাকালে শিক্ষক। কিন্তু মুশকিলটা হয়ে গেল কয়েক দিনের মধ্যেই। একটা ক্যালকুলাসের ইন্টিগ্রেশন মন দিয়ে বোঝার চেষ্টা করছিল অনমিত্র। হঠাৎ পায়ের পাতায় একটা রাম চিমটি। মুখ দিয়ে প্রায় আর্তনাদ বেরিয়ে গিয়েছিল। হাঁ করা অবস্থাতেই মুখ ফিরিয়ে দেখে সুস্মিতা মিটিমিটি হাসছে। পায়ে চিমটি খেয়ে ক্যালকুলাস তখন মাথায় উঠেছে। সেই প্রথমবার সুবীরবাবুর প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনি অনমিত্র।
কিন্তু এরপরের ঘটনাগুলোর জন্য প্রস্তুত ছিল না সে। অনমিত্রর ধুম জ্বর এল। এতটাই জ্বর যে, ও উলটোপালটা কথা বলত। ভুলভাল জিনিস দেখত চোখে। গোবিন্দদা বলে একজন ছোটবেলা থেকে ওদের বাড়িতে থাকে। অনমিত্র এবং ওর বাবা, দু'জনেই তাকে গোবিন্দদা বলে ডাকে। তার বয়সের গাছ এবং পাথর, দুটোরই খোঁজ পাওয়া ভার। তার চেয়েও বড় ব্যাপার, গোবিন্দদা ভয়ংকর ভুলো মনের। গোবিন্দদা অসুস্থ মানুষের খুব সেবা করতে পারে। যে এক সপ্তাহ অনমিত্রর জ্বর ছিল, সেই এক সপ্তাহ গোবিন্দদা ওকে ছেড়ে নড়েনি বললেই চলে।
জ্বরের মধ্যে অনমিত্র দেখল যে সুস্মিতা এসেছে। অবশ্য জ্বরের ঘোরে অনেককেই আসতে দেখেছে। প্রথম যেদিন বেশি জ্বর এসেছিল সেদিন শাহরুখ খান ওকে দেখতে এসেছিল। সুস্মিতা অবশ্য বেশ সাবলীলভাবেই ঘরের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। বাবা বাড়ি ছিল না। ঘোরের মধ্যেই দেখতে পায়, গোবিন্দদা সুস্মিতার জন্য চা করতে গেল। অনমিত্র, সেদিন টিউশনিতে সুস্মিতা কেন ও রকম করেছিল, জিজ্ঞেস করে। সুস্মিতা কিছু ক্ষণ গোলাপফুলের মতো দেখতে হয়ে যায়.... একেবারে ডাঁটি সুদ্ধু। বাতাসে ভেসে থাকা একটা হারমোনিয়ামের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে কিছু খোঁজে। হারমোনিয়াম থেকে শব্দ ভেসে আসে, 'তুমি বোঝো না?' তারপর হারমোনিয়ামটা অনেকগুলো সরগম বাতাসে ছড়িয়ে দেয়। অনমিত্র কী বলবে ভেবে পায় না। সুস্মিতা ঠিক এক হাজার বছর সেখানে বসে থাকে। বুকের ভিতরে খুব কষ্ট হয় অনমিত্রর। অদ্ভুত একটা রাগ হয়। সোজা কথা মানুষ সোজা করে বলবে না কেন? সুস্মিতাকে বলে যে, কোনও কথাই ও বুঝতে চায় না। গোলাপের ডাঁটিটা শক্ত করে চেপে ধরে অনমিত্র। সুস্মিতাকে ছিঁড়ে ফেলে বৃন্ত থেকে। সুস্মিতা কেঁদে ফেলে। ওর চোখের জল নামতে নামতে ওকে আস্তে আস্তে গলিয়ে ফেলে। মেয়েটা গলে গিয়ে ছোট্ট এককাপ চায়ে পরিণত হয়। গোবিন্দদাকে জিজ্ঞেস করে কেউ এসেছিল কি না। কেউ আসেনি। ও-ই নাকি গোবিন্দদার কাছে চা খেতে চেয়েছিল। কিন্তু অনমিত্র তখন চা খেত না।
সুস্মিতা সুবীরবাবুর টিউশনি ছেড়ে দিয়েছিল। অনেকদিন পরে ওদের ব্যাচের অয়ন আলগোছে জিজ্ঞেস করেছিল যে, অনমিত্র কেন সুস্মিতাকে ওদের বাড়ি থেকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিল? অয়ন আর সুস্মিতার মধ্যে ভাল সম্পর্ক ছিল। সুস্মিতার বাবা নাকি মহারাষ্ট্রে ট্রান্সফার হয়ে গিয়েছেন। সুস্মিতার সঙ্গে অয়নেরও আর যোগাযোগ নেই।
সুস্মিতা খান্ডেলওয়ালা নিশ্চয়ই সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায় নয়! এই সুস্মিতা নাকি হাত দিয়ে মাথা কাটে! উকিল সাহেব এক পায়ের উপর আর এক পা তুলে, একটা সিগারেট ধরান। ধোঁয়ার একটা রিংয়ের ভিতর দিয়ে আর একটা রিং ছাড়তে ছাড়তে বলেন, "আপনার অ্যালিবাই খুব স্ট্রং। না হলে আপনিই তো মেন সাসপেক্ট হতেন।" কথা বলার ভঙ্গিতে মনে হল, সে জন্য উকিল সাহেব একটু দুঃখিতও হতে পারেন! মধুজা মারা যাওয়ার দু'দিন আগে একটা সরকারি পুরস্কার নিতে দিল্লি গিয়েছিল অনমিত্র। কয়েকটি জায়গায় লেকচার দেওয়ারও কথা ছিল। পুরস্কার নেওয়ার পরদিন সকালে কলকাতা পুলিশ অনমিত্রকে ডেকে নেয়। মধুজার ডেডবডি বাড়িতে পাওয়া গিয়েছে। বছর খানেক আগে বাবা মারা গিয়েছে। তারপর থেকে মধুজা আরও ডেসপারেট হয়ে গিয়েছিল। যে ছেলেটি খুন করেছে, সে পাড়ার স্বনামধন্য মস্তান। আগে থেকেই তার নামে আরও কয়েকটা কেস ঝুলছে। তবে মার্ডার কেসে এটাই হাতেখড়ি বোধহয়। সে জন্যই ফেঁসে গিয়েছে বেচারি।
যে গল্পটা অনমিত্র শুনেছে, সেটা স্বামীর শোনার জন্য খুব একটা উপাদেয় নয়। নবা দাসের একটা বেশ চলতি ব্যবসা আছে। গাঁজা,

চরস, ড্রাগসের বড়সড় মহাজন সে। শহরের নামী-দামি পুলিশ অফিসাররা তাকে একেবারে নামে চেনে। প্রায়শই থানার লকআপের অতিথিশালায় সম্মানিত অতিথি হতে হয় তাকে। নবার সঙ্গে মধুজার কীভাবে সম্পর্ক হয়, সেটা গবেষণার বিষয়। মধুজা সিগারেট খেত, মদ্যপানেও বেশ রুচি ছিল। এর-তার সঙ্গে শুতও নাকি। কিন্তু গাঁজা ধরার মতো অধঃপাতে গিয়েছে বলে কখনওই মনে হয়নি অনমিত্রর। ফরেনসিক রিপোর্ট বলছে, মধুজা সেই রাতে সে রকম কিছু একটা নেশা করেছিল। নেশার জোগানদার ও সঙ্গী ছিল নবা দাস। কারণ নবা দাসের ও বাড়িতে যাতায়াতের কথা বাড়ির কাজের মহিলা



দরজা ভেঙে মধুজার ডেডবডি পাওয়া যায়। গলায় ফাঁস লাগিয়ে মৃত্যু। পোস্টমর্টেম বলছে হোমিসাইডাল হ্যাঙ্গিং, অর্থাৎ অন্য কেউ ফাঁস লাগিয়ে খুন করেছে মধুজাকে।

শম্পা পুলিশকে জানিয়েছে। নবা দাসের সঙ্গে নেশা করার সময় ও অনমিত্রদের বাড়িতে ছিল। শম্পাকে সামনের গেটে তালা লাগিয়ে চলে যেতে বলে মধুজা। বাড়ির পিছন দিকে একটা দরজা আছে। সে দরজায় কম্বিনেশন লক লাগানো। আনলক করার নম্বরটা শুধু মধুজা আর অনমিত্র জানত। লকটাও একটা বিশেষ নম্বর দিয়ে করা যেত। এতে অবশ্য অনমিত্রর একটু বৈজ্ঞানিক কারিকুরিও আছে। এখন বোঝা যাচ্ছে যে নম্বরটা নবারও অজানা ছিল না। কারণ পিছনের দরজাও বন্ধ ছিল। দরজা ভেঙে মধুজার ডেডবডি পাওয়া যায়। গলায় ফাঁস লাগিয়ে মৃত্যু। পোস্টমর্টেম বলছে হোমিসাইডাল হ্যাঙ্গিং, অর্থাৎ অন্য কেউ ফাঁস লাগিয়ে খুন করেছে মধুজাকে। পরের দিনই নবাকে গ্রেফতার করে পুলিশ।
আদালত চত্বরটায় লোকজন প্রচুর। দশটায় হাজিরা দিয়েছে অনমিত্র। সমনের কাগজটাতে সে রকমই লেখা ছিল। এখন শুনছে জজ সাহেবা বারোটার আগে এজলাসে উঠবেন না, কী একটা কাজ আছে। অনমিত্রর উকিল চোখ নাচিয়ে বলেন, ‘‘একবার নবার সঙ্গে দেখা করবেন নাকি? পুলিশ একতলার লক-আপে বাছাধনকে সকাল থেকে এনে রেখেছে।’’

অনমিত্র মাথা নাড়িয়ে আপত্তি জানায়। একাধারে স্ত্রীর প্রেমিক এবং খুনির টু-ইন-ওয়ানকে দেখতে আহ্লাদে আটখানা হওয়ার কিছু কারণ ঘটেনি। কিন্তু শঙ্খবাবু জবরদস্ত উকিল, না-কে হ্যাঁ করিয়ে ছাড়তে জুড়ি মেলা ভার। অনমিত্রকে নবা দাসের কাছে যেতেই হল।
নবা দাসের চেহারাটা মোটেই ইমপ্রেসিভ নয়। কেমন যেন ভয় পাওয়া কুকুরের মতো গুটিয়ে বসেছিল। আদালতের ভিতরে যে এ রকম একটা গরাদওয়ালা ঘর থাকতে পারে, অনমিত্রর জানা ছিল না। ঘরের বাইরে বেশ অস্বস্তি নিয়ে দাঁড়িয়েছিল অনমিত্র। শঙ্খ উকিল মনে হয় চেন স্মোকার। কিছু ক্ষণ আগে একটা সিগারেট শেষ করেছে। এখন যদিও হাতে সিগারেট নেই, তবুও একবার সিগারেট টানার ভঙ্গি করে আনমনে। নবা বোধহয় জানে শঙ্খ সরকারি উকিল, ওর বিরোধীপক্ষের লোক। তাই আরও গুটিয়ে বসে।
লক-আপের সামনে বসা পুলিশ শঙ্খকে চেনে। বেশ একটু কড়া গলায় নবাকে উঠে আসতে বলে। নবার মোটেই শঙ্খর সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছে ছিল না। বেচারা উঠে এসে গরাদের সামনে দাঁড়ায়। অনমিত্রর থেকে উচ্চতায় ইঞ্চি দুয়েক ছোটই হবে। রং কালোর দিকে। মুখে অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনের চিহ্ন স্পষ্ট। গালদুটো কোটরে ঢোকা। মধুজার রুচি স্পষ্টতই প্রশংসার যোগ্য নয়। অনমিত্র অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়।
যা সকলেই বলে, তা-ই বলে ওঠে নবা। বেশ কাকুতিমিনতি করে জানায় যে সে খুন করেনি। পুলিশ শুধু শুধু তাকে তুলে এনেছে। তার ধারণা, খুন করেছে শম্পা। ঘর থেকে কিছু খোয়া গিয়েছে কি না, দেখলেই বোঝা যাবে।
অনমিত্র ঢোক গেলে। ও আর ওই বাড়িতে থাকে না। বস্তুত মধুজার মৃত্যুর পর একবারই ও বাড়িতে গিয়েছিল অনমিত্র। পুলিশের সঙ্গে। সমস্ত কিছু দেখেটেখে, পুলিশকে কিছু খোয়া যায়নি বলে জবানবন্দিও দিয়েছিল ও। নিজের কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে গড়িয়ার কাছে পবিত্রর ফ্ল্যাটে উঠে আসে তারপর। পবিত্র ওর বাল্যবন্ধু। বিদেশে সেটেল্ড। বছরে একবার কলকাতায় আসে। ফ্ল্যাটের এক সেট চাবি অনমিত্রর কাছে থাকে। মধুজা যে বাড়িতে খুন হয়েছে, সে বাড়িতে থাকতেই পারবে না ও। এমনিতেই ওর বিশ্রী রকম ভূতে ভয়। রাতে আলো জ্বালিয়ে শোওয়া নিয়ে মধুজার সঙ্গে প্রায়ই লাগত।
নবা মধুজাকে খুন করেনি। ওর যুক্তিটা শোনা প্রয়োজন অনমিত্রর। গরাদের কাছে মুখ এনে বলে, ‘‘তুমি কেন বলছ যে শম্পা খুন করেছে? শম্পা তো বলেছে যে ও যখন সামনের দরজায় চাবি দিয়ে চলে যায়, তখন তুমি ঘরে ছিলে।’’

**২.নবা দাস...**

নেশা না করলে নবার মাথা কাজ করে না। লক-আপে নেশার ব্যবস্থা রাখা নিয়ে আন্দোলন হওয়া উচিত। দেশে কত উলটোপালটা ব্যাপার নিয়ে লোক মাথা ঘামায়! যতবার নবা জেলে এসেছে, ততবার রাখালদা এসে ঠিক ছাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে। রাখালদা স্থানীয় কাউন্সিলর। সেই সময় মাথার কাজটা রাখালদা করে দেয়। এবারে রাখালদারও মনে হয় কোনও প্রবলেম হয়েছে। কিছুতেই যোগাযোগ করছে না।
আর পুলিশগুলোও হয়েছে হাড়হাবাতে বজ্জাত! এতদিন ওদের সঙ্গে ওঠাবসা, খুনের মামলা দেওয়ার আগে একবার তো ভাববে! নবা দাস কখনও খুন করতে পারে? এই তোরা লোক চিনলি? পুলিশের কাজই তো লোক চেনা। মোট কথা নবা খুব বিরক্ত। ড্রাগসের ব্যবসা করতে গেলে নেতা পুলিশদের হাতে রাখতে হয়। নবা ঠিক সময়ে, ঠিক হিস্যা, ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেয়। ফলে লাইনে সে অল্প দিনের মধ্যেই বেশ নাম করে নিয়েছে।
মুশকিলটা করল মধুজা ম্যাডাম নিজে। মেয়েরা ড্রাগ নিচ্ছে, এ তো

ওপেন সিক্রেট! ম্যাডাম কিন্তু অল্পস্বল্প নেশা করে। খুব বেহিসেবি নেশা কখনওই করে না। তবে দামি মাল নিত। ফলে খদ্দের হিসেবে মধুজা শাঁসালো। একটু তেল দিয়েই চলত নবা। এই ধরনের খদ্দেরকে হাতে রাখা ভাল। তাই হঠাৎ করে গাঁজা আনতে বলায় ব্যোমকে গেলেও, না করেনি নবা দাস। ম্যাডাম কখনও বাইরে গিয়ে নেশার জিনিস কেনেনি, সব সময় হোম ডেলিভারিতে বিশ্বাস রেখেছিল। নবাকে দুএকবার বলেওছিল, একটা অ্যাপ তৈরি করতে। অর্ডার দেওয়া সহজ হবে। নবার দাঁত কেলানো ছাড়া কিছু করার ছিল না।
মধুজা ম্যাডাম ফোনেই অর্ডার করত। এই ব্যবসায় কিছু কোড ল্যাংগোয়েজ ব্যবহার করতে হয়। মধুজা ম্যাডাম সে সবের ধার ধারত না। ভর সন্ধ্যাবেলায় ফোন করে বলে যে, গাঁজা চাই! তার চেয়েও ভয়ংকর ব্যাপার হলো, নবাকে মধুজার বাড়ি গিয়ে গাঁজা খাওয়ানো শেখাতে হবে!
নবা অবশ্য কাটিয়ে দিতে পারত। কিন্তু ক'দিন ধরে বেশ মন্দা চলছিল ব্যবসায়। রাখালদা থেকে শুরু করে সব নেতারাই যখন-তখন টাকা চাইছে। ও কি চিটফান্ডের মতো লোক ঠকিয়ে ব্যবসা করে? খদ্দেরকে রীতিমতো আসলি মাল দেয়। ফলে দিনের শেষে নিজের ভাঁড়ে মা ভবানী ছাড়া কিছুই থাকে না। এ দুঃখের কথা কাকে আর বলা যায়?
নবা যখন মধুজার বাড়ি যায়, তখন সন্ধ্যা সাতটা হবে। মধুজা ম্যাডাম খুব অন্যমনস্ক ছিল। নবা জানে যে এই অন্যমনস্ক থাকাকে ডিস্টার্বড থাকা বলে। খুব মেজাজ দেখাচ্ছিল নবাকে। তখন মনে হচ্ছিল আনোয়ারকে পাঠালেই হত। আনোয়ার নবার বিশ্বস্ত কর্মচারী। একটু মারকুটে বলে বদনাম আছে। মুখের আগে হাত চলে যায়। ড্রাগসের ব্যবসায় আনোয়ারের মতো দু'চারটে লোক রাখতে হয়। মধুজাকে কয়েকবার মাল দিতে এ বাড়িতে এসেছিল। ওর চেনা জায়গা। অসুবিধে হত না কিছু। ম্যাডাম সাহস পেত না আনোয়ারকে কিছু বলার। শুধু শুধু ভর সন্ধ্যাবেলায় গালাগালি খাওয়া!
নবা দাস সব সহ্য করে চুপচাপ মধুজাকে কলকে ধরা শিখিয়ে দিয়েছিল। একেবারে ক্লাসিক্যাল পদ্ধতি। শম্পা বলে কাজের মেয়েটা এর মধ্যে একবার এসে চিংড়িমাছ ভাজা আর কাজুবাদাম রেখে গিয়েছিল। ম্যাডাম ওকে কিছুক্ষণ পরে বাইরের দরজায় তালা লাগিয়ে চলে যেতে বলে।
মধুজা তারপরই মেজাজ দেখাতে শুরু করে। নবা নাকি ভেজাল মাল বিক্রি করছে। একদম নেশা হচ্ছে না। প্রায় তাড়িয়ে দেওয়ার মতো করে ওকে উঠিয়ে দেয়। বলে যে, ভাল মাল সেই রাতেই না পাঠালে পুলিশকে ওর ব্যবসার কথা জানিয়ে দেবে। হুম, মায়ের, থুড়ি, মামার কাছে গিয়ে মাসির বাড়ির গল্প শোনাবে! পুলিশ যেন কিছু জানে না! পিছনের দরজার কম্বিনেশন লক খুলে মধুজা বের করে দেয় নবাকে।
পরদিন ভোরবেলা পুলিশ ওকে তোলে। নবা প্রথমে কারণটা বুঝতেও পারেনি। মধুজা ম্যাডামের নাম নেওয়ায় ভেবেছিল, আগের দিনের কথাগুলো নেহাত ফাঁকা আওয়াজ ছিল না। ম্যাডাম নির্ঘাত কলকাঠি নেড়েছে।
ম্যাডামেরই যে কলকাঠি নড়ে গিয়েছে, এটা বুঝতে বেশ সময় লেগেছিল নবার! সঙ্গে সঙ্গে রাখালদাকে ফোন করেছিল নবা। রাখালদা ঘচ করে কেটে দিয়েছিল। তারপর থেকে পুলিশের পোষাখানায় ফুডিং এন্ড লজিং নবার। একমাত্র আনোয়ার একদিন দেখা করতে এসেছিল। ও-ই বলেছে যে, নির্ঘাত খুনের ব্যাপার বলে রাখালদা জড়াচ্ছে না। তার উপর ঘটনাটা নিয়ে মিডিয়া মশলা চড়িয়ে বিরিয়ানি বানিয়ে ফেলেছে। কোনও নেতা খামোখা খুনের মামলায় নিজের নাম জড়াতে যাবেই বা কেন?
আনোয়ারকে নবা দিব্যি কেটে বলেছে যে খুনটা ও করেনি। আনোয়ারও বেশ চিন্তিত দেখা গেল। ওর মতে শম্পা খুন করেছে। ওর যুক্তিটা বেশ মনে ধরে নবার। পরে ভেবে দেখেছে, সেটা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।
মধুজা সাড়ে সাতটা-আটটার সময় শম্পাকে চলে যেতে বলে। শম্পা সামনের দরজায় তালা দিয়ে বেরিয়ে যায়। দরজার ডুপ্লিকেট চাবি রয়ে যায় ওর কাছে। ডাক্তারদের বয়ান অনুযায়ী, খুনটা হয়েছে নটা থেকে দশটার মধ্যে। দু'পাশের দরজাতেই তালা লাগানো। তার মানে, খুন যে করেছে তার কাছে হয় একটা চাবি আছে, নয় তো কম্বিনেশন লকের নম্বর জানে। কারণ মধুজা যদি তাকে দরজা খুলে দিয়েও আসে, মারা যাওয়ার পর আবার গিয়ে দরজা বন্ধ করে তো আসতে পারবে না! আর কম্বিনেশন লকটাও একটু জটিল। খোলার মতো বন্ধ করার জন্যও একটা বিশেষ নম্বর লাগে। ম্যাডামের বর নাকি ফিজিক্সের প্রফেসর। এ সব তাঁরই কীর্তি। সে লকটা বন্ধ ছিল। তাই অঙ্কটাও অনেক সোজা। শম্পা ফিরে এল নটা থেকে দশটার মধ্যে। নেশাগ্রস্ত মধুজার গলায় ফাঁস লাগিয়ে খুন করল। দামি জিনিসপত্র এবং টাকাকড়ি সরাল। তারপর দরজায় তালা লাগিয়ে কেটে পড়ল।
এটা নিয়ে যতটা পারা যায়, ভাবনাচিন্তা করেছে নবা। আজকে মধুজার বরকে সামনাসামনি দেখে সন্দেহটা গেঁড়ে বসল। লোকটা একদম আতামার্কা। পুলিশকে বয়ান দিয়েছে কিছু খোয়া যায়নি বলে। এ রকম লালটু টাইপের চশমা পরা লোক দেখলেই মটকা গরম হয়ে যায় নবার। আজ সামলে নেয় নিজেকে। পাশে আবার খচ্চর উকিলটা দাঁড়িয়ে আছে। তবু ওরাই এখন ভরসা নবার। নিজের যুক্তিটা সহজ করে বোঝাতে চেষ্টা করে ওদের।
শঙ্খ উকিল দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলে, ''কোনও মোটিভ নেই শম্পার। ঘর থেকে কিছু খোয়া যায়নি, সেটা অনমিত্রবাবু জানিয়ে দিয়েছেন। এক হতে পারে মধুজা দেবীর কাছ থেকে কিছু ধারফার নিয়েছিল। সেটা শোধ করতে পারছে না বলে খুন করে দিল। অনমিত্রবাবু, কিছু জানেন নাকি? আপনাদের কি কালো টাকা বেশি আছে? নোটবন্দির সময় কি শম্পাকে কিছু টাকা রাখতে দিয়েছিলেন?''
অনমিত্রকেও চিন্তাগ্রস্ত লাগছিল। একটু সময় নিয়ে 'না' বলে। শঙ্খ নিজের পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে দেখে, শেষ। বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া না দিলে কি আর কাজ হয়? দরজায় দাঁড়ানো পুলিশের দিকে তাকায়। অনমিত্রর দিকে তাকিয়ে বলে ''বিড়ি সিগারেট তো কিছু খান না।''
আবারও 'না' বলে অনমিত্র। গরাদের ও পাশে নবা দাস মাথা চুলকোচ্ছিল। ফস করে ঘন চুলের মধ্যে থেকে একটানে একটা বিড়ি বার করে এগিয়ে দেয় শঙ্খর দিকে, ''শেষটুকু খাবেন না স্যার। অল্প মাল পোরা আছে।''
বিড়িটা জামায় মুছে পকেটে পুরে নেয় শঙ্খ, ''শেষটুকুতেই মজা রে। সব কাজেই।''

**৩. সুস্মিতা....**

আর একটুখানি। লোকটার স্নায়ু ভাঙতে শুরু করেছে। সুস্মিতা চোখে চোখ রাখে। এই সময় চাপ সরানো যাবে না।
সুস্মিতা প্রথমে ভেবেছিল আইপিএস ক্যাডার হবে। প্রিপারেশনও তুখোড় ছিল। কিন্তু মা বেঁকে বসে। মেয়ে পুলিশ হবে, সেটা একদমই চাননি ভদ্রমহিলা। শেষ পর্যন্ত জুডিশিয়াল সার্ভিসে আসে। কিন্তু ভিতর থেকে পুলিশি মেজাজটা কখনও তাড়াতে পারেনি ও।
সুস্মিতা প্রথম থেকে এ রকম কঠোর ছিল না। একটু বেপরোয়া ছিল বটে, কিন্তু কখনওই কাউকে শরীর বা মনে আঘাত করেনি। ভিতর থেকে বেশ নরমসরম ছিল। ছোটবেলায় কলকাতার একটা স্কুলে পড়ত। প্রচুর বন্ধু ছিল। তবে বেস্ট ফ্রেন্ড ছিল মধুজা। ইলেভেন-টুয়েলভ সুস্মিতা অন্য স্কুলে পড়ে। কী করে যেন মধুজার সঙ্গে

যোগাযোগটাও বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। আবার সম্পর্ক জোড়া লাগে সুস্মিতার বাবা মহারাষ্ট্রে ট্রান্সফার হয়ে যাবার পর। কলকাতার জন্য খুব মন কাঁদত সুস্মিতার। মধুজার কনট্যাক্ট নম্বর জোগাড় করে ফোন করে ওকে। এক ঝটকায় ছোটবেলাটা সামনে এসে দাঁড়ায় ওদের। নিয়ম করে ফোন চলত তারপর। মাঝে মধ্যে ফোনে কথা শেষই হতে চাইত না। অবশ্য কথার থেকে হিহি-হাহা হাসিই বেশি হত! ওই বয়সের ওটাই যে নিয়ম।

নিয়মটা ভাঙতে শুরু করল মধুজার বিয়ে ঠিক হওয়ার পর। পাত্রের নামটা শুনে খটকা লেগেছিল। তারপর বাড়ির ঠিকানা আর পাত্রের বিবরণ শুনে সুস্মিতা নিশ্চিত হয়েছিল, এই অনমিত্রই ওর চেনা অনমিত্র। মধুজা তখন অনমিত্রর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। সুস্মিতা সাবধান করার সুযোগ পায়নি। তবু আলগোছে বলেছিল যে, কয়েকদিন একটু দেখেশুনে নিয়ে বিয়ে করা উচিত।

মাঝখানে আবার যোগাযোগ বন্ধ। এবার নতুন করে কথা শুরু করল মধুজা। ওর অসুবিধে হচ্ছে অনমিত্রর সঙ্গে। তত দিনে সঞ্জয় খান্ডেলওয়ালার সঙ্গে সুস্মিতার বিয়ে হয়ে গিয়েছে। সঞ্জয়ও বিচারক। একটা সুন্দর স্বাভাবিক দাম্পত্যের স্বাদ পেয়েছে সুস্মিতা। আর সঞ্জয় খুব কেয়ারিং টাইপের। মোটের উপর এবার মধুজা ফোন করলে ও এড়িয়ে যাওয়ারই চেষ্টা করতো। কে আর হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালবাসে! বিশেষ করে সেই মুহূর্তের সুখী সুস্মিতা নিজের অতীত ভুলতে চাইত যে!

হঠাৎ জ্বরগ্রস্ত অনমিত্র উঠে দাঁড়ায়। সুস্মিতার গলা টিপে ধরে বলে যে ও ছাড়া কারওর দিকে তাকালে শেষ করে দেবে একেবারে।



লোকে বলে, প্রথম প্রেমে নাকি অভিশাপ থাকে। মেয়েরা ছেলেদের চোখ বোঝে। সুস্মিতা বুঝতে পেরেছিল অনমিত্র ওর প্রেমে পড়েছে। এটাও জানা ছিল, অনমিত্র কখনও ওকে প্রপোজ করবে না। সেই মেরুদণ্ড ওর ছিল না। কিন্তু সুস্মিতা যে প্রেমে পড়েছিল, একেবারে হাবুডুবু খাওয়া প্রেম!

এর মধ্যে একদিন অনমিত্র অসুস্থ হলো। মন বড় উথাল-পাথাল করছিল সুস্মিতার। সাহস করে চলেই যায় অনমিত্রদের বাড়ি। কথায় কথায় অনমিত্র জিজ্ঞেস করে, ও কাউকে পছন্দ করে কি না। ইয়ার্কির স্বরে সুস্মিতাও জানায়, ''লম্বা লাইন আছে। তুমি সিট না বুক করলে আরএসি-তে দাঁড়িয়ে থাকা কেউ ঢুকে যাবে।''

হঠাৎ জ্বরগ্রস্ত অনমিত্র উঠে দাঁড়ায়। সুস্মিতার গলা টিপে ধরে বলে যে ও ছাড়া কারওর দিকে তাকালে শেষ করে দেবে একেবারে। সুস্মিতার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসে। খুব কাছ থেকে মৃত্যুকে দেখে নেয় ও। কোনওভাবে ওই বাড়ি থেকে পালিয়ে আসে সুস্মিতা। অনেকদিন গলায় ব্যথা ছিল, ভাল করে কথা বলতে পর্যন্ত পারত না।

অনেকদিন দুঃস্বপ্নের মতো স্মৃতিটা তাড়া করেছে। পরে এক ডাক্তার বন্ধুকে ঘটনাটা জানিয়েছিল। অনমিত্র খুব সম্ভবত একটা মানসিক রোগে আক্রান্ত। 'ওথেলো সিনড্রোম'। পার্টনারকে সব সময় সন্দেহের চোখে দ্যাখে এরা। খুন পর্যন্ত করতে পারে। কিন্তু বাকি সামাজিক জীবন একদম স্বাভাবিক। কেউ দেখে সন্দেহ পর্যন্ত করতে পারবেনা। মধুজা ওর অস্বাভাবিক দাম্পত্যজীবনের কথা বলায় ধারণাটা আরও দৃঢ় হয় সুস্মিতার।

এর মধ্যে সুস্মিতা পশ্চিমবঙ্গে ফিরে এসেছে। সঞ্জয়ও একই জায়গার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট। একদিন সুস্মিতার সঙ্গে দেখা করে মধুজা। সেদিন অনেকগুলো মিটিং ছিল বলে ভাল করে কথা বলা হয়নি। ঠিক হয়েছিল পরে একদিন দু'জনে একসঙ্গে কাটাবে। সেই দিনটা আর আসেনি। তার আগে খুন হয়ে যায় মধুজা।

সেদিন মধুজাকে দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে ও আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। ও বারবার বলছিল যে, অনমিত্র ওকে প্রাণে মেরে দিতে পারে। ও যে আতঙ্ক তাড়াতে ড্রাগস নিচ্ছে, সেটাও সুস্মিতাকে জানায়। আর একটা ভয়ংকর কথা বলে। মধুজাকে নাকি লোক দিয়ে খুন করাবে অনমিত্র। অনমিত্র এখন নামকরা প্রফেসর। নিজের নামের সঙ্গে খুনখারাপির কেস জড়াবে না।

মধুজার মৃত্যুসংবাদটা কাগজে পড়ে সুস্মিতা। সঞ্জয়ের অনেক চেনাজানা। ওর সুপারিশে সুস্মিতার আদালতে কেসটা আসে। এর মধ্যে নিজস্বভাবে কিছু গোয়েন্দাগিরি চালিয়েছে ও। বেশ কয়েকবার নবার ঠেকেও গিয়েছে। অবশ্য কাছাকাছি বডিগার্ড ছিল। কোনও ঝামেলা হলে তারা ঠিক সামলে নিত। কেউ ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করেনি। নবা ছিল না বলে আনোয়ার কাজ চালাচ্ছে। ওর কাছে সাধারণ খদ্দেরের মতো ড্রাগসও কিনেছে।

আজ আনোয়ারকে তুলে আনিয়েছে সুস্মিতা। ওর নামে আরও দুটো খুনের মামলা ঝুলছে। সুপারি কিলিং। অর্থের বিনিময়ে খুন করে আনোয়ার। তবে কিছুতেই স্বীকার করছে না ও। সুস্মিতার স্টেনোগ্রাফার ছেলেটা আনোয়ারের সব কথা রেকর্ড করছে। বেচারি দরদর করে ঘামছে। ম্যাডাম এইভাবে জেরা করতে পারেন না, এটা বেআইনি!

দাবড়ে চুপ করিয়ে দিয়েছে সুস্মিতা।

কোর্টের এই বিল্ডিংটা ব্রিটিশ আমলের। কড়িকাঠটা অনেক উঁচুতে। কালো কালো সমান্তরাল লাইন। সুস্মিতা কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে থাকে। একটা কড়িকাঠের লাইনকে কী করে বাঁকিয়ে অন্য লাইনের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া যায়? লাইন দুটো জুড়ে গেলেই অন্য লাইন দিয়ে উৎসে ফেরা যাবে। একটু সময় নেয় সুস্মিতা। গলাটা অনেক নরম করে নেয়। যেন স্টেনোগ্রাফার ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করছে, এমনভাবে বলে ওঠে, ''মধুজাদের বাড়ির কম্বিনেশন লকটা কি যেন?''

আনোয়ার 'তিন সাত' বলেই থমকে যায়। সুস্মিতা মৃদু হেসে জলের গ্লাসের ঢাকা খুলে একটু জল খায়, ''কে বলেছে? অনমিত্র?''

কড়িকাঠের কালো লাইনটা বেঁকে এসে অন্যের সঙ্গে জুড়ে যায়।

**৪. অনমিত্র.... আবার**

''এজলাসে ম্যাডাম উঠছেন,'' বলে একজন পিলে চমকানো হাঁক মারে। একজন মহিলা গটগট করে এসে চেয়ারে বসেন। তাঁকে দেখে অনমিত্রর দ্বিতীয়বার পিলেটা চমকায়। মহিলা এক এবং অদ্বিতীয় সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়। ইশারায় শঙ্খকে বলে, জজ সাহেবা ওর চেনা।

তৃতীয়বার পিলেটা চমকায় আরও একজন চেনা মানুষ দেখে। আসামিদের দাঁড়ানোর জন্য কোর্টের ভিতরে একটা কালো খাঁচা রয়েছে। সেখানে দুটো পুলিশ ঠেলেঠুলে আনোয়ারকে ঢোকাচ্ছে। আস্তে আস্তে পিছু হাঁটে অনমিত্র। ''সাক্ষী অনমিত্র সিংহ,'' বলে সেই লোকটা এবার ডাক পাড়ে।

অনমিত্র প্রায় দরজার কাছে চলে এসেছে। পালাতে হবে। ধরা পড়ে গিয়েছে ও।

একদম দরজার মুখে কেউ একজন কাঁধে হাত রাখে ওর।

**অলংকরণ:** রৌদ্র মিত্র





# স্লিক অ্যান্ড শাইনি হেয়ার

চুল স্ট্রেট করানোর পরও মনের মতো ফল পাচ্ছেন না? ঘরোয়া যত্নেই হতে পারে আপনার সমস্যার সমাধান। পরামর্শ দিচ্ছেন রূপ বিশেষজ্ঞ শেহনাজ় হুসেন।

পুজোর সময় চুল স্ট্রেট করিয়েছিলাম একটি সালোঁ থেকে। কিন্তু যেরকম চুল চাইছিলাম, একেবারেই সেরকম হয়নি। নীচের অংশ স্ট্রেট এবং মসৃণ দেখালেও, স্ক্যাল্পের উপরের অংশ অত্যন্ত রুক্ষ এবং উসকোখুসকো হয়ে থাকে। যতই সেরাম ব্যবহার করি, তেল লাগাই, কিছুতেই চুল মসৃণ হয় না। হেয়ার স্টাইলিস্টের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। তিনি আবার চুলে স্ট্রেটনিং করানোর পরামর্শ দিয়েছেন। বুঝতে পারছি না, চুলের তাতে ক্ষতি হবে কিনা। সামনেই কালীপুজো। কোনওভাবে কি তার মধ্যে চুল সুন্দর করে তোলা সম্ভব? এর আগে অনেকবারই চুল স্ট্রেট করিয়েছি। শেষবার করিয়েছিলাম মাসতিনেক আগে। তখনও এ রকম হয়নি। কীভাবে মসৃণ চুল পাব, জানালে খুব উপকৃত হব।

*স্বর্ণালী দত্ত, ই-মেল মারফত*

আপনার চুল স্বাভাবিক অবস্থায় কোন টেক্সচারের, সে কথা লেখেননি। ধরে নিচ্ছি, আপনার চুল স্বাভাবিকভাবে স্ট্রেট নয়। এক্ষেত্রে ঠিকমতো চুল স্ট্রেট না করালে, এ ধরনের সমস্যা হওয়া স্বাভাবিক। সাধারণত চুল স্ট্রেট করালে তা মোটামুটি তিন মাস অবধি থাকে। তবে, আপনার ক্ষেত্রে সম্ভবত শেষ বার চুল ভালমতো স্ট্রেট করা হয়নি এবং তারই প্রভাব পড়েছে এবারের স্ট্রেটনিংয়ে। আপনি লিখেছেন, তিন মাস আগে শেষ চুল স্ট্রেট করিয়েছিলেন। আগামী দু'মাসের মধ্যে দ্বিতীয়বার চুল স্ট্রেট না করাই ভাল। ঘন ঘন এত পরিমাণ হিট ব্যবহার করলে চুলের ক্ষতি হতে পারে। চিন্তা করবেন না, কালীপুজোর আগে মসৃণ চুল পাওয়ার জন্য কিছু ঘরোয়া সমাধানের পরামর্শ দিচ্ছি। আশা করি উপকার পাবেন। ২ ফোঁটা যে কোনও লাইট ভেজিটেবল অয়েল (সানফ্লাওয়ার অয়েল বা অলিভ অয়েল) হাতের তালুতে নিয়ে ভালভাবে স্প্রেড করে নিন। এবার সেই হাত চুলের উপরের অংশে বা যে অংশ উসকোখুসকো দেখাচ্ছে, সেখানে বুলিয়ে নিন। খুব হালকা ভাবে হাত বুলোবেন, না হলে চুল তৈলাক্ত দেখাতে পারে। অথবা তেল লাগানো হাতে চুলের নীচের অংশ নিয়ে স্ক্রাঞ্চ করুন। এতে চুলের রুক্ষতা খানিকটা কম দেখাবে। অথবা একটা স্প্রে বোতলে খানিকটা ক্রিম-বেসড কন্ডিশনার আর সমপরিমাণ জল ভরে রাখুন। প্রয়োজনমতো চুলে স্প্রে করে ভালভাবে চুল ব্রাশ করে নিন, যাতে পুরো মিশ্রণটা চুলে ভালমতো ছড়িয়ে পড়ে। এই ক'দিন গরম জল দিয়ে একেবারে চুল ধোবেন না। শ্যাম্পু করার পর চুল না ঘষে তোয়ালে জড়িয়ে রাখুন, যাতে তা বাড়তি জল শুষে নিতে পারে। হেয়ার ড্রায়ার যদি ব্যবহার করতে চান, সেক্ষেত্রে বড় রাউন্ড ব্রাশও ব্যবহার করুন। চুল ছোট ছোট অংশে ভাগ করে একটা করে অংশ ড্রায়ার দিয়ে শুকিয়ে নিন। সব সময় ডাউনওয়ার্ড ডিরেকশনে, অর্থাৎ চুলের গ্রোথের দিকে ড্রায়ার চালাবেন। এতে চুলের রুক্ষতা বশে থাকবে।



**প্রশ্ন পাঠান:** sananda@abp.in



তেলুগু ইন্ডাস্ট্রিতে গত কুড়ি বছর ধরে দাপিয়ে রাজত্ব করছেন দেবী শ্রী প্রসাদ (ডিএসপি)। ‘পুষ্পা’ তাঁকে জাতীয় স্তরে খ্যাতি দিয়েছে। হাতে একগুচ্ছ বলিউড ও দক্ষিণী ছবি। তাঁর সঙ্গে জুম আড্ডায় মধুরিমা সিংহ রায়।

# “ ট্র্যাভেল করতে করতে গান তৈরি করি ”

*২০ বছরে একশোর উপরে ছবি তাঁর ফিল্মোগ্রাফিতে। তেলুগু বাণিজ্যিক ছবিতে দু’দশক ধরে জনপ্রিয়তম গানের একটা বড় অংশই তাঁর সুরে। পেয়েছেন অসংখ্য সম্মান। ‘পুষ্পা’র পরে বলিউডেও একগুচ্ছ কাজ...*

**আপনার গান মানেই প্রচুর এনার্জি। কয়েকদিন আগে আপনার নতুন সিঙ্গল ‘ও পরী’র লঞ্চ করলেন রণবীর সিংহ। এনার্জির রহস্য নিয়ে একে অপরকে কী বললেন?**
আমার এনার্জির রহস্য কিন্তু পুরোপুরি মিউজ়িক। যখনই কেউ আমাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন, আমি এটাই বলি (হাসি)! রণবীর স্যারের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। সবসময়ই হয় গান শুনছেন, স্পিকার অন করে আছেন। আগের দিন তো আমরা দু’জনেই প্রবল নেচেছি। আসলে, বোধহয় দু’জনের মধ্যেই এই মিউজ়িকের এনার্জি হল যোগসূত্র। আই লাভ হিম ফর দ্য ওয়ে হি ইজ়। আর ওর গানের প্রতি ভালবাসাও বলার মতো।

**‘ও পরী’র নেপথ্যের ভাবনা কী ছিল?**
অনেকদিন ধরেই ভাবছিলাম, হিন্দিতে মিউজ়িক ভিডিও নিয়ে আসব। অনেকদিন ধরেই এই স্বপ্ন ছিল, তাই এই মিউজ়িক ভিডিওকে প্যান ইন্ডিয়ান পপ বলছি আমি। প্যান ইন্ডিয়ান মুভি যখন এত চলছে, তখন প্যান ইন্ডিয়ান পপ কেন নয়! অনেক তরুণ মিউজ়িশিয়ানরা এর ফলে সুযোগ পাবে নিজেদের আঞ্চলিক গণ্ডি পেরিয়ে সর্বভারতীয় স্তরে কাজ করার। ‘পুষ্পা’র অনেক আগে থেকেই ইচ্ছে ছিল আলাদা আলাদা ভাষায় পপ মিউজ়িক তৈরির। লকডাউন আমাকে সেই কাঙ্ক্ষিত সময়টুকু দিয়েছিল। আসলে, একাধিক ভাষায় গান তৈরি করলে এগজ়িকিউট করতে সময় লাগে

অনেকটাই। ঠিক এই কারণেই 'পুষ্পা'র গানগুলো তৈরি করতেও সময় লেগেছিল অনেক। এই মিউজ়িক ভিডিও আমি মাইকেল জ্যাকসনকে উৎসর্গ করতে চাই। ছোটবেলা থেকে ওঁর ভিডিও দেখেই বড় হয়েছি। কোভিডের পরে ইন্ডিপেন্ডেন্ট মিউজ়িকের চাহিদাও বেড়েছে।

**'পুষ্পা'র ক্ষেত্রে একই গান আলাদা আলাদা ভাষায় তৈরি হলেও শ্রোতাদের কাছে প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র। কম্পোজ়ার হিসেবে একই গান আলাদা ভাষায় বানানোর মধ্যে কী চ্যালেঞ্জ থাকে?**

আমার মনে হয়, গানের কথা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মিউজ়িক ইজ় ইউনিভার্সাল। একটি গানকে সেই অঞ্চলের মানুষের কাছে গ্রহণীয় করে তোলার জন্য সেই সাউন্ডস্কেপের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কথা লেখা প্রয়োজন। অনেকসময়ে একটি ব্লকবাস্টার গানের অন্য ভাষায় শুধু অনুবাদটুকু করা হয়, তাই তা লোকের মনও ছোঁয় না! আমি নিজে তেলুগু, তামিল, ইংরাজি ও হিন্দি চারটি ভাষাই লিখতে, বলতে, পড়তে পারি। ফলে, কোন গানের কথা কেমন শুনতে লাগবে, তা নিজে অনেকটাই বুঝতে পারি। 'শ্রীভল্লি' যেমন তেলুগুতে সিড শ্রীরাম গেয়েছেন। দারুণ ক্লাসিক্যাল গায়ক। হিন্দিতে চেয়েছিলাম এই গানের মেলডি যেন দীর্ঘদিন অবধি লোকের মনে থাকে। হিন্দিতে 'ডিঙ্কা চিকা', 'ড্যাডি মাম্মি' বা 'সিটি মার'-এর মতো ডান্স নাম্বার করেছি। মেলডি সেভাবে কখনও করিনি। মেলডির সঙ্গে সুফির ছোঁয়া থাকুক, এটা ভেবেই জাভেদ আলি স্যারকে নেওয়া। দেয়ার ইজ় আ উর্দু টিঞ্জ টু ইট। তাই, দক্ষিণের চেয়ে হিন্দি ভার্শন শুনতে আলাদা লেগেছে। পাঁচটি ভাষাতে পাঁচজন আলাদা সঙ্গীতশিল্পীকে দিয়ে গাইয়েছি প্রতিটি গান। অনেক সময় নিয়ে গায়ক নির্বাচন করেছিলাম।

**আল্লু অর্জুনের অসংখ্য আইকনিক গান আপনার তৈরি। ব্যক্তিগত বন্ডিংটা কীরকম?**

আমরা প্রায় একসঙ্গে বড় হয়েছি বলতে পারেন। দু'জনেরই চেন্নাইতে জন্ম। ওর বাবা আর আমার বাবা খুব বন্ধু ছিলেন, পারিবারিক বন্ধু বলতে পারেন। স্কুলে পড়ার সময় থেকেই একে অপরকে চিনতাম। ইন্ডাস্ট্রিতে শুরুটাও প্রায় একই সময়েই। ওর প্রথম বড় ব্রেক 'আরিয়া'-তে আমার মিউজ়িক ডিরেকশন ছিল। এতটাই বন্ধুত্ব যে কোনও পার্টিতে আল্লু অর্জুন থাকলে তবেই যাই আমি! হি ইজ় আ ভেরি ফান লাভিং পার্সন। উই হ্যাভ মিউচুয়াল লাভ। আমি চেন্নাইতে থাকি, ও হায়দরাবাদে থাকে। চেন্নাইতে এলেই প্রথম ফোনটা আমাকে করে। আর দু'জনেই নাচতে খুব ভালবাসি। ওর জন্য যখনই কোনও গান তৈরি করি, আগে মাথার মধ্যে নাচের ছন্দ ঘুরতে থাকে।



**'পুষ্পা: দ্য রুল'-এর কাজ কতদূর এগোল?**

গানের কথা লেখার কাজ অনেকটাই এগিয়েছে। আলাদা আলাদা ভাষায় কাজও চলছে জোরকদমে। বেশি কিছু এখন বলতে পারব না। তবে এটুকু বলতে পারি সুকুমার স্যর (পরিচালক) দুর্ধর্ষ স্ক্রিপ্ট লিখেছেন! আপনাদের চেয়েও বোধহয় আমি বেশি মুখিয়ে আছি।

**হায়দরাবাদ, চেন্নাই, মুম্বই...এতগুলো জায়গাতে একসঙ্গে কাজ করতে অসুবিধে হয় না?**

টাইম ম্যানেজমেন্ট একটা বড় চ্যালেঞ্জ। এই যেমন এখন মুম্বইতে গানের প্রোমোশন চলছে, একইসঙ্গে 'দৃশ্যম টু'-এর মিটিং চলছে। কাল হায়দরাবাদ, পরশু চেন্নাই, তারপরেই বেঙ্গালুরু যাচ্ছি (সাক্ষাৎকারের সময়ে)। আমি কিন্তু ট্র্যাভেল করতে করতেও গান তৈরি করি! স্টুডিওতে আমার দারুণ টিম আছে, ওরা সাহায্য করে। 'শ্রীভল্লি' সাড়ে চার মিনিটে কম্পোজ় করেছিলাম। 'সামি সামি' বা 'ও অন্তভা' কোনও ইনস্ট্রুমেন্টেই সেভাবে কম্পোজ় করিনি।

**নিজের জন্য সময় পান?**

অন্য কেউ হলে, গান শুনে বা গেয়েই হয়তো আনওয়াইন্ড করতেন! আমার কাছে সেটাই পেশা। এটা অন্যতম বড় আশীর্বাদ বলতে পারেন। অনেক সময় তো পরিচালকের ন্যারেশন শুনতেই শুনতেই সুর তৈরি করে ফেলি! এর বাইরে আমি খুবই ফান লাভিং পার্সন। ক্লাবে গেলে সবার শেষে বেরোই, ডিজে বন্ধ করে দেওয়ার পরে (হাসি)! এত নাচতে ভালবাসি।

**প্রায় ২০ বছরের অসম্ভব সফল কেরিয়ার। পিছনে ফিরে দেখলে কী মনে হয়?**

সবসময় মনে হয়, এই তো শুরু হল জার্নি। ১৬ বছর বয়সে শুরু করেছিলাম কেরিয়ার। আমার বাবা তেলুগু ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির অন্যতম শ্রদ্ধেয় লেখক ছিলেন। স্কুলে পড়ার সময় থেকেই স্টুডিওতে যেতাম। কিংবদন্তিদের সান্নিধ্য পেয়েছি। আমি হয়তো ডিজিট্যাল যুগে কাজ করতে পেরেছি, কিন্তু আগেকার শিল্পীদের দেখেছি কত পরিশ্রম করে কাজ করতেন। এটাই আমাকে অনুপ্রেরণা দেয়। ক্লাস ফোরে পড়ার সময়ে ম্যান্ডোলিন-বাদক ইউ শ্রীনিবাসের শিষ্য হই। জ়াকির হুসেন স্যর, বালামুরলীকৃষ্ণ স্যর এঁদের সান্নিধ্য পেয়েছি।

**ভাষা আপনার কাছে কখনও বাধা হয়নি। বাংলাতে গান বানাবেন ভবিষ্যতে?**

বাংলা আর মরাঠি ফোক আমার বিশেষ প্রিয়। শ্রেয়া ঘোষালের সঙ্গে প্রচুর গানে কাজ করেছি। ওকে প্রায়ই বলি, একটা বাংলা গান বানাতে হবে। শ্রেয়া আমার নতুন নাম দিয়েছে, 'দেবী শ্রী প্রসাদ চ্যাটার্জি'...জানি না কেন (হাসি)!

**এরপরে আর কী আসছে?**

বরুণ ধাওয়ানের 'বাওয়াল' (নীতিশ তিওয়ারির পরিচালনা, 'দঙ্গল'-এর পরিচালক)। 'দৃশ্যম টু' (অজয় দেবগণের), 'সার্কাস' (রণবীর সিংহের) রয়েছে হাতে। আর সলমন খানের 'কিসি কা ভাই কিসি কি জান'-এরও কাজ চলছে।

**ছবি:** ইনস্টাগ্রাম




লাল মুরগি

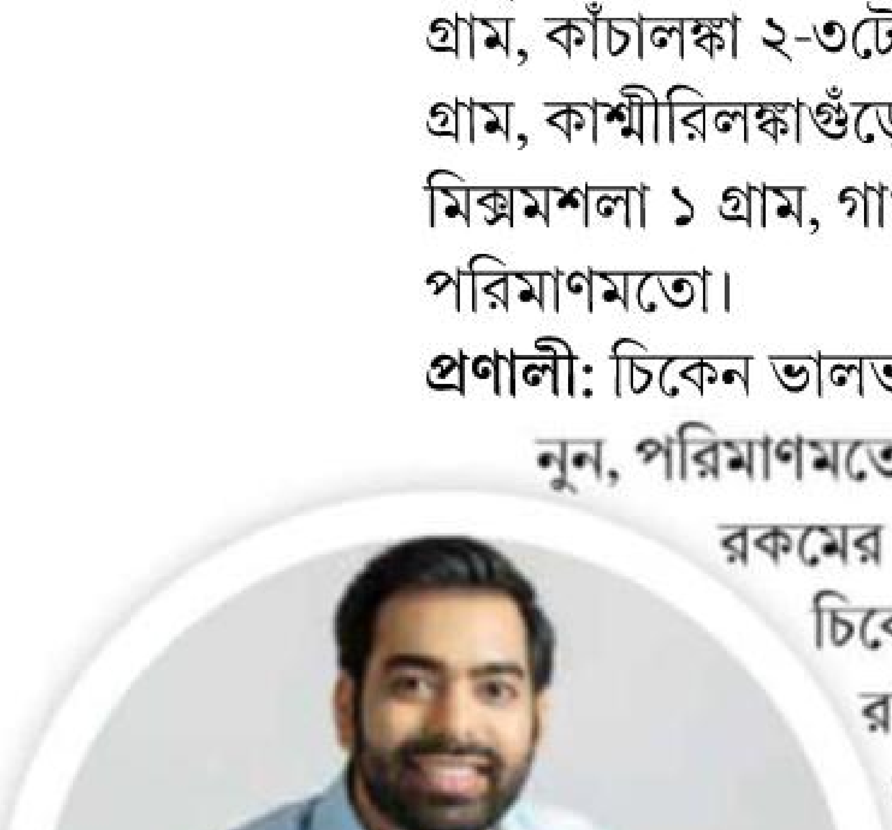
পোলাও থেকে কবিরাজি, ভেটকি থেকে চিংড়ি। জিভে জল আনা এমনই কিছু কলকাতা স্পেশ্যাল রেসিপি নিয়ে হাজির ‘ই-ডাব্বা’র কর্ণধার ভেদান্ত পসারি।

জন্মদিন হোক বা বিয়েবাড়ি, বাঙালি মেনুর ম্যাজিকই আলাদা। রইল তেমনই কিছু রেসিপি...

## লাল মুরগি

**উপকরণ:** চিকেন ২০০ গ্রাম, পেঁয়াজ ৮০ গ্রাম, আদা ২০ গ্রাম, রসুন ২০ গ্রাম, ধনেপাতাকুচি ৩ গ্রাম, দই ৫০ গ্রাম, সর্ষের তেল ২০ গ্রাম, জিরেগুঁড়ো ১/২ গ্রাম, ধনেগুঁড়ো ১/২ গ্রাম, হলুদগুঁড়ো ১/২ গ্রাম, কাঁচালঙ্কা ২-৩টে, শুকনোলঙ্কাগুঁড়ো ১/২ গ্রাম, কাশ্মীরিলঙ্কাগুঁড়ো ১/২ গ্রাম, কলকাতার মিক্সমশলা ১ গ্রাম, গাওয়া ঘি ১০ গ্রাম, নুন ও চিনি পরিমাণমতো।

**প্রণালী:** চিকেন ভালভাবে ধুয়ে নিন। দই, স্বাদমতো নুন, পরিমাণমতো চিনি, তেল ও সমস্ত রকমের মশলা ১/৪ গ্রাম করে নিয়ে চিকেন ম্যারিনেট করে ১ ঘণ্টা রাখুন। পেঁয়াজ, আদা ও রসুন ভালভাবে পেস্ট করুন। কড়াইতে তেল দিন ও তৈরি করা পেস্ট নাড়াচাড়া করুন। ম্যারিনেট করা চিকেন যোগ করুন। তেল ছেড়ে এলে কাশ্মীরিলঙ্কাগুঁড়ো, পরিমাণমতো দই, স্বাদমতো নুন ও চিনি এবং সামান্য জল দিন। গ্রেভি সঠিক ঘনত্বে




চিংড়ি পোলাও

পৌঁছালে একটি পাত্রে ঢালুন। ধনেপাতাকুচি দিয়ে মনের মত সাজিয়ে ভাত কিংবা রুটির সঙ্গে পরিবেশন করুন।

## চিংড়ির পোলাও

**উপকরণ:** মাঝারি মাপের চিংড়ি ২৫টা(হলুদগুঁড়ো ও নুন দিয়ে ম্যারিনেট করা), শুকনো চাল ১ কাপ, জলে ভেজানো চাল ১/৪ কাপ, ঘি পরিমাণমতো, লবঙ্গ ১০ গ্রাম, এলাচ ৪-৫টা, দারচিনি ১০ গ্রাম, জয়িত্রী ১ টেবলচামচ, জায়ফল ১-২টি, তেজপাতা

২টি, টোম্যাটোকুচি ১০ গ্রাম, কাঁচালঙ্কা ৪-৫টা, পেঁয়াজকুচি ১০ গ্রাম, আদাবাটা ১০ গ্রাম, ১০ গ্রাম, রসুনবাটা ১০ গ্রাম, ধনেপাতা ১০ গ্রাম, পুদিনাপাতা ১০ গ্রাম, কাশ্মীরিলঙ্কাগুঁড়ো ১০ গ্রাম, নারকেলের দুধ ১ কাপ, নুন ও চিনি স্বাদমতো।

**প্রণালী:** একটি পাত্রে ১ টেবলচামচ তেল দিন। চিংড়িগুলো হালকা ভেজে তুলে রাখুন। প্যানে ঘি গরম করে তাতে ২টি তেজপাতা, দারচিনি, পেঁয়াজকুচি, আদাবাটা, রসুনবাটা, কাঁচালঙ্কা দিয়ে ৪-৫ মিনিট ভালভাবে নাড়াচাড়া করুন। এরপর টোম্যাটোকুচি, কাশ্মীরিলঙ্কাগুঁড়ো, ধনেপাতা, ১ কাপ নারকেলের দুধ দিন। ভেজে রাখা চিংড়ি দিন। পরে ঘন গ্রেভি থেকে চিংড়ি সরিয়ে রাখুন। অন্য প্যানে ১ টেবলচামচ ঘি, ৩-৪টে লবঙ্গ ও কয়েকটা এলাচ দিয়ে, জল ঝরিয়ে রাখা ভাত দিন ও ৩ মিনিট রান্না করুন। গ্রেভিতে ভাত যোগ করুন। পরিমাণমতো মশলা ও জল দিয়ে (জল ও ভাতের অনুপাত ১.৫:১) কিছুক্ষণ ঢেকে রাখুন। তৈরি হয়ে এলে আগে থেকে রেডি করা চিংড়ি ও ১/২ টেবলচামচ ঘি দিয়ে কম আঁচে মিনিট ৩-৪ রেখে দিন। তৈরি লা-জবাব চিংড়ির পোলাও।


ফিস কবিরাজি


ভুনা চিংড়ি রোল

## ফিস কবিরাজি

**উপকরণ:** মাছ ম্যারিনেশনের জন্য: ভেটকি মাছের ফিলে ৪টি(২০০ গ্রাম), রসুন ৫-৬ কোয়া, লবঙ্গ ৫ গ্রাম, আদা ১/২ ইঞ্চি, কাঁচালঙ্কা ২টি, গোলমরিচগুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, লেবুর রস ১ টেবলচামচ, ভিনিগার ২ চা-চামচ। কোটিংয়ের জন্য: ডিম ২টো, ব্রেডক্রাম্ব ১কাপ, স্বাদমতো নুন। ক্রিস্পি কভারের জন্য: ডিম ৪টে, কর্নফ্লাওয়ার ৬ টেবলচামচ, বেকিং সোডা ১০ গ্রাম, কলকাতার মিক্সমশলা ১ চা-চামচ, স্বাদমতো নুন।

**প্রণালী:** ভেটকি মাছের ফিলেগুলি জল ও ২ চা-চামচ ভিনিগারের মিশ্রণে ১৫-২০ মিনিট রাখুন। আদা, রসুন ও কাঁচালঙ্কার পেস্ট তৈরি করুন। মিনিট ২০ পর মিশ্রণ থেকে মাছের ফিলেগুলি তুলে আদা-রসুনের পেস্ট, গোলমরিচগুঁড়ো, লেবুর রস ও পরিমাণমতো নুন দিয়ে ভালভাবে মাখিয়ে ১ ঘণ্টা রেখে দিন। একটি পাত্রে ব্রেডক্রাম্ব নিয়ে ১/২ চা-চামচ নুন দিন। দু'টি ডিম ফেটিয়ে, ফিলেগুলিতে ভালভাবে ব্রাশ করে, ব্রেডক্রাম্ব মাখিয়ে ১৫ মিনিট ফ্রিজে রেখে দিন। মাছের ফিলেগুলি ছাঁকা তেলে লাল করে ভাজুন। অন্য পাত্রে ডিম, কর্নফ্লাওয়ার, বেকিং সোডা, গোলমরিচগুঁড়ো ও নুন নিয়ে ভালভাবে মিশিয়ে ব্যাটার তৈরি করুন। প্যানে পরিমাণমতো তেল দিন। তেল গরম হলে ব্যাটারে আঙুল দিন ও তেলের উপরে হাত ঘুরিয়ে বিভিন্নভাবে ছিটিয়ে ওয়েব বা জাল তৈরি করুন। মাছের ফিলে সাবধানে এই জালের মধ্যে রাখুন। তৈরি হয়ে গেল হোমমেড ফিস কবিরাজি।



চিংড়িতে প্রচুর পরিমাণে সেলেনিয়াম থাকে যা আমাদের শরীরে অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট হিসাবে কাজ করে।

## ভুনা চিংড়ি রোল

**উপকরণ:** ডিম ১টা, মাঝারি মাপের চিংড়ি ৫টা, রসুনবাটা ১/২ চা-চামচ, শুকনোলঙ্কাগুঁড়ো ১/৪ টেবলচামচ, ভিনিগার ১/২ চা-চামচ, পেঁয়াজকুচি ১/২ চা-চামচ, শশাকুচি ১/৪ চা-চামচ, কাঁচালঙ্কা ২টো, ঘরে তৈরি পরোটা ১টি, সৈন্ধব লবন ১/২ চা-চামচ, টোম্যাটোসস ১ টেবলচামচ, লেবুর রস ১/২ টেবলচামচ, তেল ২ টেবলচামচ, নুন ১/৪ চা-চামচ।

প্রণালী: রসুনবাটা, শুকনোলঙ্কাগুঁড়ো, নুন ও ভিনিগার দিয়ে চিংড়িগুলো ম্যারিনেট করুন। প্যানে তেল দিয়ে পেঁয়াজকুচি, শশাকুচি ও কাঁচালঙ্কাকুচি লাল করে ভাজুন। ম্যারিনেটেড চিংড়ি দিয়ে নাড়াচাড়া করুন। অন্য একটি প্যানে ডিম ফেটিয়ে তৈরি করে রাখা পরোটা ডিমের উপর দিন, দু'দিকে সমানভাবে মাখিয়ে তুলে নিন। ভেজে রাখা পেঁয়াজ-শশাকুচি, চিংড়ি ও লেবুর রস দিয়ে রোলের আকারে পাকিয়ে নিলেই রেডি ভুনা চিংড়ি রোল।

রান্না শেখা তো হল। তবে আর দেরি কেন? হাতা-খুন্তি নিয়ে নেমে পড়ুন পুজোর মরশুমে অতিথিদের চমক দিতে!

**যোগাযোগ:** ৭৫৯৬০৪০০৪০



ছবি: আর্কাইভ

# স্মৃতিশিল্পী: আনি এরনো

একটি স্মৃতিকে আর-এক স্মৃতির সামনে রাখেন। মুখোমুখি হয় অতীত। সাহিত্যে নোবেলজয়ী আনি এরনোর স্মৃতিশিল্পের আলোচনায় সায়ম বন্দ্যোপাধ্যায়।

আনি এরনো একদিন এক্স-রেটেড অর্থাৎ পর্নোগ্রাফিক একটি ছবি দেখছিলেন। এ ধরনের ছবি দেখা তাঁর সেদিনই প্রথম। ছবিতে কোনও কাহিনি নেই, আখ্যানের কোনও আবরণ নেই। ছল নেই। পর্নোগ্রাফিতে এসব থাকে না। এরনো দেখছেন, এক পুরুষের উত্থিত পুরুষাঙ্গ, এক নারীর যোনি, ক্লোজ় আপে। তারপর তাদের কাছাকাছি আসা। পুরুষ প্রবেশ করল নারীতে। বারবার সেই ক্রিয়া বিভিন্ন দিক থেকে দেখানো হচ্ছে। দৃশ্যগুলি দেখতে দেখতে এরনোর মনে হচ্ছিল, যে জৈবক্রিয়া যুগ-যুগান্ত ধরে চলে এলেও প্রকৃতপক্ষে যার চরিত্র গোপন, যা আপাত-লজ্জার, যা রমণরত নর-নারী ব্যতীত তৃতীয় কোনও ব্যক্তির 'দেখা'-র কথা ভাবাই যেত না, পর্নোগ্রাফি তাকেই কেমন যেন করমর্দনদৃশ্য দেখার মতো সহজ করে তুলেছে।

একজন সাধারণ মানুষ এখানেই থেমে যেতেন তাঁর পর্যবেক্ষণে। আনি এরনো সাধারণ নন, সাহিত্যের যাবতীয় রীতিনীতি-প্রথা অতিক্রমকারী একজন লেখক, অলজ্জ একজন শিল্পী তিনি। তিনি ওখানে থামলেন না। এগোলেন। লিখলেন, পর্নোগ্রাফিক ওই ছবি তাঁকে জানান দিচ্ছে যে, লেখার উদ্দেশ্যও হওয়া উচিত 'to replicate the feeling of witnessing sexual intercourse, that feeling of anxiety and stupefaction,

এরনো গঠন করে ফেলেন তাঁর স্বতন্ত্র, স্বকীয় ধারা— অটোফিকশন। আত্মজীবনের স্থান-কাল-পাত্রের পূর্ণ উল্লেখ না-রেখে, স্মৃতিকে একাধারে মাধ্যম ও অস্ত্র করে, এক শাব্দিক ও ভাষাগত সংগ্রামে নেমে পড়াই হল অটোফিকশন। এখানে কোনও কল্পনা নেই, কল্পিত চরিত্র নেই।



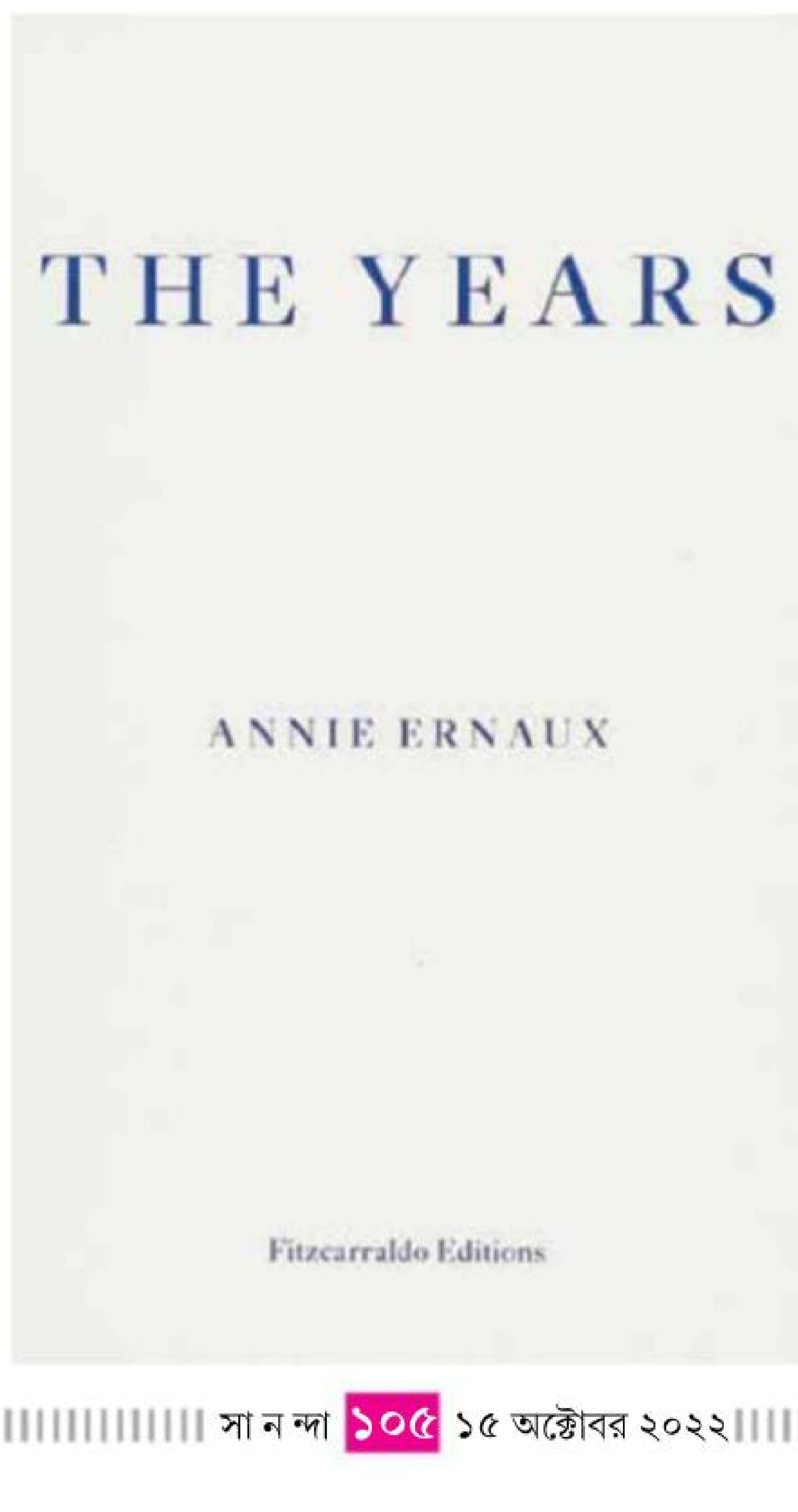
a suspension of moral judgment.' বাক্যটির ভিতরই নিহিত আছে আনি এরনোর দর্শন— নিজের লেখা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণত সরিয়ে নাও। আনো বিযুক্তি। তৈরি করো এমন এক ভাষ্য যা ভাষ্যকার-নিরপেক্ষ, যার উপস্থিতি ফিকে করে দিক গোত্র-বিভাজন, কোনটা উপন্যাস আর কোনটা স্মৃতিকথন, এই ঘেরাটোপে বন্দি করো না তোমার লিখিত ভাষ্যকে। মুক্ত করো শব্দকে। মুক্ত করো কাহিনিকে।

মুক্ত হওয়ারই এক তাগিদ ছিল আনি এরনোর, ছোট থেকে। সে মুক্তি তাঁর আশপাশের পরিবেশ থেকে। সে মুক্তি মানে যদিও ছেড়ে যাওয়া নয়, বিযুক্ত হওয়া। ফ্রান্সের মফস্‌সল অঞ্চলে তাঁর জন্ম ১৯৪০ সালে, শ্রমজীবী পরিবারে ও পাড়ায় বেড়ে ওঠা। পারির শহরের ইন্টেলেকচুয়াল আবহে নয়। তবে, অতি দ্রুতই এরনোর পড়াশোনা তাঁকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছিল তাঁর পরিবার-পারিপার্শ্ব থেকে। তিনি অক্লান্ত, নিষ্ঠ এক পাঠক, একের পর এক বই পড়েন। তাঁর স্বচ্ছন্দ পরিক্রমা চলতে থাকে আলেকজ়ান্দার দুমা, গুস্তাভ ফ্লব্যের বা আলব্যের কামুর সৃষ্টির আনাচকানাচে। এই-ই তাঁর জগৎ। বাবার কাফে বা মুদির দোকান তাঁর জগৎ নয়। কিন্তু বাস্তবকে অস্বীকার তো করা যায় না। ফল, দূরত্ব। একবার বাবার সঙ্গে এই নিয়েই প্রবল তর্কাতর্কি হয়। মেয়ে বলে, স্থানীয় সংবাদপত্র ছাড়া তুমি কখনওই কোনও বই পড়ায় আগ্রহী নও! বাবার ভর্ৎসনা-মিশ্রিত উত্তর, বইপত্র তোমার জন্যই ঠিক আছে, বাঁচতে গেলে আমার ওসবের প্রয়োজন নেই— 'আই ডোন্ট নিড দেম টু লিভ'। কথাগুলি ধাক্কা দেয়। এরনো বোঝেন কোথায় তিনি ও তাঁর বাবা আলাদা। বারো বছর বয়স থেকে বাবা উপার্জনে রত। কায়িক শ্রম দিয়ে সংসারে স্থিতি এনেছেন, আনছেন। তাঁর কাছে মেধা, মেধাবৃত্তি এক বিলাস, সাংস্কৃতিক বোঝা। তাই, তিনটি উপন্যাস লেখার পর নিজের বাবাকে কেন্দ্র করে একটি উপন্যাস লিখতে বসে এরনো মুহূর্তেই সজাগ হয়ে ওঠেন— "In order to tell the story of a life governed by necessity, I have no right to adopt an artistic approach, or attempt to produce something 'moving' or 'gripping'. I shall collate my father's words, tastes and mannerisms, the main events of his life, all the external evidence of his existence, an existence which I too shared.

No lyrical reminiscences, no triumphant displays of irony. This neutral way of writing comes to me naturally..."

ভাষা নিরাভরণ রেখে, কাহিনিকে গণ্ডিবদ্ধ না করে, পিতৃস্মৃতি ও স্মৃতির নির্যাস সম্পদ করে এরনো নির্মাণ করেছিলেন এক আখ্যান, *আ ম্যান'স প্লেস* (১৯৮৩)। প্রকাশিত হওয়া মাত্রই তা পাঠক-সমালোচকের সর্বসম্মত প্রশংসা পায়। পায় প্রি রেনাদো পুরস্কারও। এরনো গঠন করে ফেলেন তাঁর স্বতন্ত্র, স্বকীয় ধারা— অটোফিকশন। আত্মজীবনের স্থান-কাল-পাত্রের পূর্ণ উল্লেখ না রেখে, স্মৃতিকে একাধারে মাধ্যম ও অস্ত্র করে, এক শাব্দিক ও ভাষাগত সংগ্রামে নেমে পড়াই হল অটোফিকশন। এখানে কোনও কল্পনা নেই, কল্পিত চরিত্র নেই। সব বাস্তব, সকলে বাস্তবের। আবার, এই বাস্তব পেরোনো আর-এক মঞ্চও আছে, যা রক্তমাংসের ওই প্রতিটি চরিত্রকে, অভিজ্ঞাত সব ঘটনাকে এক মায়াময় বুননে সঙ্ঘবদ্ধ করছে। আমরা বুঝতে পারছি, ইনিই তো এরনোর বাবা, ইনিই তো এরনোর মা, মায়ের অ্যালজ়াইমার্স রোগের কথা লিখছেন এরনো, এই তো এরনো নিজের কথা বলছেন, নিজের সন্তর্পণ গর্ভপাতের কথা বলছেন, নিজের অবৈধ সম্পর্কের কথা বলছেন, নিজের অস্তিত্বের অসহায়তার কথা বলছেন। বুঝছি যখন এসব, সেই একই সময়ে এও বুঝছি, না, শুধু তা নয়। সত্যিই, এঁদের কথাই লিপিবদ্ধ লিখিত ও মুদ্রিত অক্ষরে, কিন্তু এরনো ততক্ষণে আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে গিয়েছেন। এগিয়ে দিয়েছেন তাঁর পাঠককে। তিনি যে এক অসামান্য স্মৃতিশিল্পী। তিনি জানেন, স্মৃতি সবসময় সঙ্গ দেয় না, 'মেমরি রেজ়িস্টস'। এরনো তাই সমস্ত স্মৃতিকে নির্লিপ্তভাবে ফেলে দেন কাগজের শ্বেতশূন্যতায়। তারপর, একটি স্মৃতিকে আর-এক স্মৃতির সামনে রাখেন। মুখোমুখি হয় অতীত। অকথিত অতীত, অচর্চিত অতীত, গোপন অতীত। একে একে স্মৃতিরা আলাপচারিতায় রত হয়, মিশে যায় এর ওর অঙ্গে। বর্তমানের সঙ্গেও। যৌনমিলনদৃশ্য দর্শনের মতো অনুভব হয়। কখনও হতবাক করা, কখনও উত্তেজনাময়। সমান্তরালে, পুনর্পাঠ তৈরি হয় এক-একটি জীবনের, এক-একটি অভিজ্ঞতার। নির্দিষ্ট কোনও একজনের থেকে তা হয়ে ওঠে সর্বজনের। এরনো সে কারণেই লিখেছেন, 'Sometimes I wonder if the purpose of my writing is to find out whether other people have done or felt the same things or, if not, for them to consider experiencing such things as normal. Maybe, I would like them to live out these emotions in turn, forgetting that they had once read about them somewhere.'

আ ম্যান'স প্লেস-এর পর সরাসরি উপন্যাস আর কখনও লেখেননি আনি এরনো। আত্মস্মৃতি, আত্মজীবনকে ধরেই জনস্মৃতি, জনজীবনকে শব্দ দিয়েছেন তিনি। এর সাক্ষ্যদান করছে *আ উওম্যান'স স্টোরি*, *আ সিম্পল প্যাশন*, *শেম*, *আই রিমেন ইন ডার্কনেস*, *হ্যাপেনিং*, *দ্য পজ়েশন*, *আ গার্ল'স স্টোরি*-র মতো রচনা।



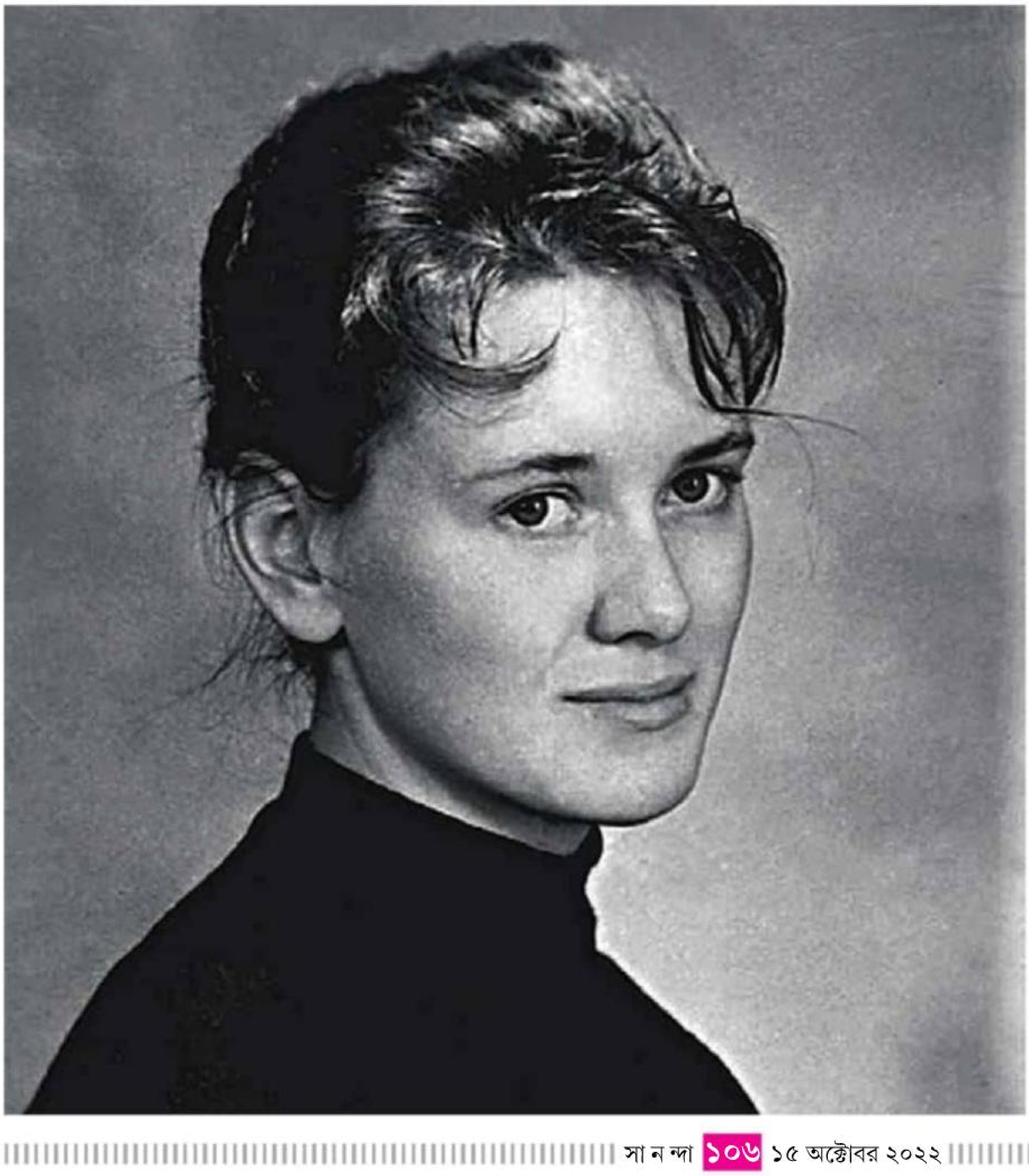
এরনোর স্মৃতিশিল্প প্রকল্প এক চূড়া স্পর্শ করল ২০০৮ সালে, প্রকাশিত হল *লেজ়ানে*। এক দশকেরও পর, ২০১৭ সালে, ইংরেজি ভাষায় *দ্য ইয়ার্স* শীর্ষনামে যা প্রকাশিত হওয়ার পর অ্যাংলোফোন বিশ্ব হঠাৎই নড়েচড়ে বসল। এমনও বই লেখা যায়! এভাবেও ইতিহাস লেখা যায়, আত্মকথা লেখা যায়?

এখানে, স্বগতোক্তির মতো, একটি কথা না বলে পারছি না। এরনোর প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা রেখেও বাঙালি হিসেবে খানিক অনুতাপ হয় বইকি, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় যে কবে থেকে এ কাজটিই করে এসেছিলেন। ধোঁয়াটে করে দিয়েছিলেন ফ্যাক্ট আর ফিকশনের সীমানা, কল্পকথন আর আত্মকথনের বিভেদরেখা। বহির্বিশ্বের কেউ একথা জানলই না! *দ্য ইয়ার্স*-এর অন্তত সাত বছর আগে *যখন সবাই ছিল গর্ভবতী*-তে লিখেছিলেন সন্দীপন— 'আত্মজীবনী লেখা আমার অনেক আগেই শেষ। আমি আত্মজীবনীই লিখেছি।...মধুময় তামরস স্মৃতিজলে ফুটে থাকাই ভাল। ছিঁড়ে আনলেই তার মৃত্যু। অর্ঘ্যকুসুম মাত্রই মৃত। আত্মজীবনী লিখতে গিয়ে তাই, সাদা-কালো তথ্যপঞ্জির এখানে ওখানে কিছু রং লাগল। যা ঘটেনি কিন্তু ঘটতে পারত, যা হয়তো সকলের অগোচরে ঘটেই ছিল— তারাও চাইল প্রবেশাধিকার। আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসই আমি লিখে এসেছি এতদিন। এই আমার প্রথম



উপন্যাসমূলক আত্মজীবনী।' মেধাবী পাঠকমাত্রই এই শব্দগুলির প্রতিধ্বনি আনি এরনোর শিল্পশরীরে অনায়াসে চিহ্নিত করে নিতে পারবেন।

নিঃসন্দেহে, *দ্য ইয়ার্স* এক আশ্চর্য গ্রন্থ। বিখ্যাত ব্রিটিশ ঔপন্যাসিক জন ব্যানভিল দ্বিধাহীন হয়ে লিখেছিলেন, '*The Years* is a revolution, not only in the art of auto-biography but in art itself.' ১৯৪১ থেকে ২০০৬, এই কালপর্বে এক ফরাসি নারীর (যা আসলে এরনো নিজেই, তৃতীয় পুরুষে) জীবনের সূত্র ধরে বিবৃত হয়েছে সমগ্র ফ্রান্সের বিংশ শতকীয় ইতিহাস। আলোকচিত্র, বই, বিজ্ঞাপন, সঙ্গীত, সংবাদ, সমাজ-সংস্কৃতির ধরনধারণ, ভাষা— এমন সকল অনুষঙ্গে ইমেজের পর ইমেজ রচনা করে এরনো সৃষ্টি করেছেন এক অভাবিত ক্যালাইডোস্কোপ, মানুষ ও স্মৃতিচিত্রের এক বহুরূপদর্শনের প্রান্তর। একক থেকে গোষ্ঠীর সমবেত স্বকথন। আমি আর আমরা এক হয়ে গিয়েছে। রচিত হয়েছে এক পাবলিক ডায়েরি।



প্রত্যাশিতভাবেই এ গ্রন্থ এরনোকে বৃহত্তর পাঠকবৃত্তে তাঁর যথাযোগ্য খ্যাতি এনে দেয়। স্বদেশের বাইরেও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় তাঁর জনপ্রিয়তা। তাঁর প্রায় সমস্ত রচনাই নতুন করে প্রকাশিত হতে থাকে, অনূদিত হতে থাকে। ইন্টারন্যাশনাল বুকার পুরস্কারে (২০১৯) শর্টলিস্টেড হয় *দ্য ইয়ার্স*। আর প্রায় তখন থেকেই এরনোর নাম বারবার উঠে আসছিল সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারের সম্ভাব্য একজন প্রাপক হিসেবেও। অবশেষে, ২০২২ সালের সাহিত্যে নোবেল পেলেন আনি এরনো। আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির সিলমোহর পড়ল তাঁর স্মৃতিশিল্পে, তাঁর সাহসী স্মৃতিশিকড় খননে। এরনো একটি পথ দেখিয়েছেন, কেবলই স্মৃতিতাড়িত না হয়ে স্মৃতিকে সম্মান জানানোর পথ। স্মৃতি ছাড়া মানুষ ও তার জীবন যে অকেজো, তাঁর লেখা প্রমাণ করতে চেয়েছে এ সত্যই। প্রমাণ করতে চেয়েছে, স্মৃতি খনিজ সম্পদের মতোই মূল্যবান এবং হ্রাসমানও, তাই তাকে চর্যায়-মজ্জায়, লেখায়-রেখায় ধরে রাখতেই হবে 'To save something from the time where we will never be again.'

**ছবি:** ইন্টারনেট



সম্প্রতি মেক-আপে আবার ফিরে এসেছে গ্লসের চল। স্থায়িত্ব কম হলেও, গ্লসের ফিনিশ যে কোনও সাজকে এক নিমেষে আপলিফ্ট করবে! হালকা সাজের জন্য বেস্ট।





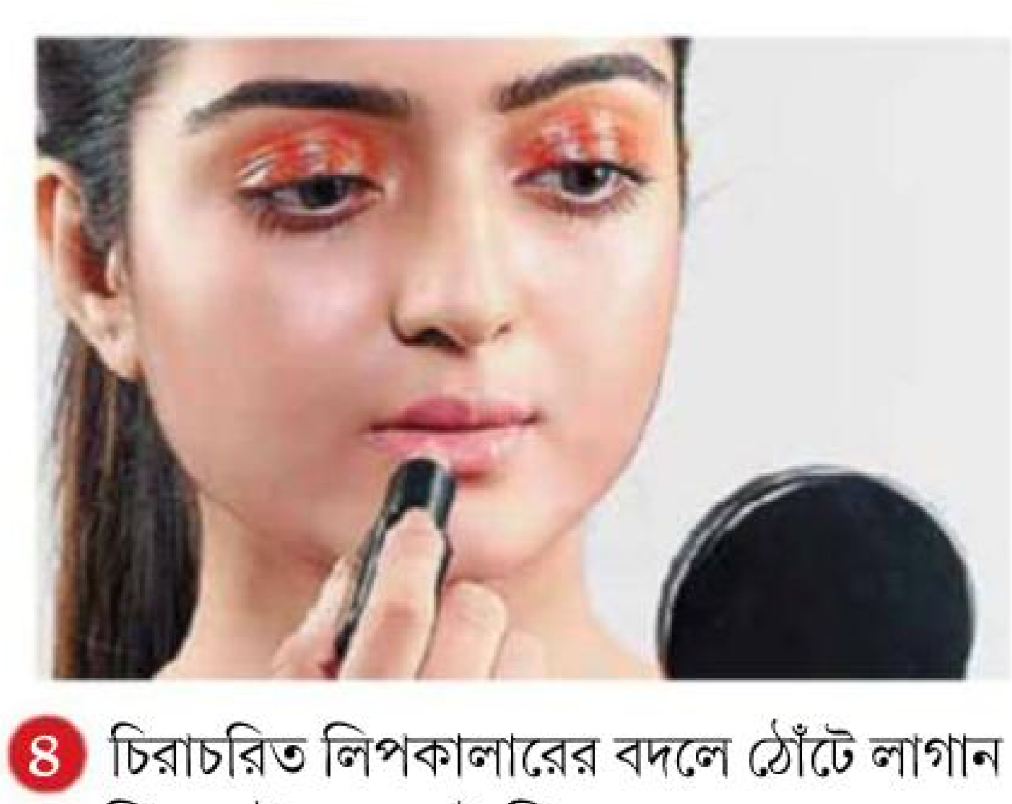
১ আইলিড কোনও নিউট্রাল রঙের শিমার দিয়ে ভরে নিন। ক্রিজ় ফাঁকা রাখুন।



২ লোয়ার ল্যাশলাইনের ভিতরের অংশেও অল্প শিমার শ্যাডো লাগান।



৩ কাজল পরতে পারেন। অথবা ব্রাউন শ্যাডো স্মাজ করে মাসকারা লাগান।

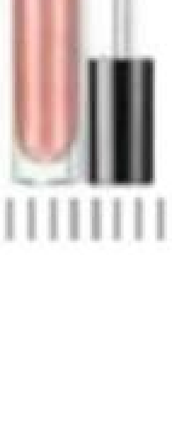


৪ চিরাচরিত লিপকালারের বদলে ঠোঁটে লাগান রঙিন বা ট্রান্সপেরেন্ট লিপগ্লস।

# মিনিম্যালি গর্জাস

উৎসবের মরসুম শেষ হতে এখনও অনেকটা সময় বাকি। আর তাই সাজগোজের অবকাশও প্রচুর। তবে সব সময় জমকালো সাজ পছন্দ না হলে? সেসব দিনের জন্য রইল সিম্পল সাজ-সাজেশন।

দুর্গাপুজো শেষ। কিন্তু তাতে কী! কালীপুজো, ভাইফোঁটা, জগদ্ধাত্রীপুজো... উৎসবের তো আর শেষ নেই। বাড়িতে অনুষ্ঠান থাকলে সাজগোজ করতে সকলেই পছন্দ করেন। কিন্তু সব অনুষ্ঠানেই যে জমকালো সাজ মানানসই হবে, তা নয়। তা ছাড়া সকলে চড়া মেক-আপ, উজ্জ্বল রং পছন্দও করেন না। দিনের বেলা হোক বা রাতের অনুষ্ঠান, অনেকেই চান খুব সাধারণ মেক-আপে প্রেজ়েন্টেবল হয়ে উঠতে। কাজটা এমনিই অনেকটা সহজ হয়ে যায়, যদি পোশাকে উজ্জ্বল রং বা সিকুইন, এম্বেলিশমেন্টের ব্যবহার থাকে। খুব হালকা মেক-আপ করলেও এ ধরনের পোশাকে গ্ল্যামারাস দেখায়। এথনিক পোশাকের ক্ষেত্রে জমকালো কোনও ব্লাউজ় বা সালোয়ারের ক্ষেত্রে সুন্দর কোনও দোপাট্টা বেছে নিন। বেস মেক-আপ মিনিম্যাল রাখুন। সঙ্গে কয়েকটা ছোট্ট টিপস ট্রাই করে দেখুন। যে কোনও সময়ই গর্জাস হয়ে উঠতে পারবেন।





শ্রী অম্রুতেশ্বর শিবমন্দির

# এক জনপদ, হরেক রং

কখনও রোদ্দুরের ওম, কখনও পাহাড়ি বাঁক, কখনও আবার নীল জলের আরাম। ভন্ডারদরায় প্রকৃতির নানা রঙে মুগ্ধ হলেন মধুছন্দা মিত্র ঘোষ।



যেন প্রকৃতির অনাবিল হাসি দিয়ে সাজানো সহ্যাদ্রি পাহাড়মুলুকের অনন্ত বৈভব। দূর্বাদলশ্যাম সবুজে ঠাসা ছবির মতো চালচিত্র। সফরগুলো শুধু সবুজ মেখে নেয়। পারিবারিক কর্মসূত্রে মহারাষ্ট্রের মুম্বইয়ে প্রবাসযাপন তখন। প্রকৃতির মায়াবী হাতছানিতে দিনচারেকের ছুটি কাটাতে চলেছি মুম্বই থেকে প্রায় ১৬৮ কিলোমিটার দূরত্বে, মরাঠা রাজ্যের আকোলে তালুকের সেন্ধি গ্রামের অন্তর্গত এক নব্য পর্যটনস্থল, ভন্ডারদরায়। আকাশে আলো ফুটতে তখনও ঢের দেরি। ঘুম ভেঙে তখনও জাগেনি মুম্বই মহানগরী। মুসাফির চোখে সব কিছুই বদলে যাচ্ছে, রোদ্দুরের রং বা দিগন্তের সবুজ। মৌনতা আছড়ে পড়ছে চরাচরে। ঠাণে পেরিয়ে জাতীয় সড়ক ৩ ধরে পদঘা, ভেসিন্দ, আসনগাঁও, খারাদি, কামারা নামের নিরিবিলি ছোট-মাঝারি জনপদ পেরিয়ে এলাম ইগৎপুরি। এখান থেকেই শুরু হয়ে গেল মহারাষ্ট্রের ঘাট রোড বা পাহাড়ি পথ। মরাঠি ভাষায় 'ঘাট' মানে পাহাড়। অদ্ভুত চলনের পাহাড়ি বাঁক। প্রসঙ্গত জানাই, ব্রিটিশশক্তি যখন কায়েম ছিল এদেশে, তদানীন্তন ব্রিটিশ আধিকারিকদের এই অঞ্চলে রেলপথ নির্মাণে প্রযুক্তিগত কিছু বাধাবিপত্তির মোকাবিলা করতে হয়েছিল। তাই সেই সময় ব্রিটিশরা ইগৎপুরি অঞ্চলটিকে বলতেন 'ল্যান্ড অফ ডিফিকাল্টিজ়'। সাধারণের বিশ্বাস, যাত্রাপথের দুর্ঘটনা এড়াতে কাছেই জাগ্রত 'ঘাটনদেবী' মন্দিরে পুজো দেওয়া রীতি। মন্দিরের পশ্চাদপটে ত্রিমক, দুর্ভর উৎভাত, হরিহর নামে সহ্যাদ্রির কয়েকটি শৃঙ্গ রয়েছে। একই ফ্রেমে পাহাড়-ভাটসা নদী-অববাহিকা-সবুজের বর্ণময়তা নিয়ে টুকরো মায়া বিছানো পথ।

ভন্ডারদারার চোখের পাতায় এখনও যেন ঘুমের আদর লেপটে রয়েছে। পাহাড়ের গা বেয়ে যত উপরে উঠি, পাহাড়ের রং আরও সবুজ হয়ে ওঠে নিজে নিজেই। মনে হয়, এই পথ, এই আকাশ এখন আমার, পাহাড়ি দিগন্তটুকুও আমার। ইগৎপুরি থেকে ঘোটি মোড় ৮ কিলোমিটার। মুল সড়ক এন.এইচ.৩ চলে গেল নাসিক। আমরা এবার রাজ্যসড়ক ৪৪ পথে আরও ৩২ কিলোমিটার উজিয়ে ভন্ডারদরায় 'মহারাষ্ট্র পর্যটন উন্নয়ন পর্ষদ'এর হলিডে রিসর্ট। পাহাড়ের প্রেক্ষাপটে নীল আর্থার লেককে নিজের নাগালে রেখে ছড়ানো আস্তানা। ১৯০৩ সালে ব্রিটিশ জমানায় মুখ্য প্রযুক্তিবিদ আর্থার হিল সাহেবের তত্ত্বাবধানে এখানে হাইড্রো ইলেকট্রিক প্রজেক্ট, ফেজ ওয়ান তৈরি হয়। সেই সময়ের বম্বে রেসিডেন্সির এই অভূতপূর্ব



প্রভারা নদী

মন্দিরের পশ্চাদপটে ত্রিমক, দুর্ভর উৎভাত, হরিহর নামে সহ্যাদ্রির কয়েকটি শৃঙ্গ রয়েছে। একই ফ্রেমে পাহাড়-ভাটসা নদী-অববাহিকা-সবুজের বর্ণময়তা নিয়ে টুকরো মায়া বিছানো পথ। ভন্ডারদারার চোখের পাতায় এখনও যেন ঘুমের আদর লেপটে রয়েছে। পাহাড়ের গা বেয়ে যত উপরে উঠি, পাহাড়ের রং আরও সবুজ হয়ে ওঠে নিজে নিজেই।

সাফল্যের পর আর্থার হিল সাহেবের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ভন্ডারদরা হ্রদটির নাম হয় 'আর্থার লেক'। সেই আমলেই ১২ মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ সরবরাহ হত সমস্ত এলাকায়। মৃদু হাওয়ায় তিরতির দুলছে বাগিচার গাছের পাতা, ফুলের ঝাড়, হ্রদের বুকে ছোট ছোট তরঙ্গমালা। হ্রদের জলে কখনও মেঘের ছায়া, কখনও রোদ্দুরের ঝলমল বিচ্ছুরণ। রিসর্টের

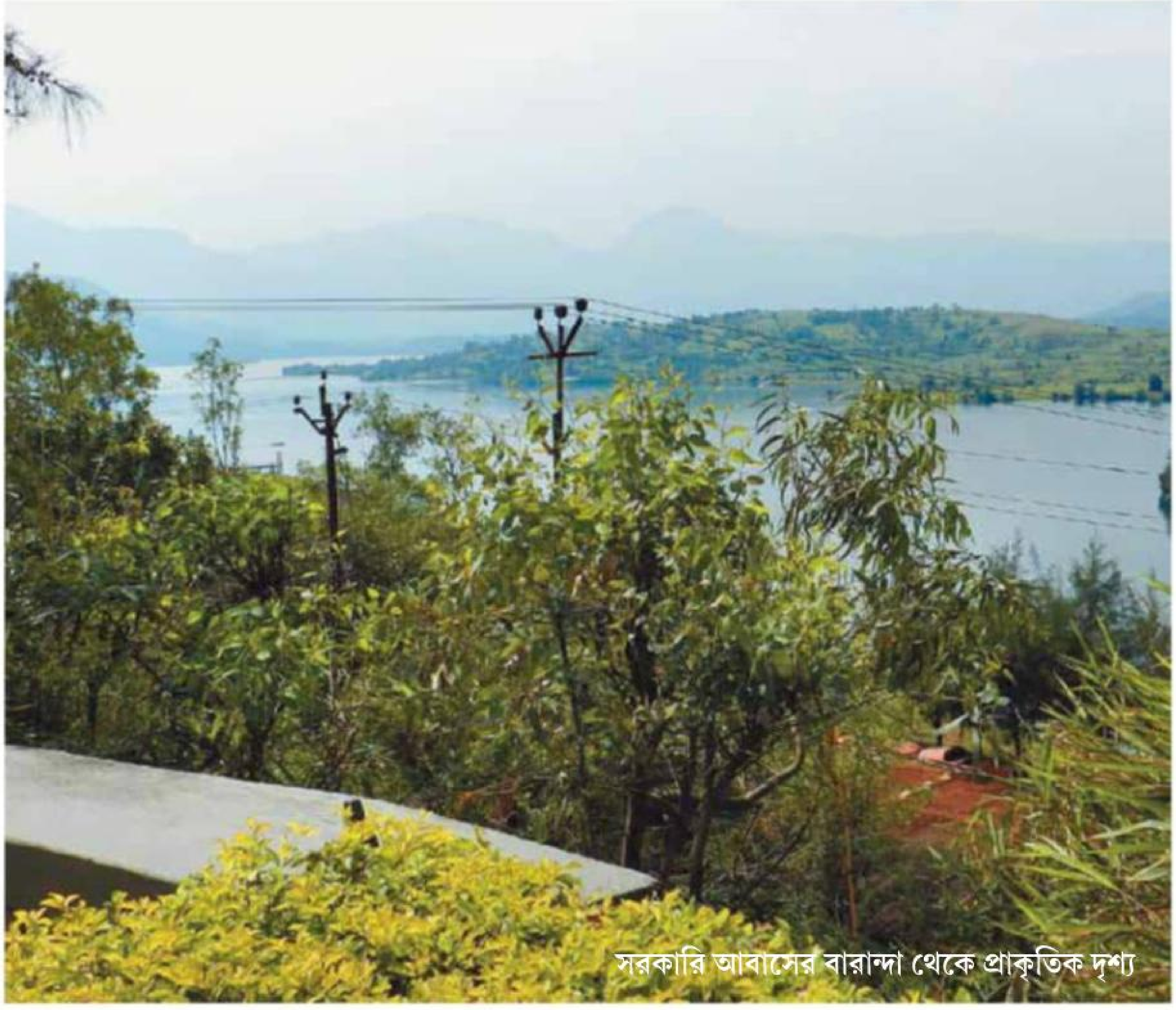


আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া-র খননকার্যে পাওয়া মূর্তি ও শিলালিপি

রেস্তরাঁয় ধোঁয়া ওঠা ক্যাপুচিনো ও মিসল পাও, পোহা সহযোগে প্রাতরাশ ও ভোরযাত্রার ক্লান্তি ধুয়ে নেওয়া। লুকোচুরি খেলতে ডাকছে আর্থার লেক। জলছবির মতো নীল ও আশ্বাসভরা হ্রদ ছিনিয়ে নিচ্ছে দৃষ্টিসুখ।
পাহাড়ের নিজস্ব কিছু ভাষা থাকে। স্তব্ধ ও নীরব। নিসর্গ ঘেঁষে সবুজ প্রলেপ, পাহাড়ি উদাসীনতা, অলীক আভিজাত্যে হ্রদের মায়াময় মেজাজ নিয়ে ভন্ডারদরা। শৈলশহরটিকে উপভোগ করতে হলে এক-আধদিন থাকতে হবে। প্রখর বাদলদিনে, মহারাষ্ট্রের প্রভারা নদীর জলপুষ্ট উইলসন জলাধার যখন একটু একটু করে জল ছাড়তে থাকে, সে দৃশ্য ক্যামেরার লেন্সে ধরে রাখার মতোই। প্রভারা গোদাবরীর অন্যতম উপনদী। ভরা বর্ষায় ভন্ডারদরার অন্য রূপ। মেঘের চাঁদোয়ায় ঢাকা থাকে সহ্যাদ্রি পাহাড়কোলে নদী-প্রপাত-হ্রদ ঘেরা তামাম ভন্ডারদরা। রিসর্ট ছাড়িয়ে পথটা খানিক উৎরাই বেয়ে পৌঁছে দিল প্রভারা নদীর মদতপুষ্ট জলাধারটির কাছে। ৪৯২.১২ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত ভারতের প্রাচীনতম জলাধারটি হল ভারতের দীর্ঘতম প্রাকৃতিক জলাধার। বহুবর্ষজীবী পাহাড়ি প্রপাত, প্রভারা নদী ও বৃষ্টিজলপুষ্ট, হাই অল্টিটিউডে অবস্থিত সম্পূর্ণ পাথরে তৈরি বাঁধ। স্যার লেসলি ওর্মে উইলসন নামের ব্রিটিশ প্রযুক্তিবিদের তত্ত্বাবধানে ১৯১০ সালে নির্মাণকার্য শুরু হয়ে শেষ হয় ১৯২৬ সালে। ভিত্তিপ্রস্থ ফলকের লেখা পড়ে জানা যায়, তদানীন্তন বম্বের গর্ভনর ১৯২৬ সালের ১০ ডিসেম্বর জলাধারটির উদ্বোধন করেন এবং উইলসন সাহেবের কৃতিত্বের স্মারক হিসাবে জলাধারটির নামকরণ করেন 'উইলসন ড্যাম'। জলাধারের নীচে সুদৃশ্য বাগিচা রয়েছে। ওপাশে চূর্ণ মায়ায় সাজানো উপত্যকাসহ দূর পাহাড়ের দৃশ্যাবলী। লোহার বেঞ্চে দু'দণ্ড বসে ছায়ায় মায়ায় ভুলিয়ে রাখা স্তব্ধতার দিকে হারিয়ে যাওয়া। মহানগরের রূঢ় বাস্তব থেকে তখন অনেক দূরে আমাকে এনে ফেলে এই অসামান্য আনন্দক্ষণ। বিকেল গাঢ় হতেই ফিরতিপথে। সন্ধ্যা হতেই আলসেমি করে ঘরে থাকা ছাড়া কিছুই করার থাকে না। হ্রদের জলে ঝুপ্পুস অন্ধকার। বাগিচার লনে বাহারি আলোর মৃদু রোশনাই। কিচ্ছুটি করার নেই এখন। মোবাইলের টাওয়ার এই রয়েছে তো এই নেই। ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ করারও জো নেই।
উইলসন ড্যাম পেরিয়ে আবারও কিছুটা এগিয়ে ডানহাতি পথটি চলে গেছে গ্রামের মধ্য দিয়ে। নিঝুম গ্রাম। ছোট ছোট বসতি, ধানখেত। পাথুরে জমি কেটে ছোট সেচখাল। এখানে এসে থেকেই লক্ষ করেছি, ভন্ডারদরা ও তার আশপাশের জনপদগুলির প্রতিটি পুরুষ-নারীরই নিজস্ব মরাঠি পরিচ্ছদ পরনে। পুরুষদের সাদা শার্ট, মাথায় অবশ্যম্ভাবী সাদা মরাঠি টুপি, সঙ্গে সাদা পাজামা, প্যান্ট বা ধুতি। এটাই এখানকার ঐতিহ্য। স্থানীয় মরাঠি মহিলাদের পরনে কোঁচা মেরে নিজস্ব কায়দায় রঙিন ফুলছাপ শাড়ি, আঁচল ঘুরিয়ে কোমরে বাঁধা। আধুনিকতার রেশ এইসব অঞ্চলে কিছুটা ছুঁয়ে গেলেও, নিজস্ব পোশাক, আদবকায়দা, রীতি, কৃষ্টিকে এখনও যথেষ্ট আবেগে সযত্নে আগলে রেখেছেন। এদিককার নব্য প্রজন্মের মধ্যে বিশ্বায়নের হুজুগ থাকলেও মাতামাতি নেই।
পর্যটকরা আহ্লাদ করে ডাকেন, 'মহারাষ্ট্রের নায়াগ্রা'। সবিশেষ এই নাম বিশেষণটি অমূলক নয় মোটেই। নিসর্গ আবিলতায় জলরঙের প্রলেপেই গচ্ছিত রয়ে যায় কিছুটা অবসর, বিনোদন ও নতুন জায়গায় বেড়ানোর খুশি। উইলসন ড্যাম থেকে ১০ কিলোমিটার দূরেই আমাদের জন্য দারুণ সেই চমক। রাজ কপূরের 'রাম তেরি গঙ্গা ময়লি' ফিল্মে

নায়িকার বিখ্যাত সেই স্নানদৃশ্য মনে আছে? এখানেই তার শুটিং হয়েছিল। এ ছাড়া আরও কিছু বলিউড কাহিনিচিত্রের শুটিংও এখানেই হয়েছে। সহ্যাদ্রি গিরিখাতের মধ্য দিয়ে প্রভারা নদীর জলধারা ১৭০ ফুট উঁচু থেকে উদ্দাম জলোচ্ছ্বাস ছড়িয়ে চূড়ান্ত বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ছে নীচে। প্রপাতটির নাম রন্ধা ফলস্। ফেন্সিং দেওয়া সুন্দর একটি চলার পথ রয়েছে। মহারাষ্ট্র সরকারপক্ষ থেকে কড়া নজরদারিও রয়েছে, কোনমতেই যাতে অত্যুৎসাহী পর্যটক এক্কেবারে কাছে না গিয়েও রন্ধা প্রপাতের সুন্দরতা ও বিশালতা উপভোগ করতে পারেন। রন্ধা প্রপাতের জলশরীরে খামখেয়ালি রোদ্দুরের সোহাগ পেলেই রচিত হয় সাতরঙা ইন্দ্রধনু ছটা। লাজুক জলরঙে লাবণ্য খোলে, রং খোলে।

ইতিমধ্যে পেরিয়ে এলাম আমব্রেলা ফলস্। ছাতাসদৃশ্য গোলাকৃতি মসৃণ সুউচ্চ পাহাড়প্রাচীর থেকে উত্তাল জলধারা প্রবল উচ্ছ্বাসে জড়ো হচ্ছে নীচে। অদ্ভুত মনকেমন করা জলধ্বনি ভেসে আসছে কর্ণকুহরে। আমরাও সেই জলজ মজলিসের পানে বুঁদ হয়ে শুনে যাই অসম্ভব সেই প্রপাতগান। সফেদ ফেনায়িত সে জলের রঙে গাছের ছায়া পড়ে হয়ে উঠেছে ধূসর। অমন হাটখোলা কৃত্রিম প্রপাতচত্বর আর প্রকৃতি পেলে আকাশ, মেঘ, গাছের ঝিরিঝিরি পাতারা বিলি কাটবেই। মহারাষ্ট্র পর্যটনাবাস থেকে ২৪ কিলোমিটার দূরেই ১২-১৩ শতকে শীলাহরা রাজবংশের রাজা ঝঞ্জ নির্মিত স্বয়ম্ভু অম্রুতেশ্বর শিবমন্দির। কালো পাথরের ২০০ ফুট / ১১৮ ফুট মন্দিরগাত্রের স্থাপত্য অসাধারণ। আসলে এই অঞ্চলে এই ধরনের কালো পাথরের প্রাচুর্য রয়েছে। পশ্চিমমুখী মন্দিরটি একটি ক্ষুদ্র প্রাচীরে ঘেরা, 'হেমাদপন্তি শৈলি'তে নির্মিত। মন্দিরে রয়েছে মণ্ডপ, অন্তরাল ও গর্ভগৃহ। ছোট্ট মন্দিরটির যাত্রাপথে পুজোর ডালি, ফুলের মালা, নারকেল, সদ্য তুলে আনা


সরকারি আবাসের বারান্দা থেকে প্রাকৃতিক দৃশ্য


উইলসন ড্যাম

অদ্ভুত মনকেমন করা জলধ্বনি ভেসে আসছে কর্ণকুহরে। সফেদ ফেনায়িত সে জলের রঙে গাছের ছায়া পড়ে হয়ে উঠেছে ধূসর। অমন হাটখোলা কৃত্রিম প্রপাতচত্বর আর প্রকৃতি পেলে আকাশ, মেঘ, গাছের ঝিরিঝিরি পাতারা বিলি কাটবেই।

শালুকফুল সাজিয়ে স্থানীয় বালিকা ও মহিলারা বিক্রির অপেক্ষায়। গর্ভগৃহে স্বয়ম্ভু শিবলিঙ্গ। নন্দী রয়েছে পশ্চিমদিকে মুখ করে। মন্দিরের ভিতর কুলুঙ্গিতে গণেশ ও বিষ্ণুর অবয়ব। মন্দির চত্বর লাগোয়া জলাশয়। পরিযায়ী পাখিরা প্রজননের সময় এই জলাশয়ে ভিড় করে। ব্ল্যাক আইবিস, হেরন, ইগ্রেট, জলমোরগ, সাদা গলা স্টর্ক ইত্যাদি। প্রবেশপথের ধারে, শতাব্দীপ্রাচীন এক অশ্বত্থ গাছের নীচে ঠেস দিয়ে রাখা বেশ কিছু প্রাচীন মূর্তি ও পাথরে খোদিত শিলালিপি। আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া এগুলো মাটি খুঁড়ে আবিষ্কার করে। খননকার্যে পাওয়া পাথরের সোপানবেষ্টিত ছোট্ট এক পুষ্করিণী রয়েছে। পুষ্করিণীর জলে কিলবিল করছে প্রচুর মাছ। অনতিদূরেই লালরঙা পরিমণ্ডলে অগস্ত্যমুনির আশ্রম। সাদা মন্দির। লোককথা শোনায়, পুলস্ত্য ও উর্বশীর পুত্র অগস্ত্য নাকি জল ও বাতাস সেবন করেই টানা এক বছর এখানে কঠোর সাধনা করেছিলেন। সেই সাধনায় তুষ্ট হয়ে দেবতাকুল তাঁকে গঙ্গাজল সিঞ্চন করেন। যেটি আদপে প্রভারা নদী নামে পরিচিত। শ্রীরামচরিতমানসে উল্লেখ রয়েছে, বনবাসকালে রামচন্দ্র-সীতা-লক্ষ্মণ এই আশ্রমে



আর্থার লেক

এসেছিলেন এবং রাবণবধের অস্ত্রাদি অগস্ত্যমুনি এই স্থানেই রামকে দান করেন।
সহ্যাদ্রি পর্বতমালার অন্তর্গত মহারাষ্ট্রের উচ্চতম শিখর 'কালসুবাই', ৫৫৫০ ফুট। মরাঠিরা বলেন 'মহারাষ্ট্রের এভারেস্ট'। ট্রেকারপ্রেমীদের অসম্ভব পছন্দের ঠিকানা কালসুবাই শৃঙ্গ। সেখানে বিরাজ করছেন মাতা কালসুবাই। স্থানীয় কোলি সম্প্রদায়ের গৃহদেবতা দেবী কালসু। উৎসবের দিনে স্থানীয়রা চলে আসেন দেবীমন্দিরে পুজো দিতে। এখানে এক কল্পকাহিনি প্রচলিত, কালসু নামের এক বালিকা এখানকার বনেবাদাড়ে ঘুরে বেড়াত। একদিন কাজের সন্ধানে পাহাড়তলির এক গৃহস্থবাড়িতে আসে। এক পরিবারে কাজে বহাল হলেও, মনিবের দ্বারা তিরস্কৃত বালিকা ছুটে পাহাড়চূড়ায় পালিয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে সে সেখানেই থেকে যায়। তিনিই কালসুবাই মাতা।
ভন্ডারদরা থেকে হরিশচন্দ্রগড় স্যাংচুয়ারি প্রায় ৪৫ কিলোমিটার দূরে। বন্যপ্রাণের ছবি তুলতে যাঁরা পছন্দ করেন, তাঁদের ভারী পছন্দের জায়গা। এখানে বিভিন্ন প্রজাতির সরীসৃপ, নানা জলজ ও স্থলজ পাখপাখালি, যেমন পানকৌড়ি, গোবক, জলমোরগ, হেরন, ছোট ও বড় বক, মাছরাঙা, বারবেট, আইবিস, সাদা গলা স্টর্ক ইত্যাদি। এছাড়া নানান স্তন্যপায়ী প্রাণী, যেমন হায়না, নেকড়ে, লেপার্ড, বেজি, গন্ধগোকুল, বন্য শুয়োর, বার্কিং ডিয়ার, খেঁকশিয়াল, সজারু, কচ্ছপ, বনবিড়াল, এইসব প্রাণীর দেখা মেলে।
প্রকৃতির গহন কোলে ঠেস দিয়ে হ্রদের বিছিয়ে থাকা, কখনও সুউচ্চ পাহাড়টিলার প্রাচীর, কখনও আদিগন্ত হরিয়ালি উপত্যকা— নানা দৃশ্যের কোলাজ। অর্ধশতাব্দী পর্যন্ত নিজ়াম ও মুঘলদের দখলে ছিল ভন্ডারদরা। মরাঠা বীর শিবাজি রাজে ভোঁসলে ১৬৫৭ ও ১৬৬৫ সালে দু'বার আহমেদনগর আক্রমণ করেছিলেন। ভৌগোলিক অবস্থানগত প্রাকৃতিক সুবিধা, তথা সহ্যাদ্রি পর্বতমালাঘেরা প্রাচীরকে কাজে লাগিয়ে এখানে শাসকদল নিশ্চিন্তে রাজ্যপাট চালাতে পারতেন। ইতিহাস বলে, শিবাজির সেনাবাহিনী কালসুবাই শিখর থেকেই শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে সজাগ পর্যবেক্ষণের কাজ সামলাত। ১৮১৭ সালে ব্রিটিশ রাজশক্তি ভন্ডারদরা পাহাড়গ্রামটি যে জেলার অন্তর্গত, সেই আহমেদনগর নিজ আয়ত্বে নিয়ে নেয়। সেই সময় এই এলাকার জনগণ স্বতন্ত্রতা সংগ্রামে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন।
ভন্ডারদরার ছোট্ট চৌকাঠ জুড়ে রূপকথারা নিয়মমাফিক। এইসব পাহাড়ি অঞ্চলে বিকেলের পরই অন্ধকার। নিভু আলোয় গেলাম ভন্ডারদরার সুবিখ্যাত 'ফায়ারফ্লাই' এলাকাটি দেখতে। বর্ষা নামার ঠিক আগেই, মধ্য মে থেকে জুন মাস কাছেপিঠের উৎসাহী পর্যটকদের সপ্তাহান্তিক ঠেক হয়ে ওঠে অফবিট ভন্ডারদরা। লাখ লাখ জোনাকি ও কাচপোকাদের দীপ্তিপ্রভায় ঝিলমিল করে, ম্যাজিক সৃষ্টি হয় রাতে, তবে বর্ষায় এদের একেবারেই দেখা যায় না। আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে জোনাকিদের লার্ভা শীতে মাটির তলায় থাকে, বসন্তে পরিণত হয়ে গ্রীষ্মেই প্রকট হয়। ভন্ডারদরায় 'কাজয়া মহোৎসব' বা 'জুগনু উৎসব' দেখতে দূর দূর শহরতলি থেকে মানুষরা ভিড় জমান। প্রায় ২,৪২৭ ফুট উচ্চতায় এই পাহাড়স্থলি, এখন দিনের চেয়ে যেন আঁধারে অনেক বেশি মায়াবী। ভ্রমণের সমস্ত মুহূর্তই তখন মায়াপ্রপঞ্চ বলে ভ্রম হয়। যখনই নিষ্কলুষ প্রকৃতির সামনে এসে দাঁড়াই, দৃশ্যরাও কাছে এগিয়ে আসে। পাহাড়ের স্তব্ধতা এবং প্রশান্তি দুই-ই সেখানে মজুত।

**ছবি:** লেখক

## কীভাবে যাবেন

কলকাতা থেকে রেলপথে বা বিমানপথে মুম্বই। সেখান থেকে গাড়ি ভাড়া করে ১৬৫.৫ কিলোমিটার দূরত্বে ভন্ডারদরা। সময় লাগে কম-বেশি ঘণ্টাচারেক। কাছাকাছি রেলস্টেশন ইগৎপুরি, ভন্ডারদরা থেকে মাত্র ৩৫ কিলোমিটার।

## কোথায় থাকবেন

এম.টি.ডি.সি. হলিডে রিসর্ট ছাড়াও বেশ কিছু রিট্রিট, রিসর্ট, ন্যাচারাল ক্যাম্পিং ইত্যাদি রয়েছে। অনলাইনে অগ্রিম বুকিং করে যাওয়া শ্রেয়।

## কোথায় থাকবেন

ভন্ডারদরাকে মহারাষ্ট্রের অফবিট সপ্তাহান্তিক গেটওয়ে বলা চলে। বর্ষা ও শীতের সময় আদর্শ। অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারি সেরা সময় হলেও, মার্চ থেকে জুন জোনাকিদের ম্যাজিক রিয়্যালিজ়ম দেখতেও পর্যটক ভিড় জমান এখানে।

কেনাকাটা

ব্ল্যাকবেরির টেকপ্রো কালেকশনে রয়েছে ট্রাউজ়ার থেকে আরম্ভ করে ফর্মাল সুট, জ্যাকেট, ওয়েস্টকোট অথবা ক্যাজুয়াল খাকি থেকে পোলো টি শার্ট। ভাইব্র্যান্ট, সাট্‌ল বা ম্যাট ফিনিশ সমস্ত কালার শেডেই থাকছে আকর্ষণীয় এই সম্ভার। একাধিক শপিং মলে পাওয়া যাচ্ছে এই পোশাক।






দেখুন বাছুন কিনুন

এই দীপাবলির মরশুমে আপনার জন্য অপেক্ষা করছে নিত্য নতুন জিনিসের সম্ভার। এক ঝলকে দেখে নিন ড্রেস, লেগিন্স ও স্কিন কেয়ারের হদিশ...

আসন্ন শীতের মরশুমে নিভিয়া নিয়ে এল নানাধরনের স্কিন কেয়ার প্রোডাক্ট। মিল্ক ডিলাইট ফেসওয়াশ, নিভিয়া পার্ল অ্যান্ড বিউটি ডিও রোল অন, নিভিয়া নার্সিং বডি মিল্ক, নিভিয়া সফট সেন্ট ময়শ্চারাইজ়িং ক্রিম, শাওয়ার জেল ইত্যাদি। মূল্য মাত্র ১০৫ টাকা থেকে ২৯৯ টাকার মধ্যে।



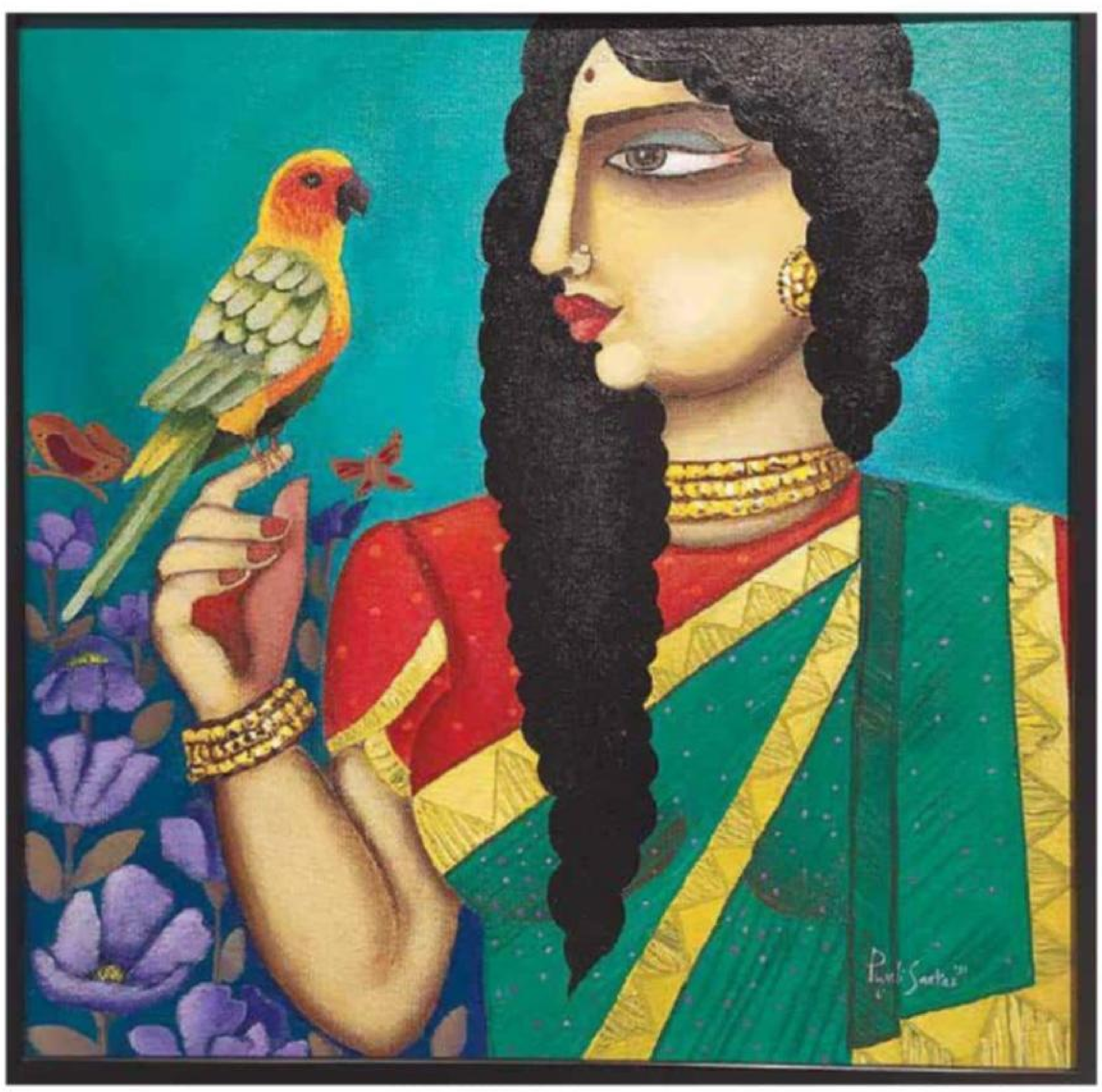

দীপাবলি উপলক্ষে ডলার মিসি আনল লেগিংসের বিপুল সমাহার। আরামদায়ক এই লেগিঙ্গের সঙ্গে ইস্টার্ন বা ওয়েস্টার্ন যে কোনও আউটফিট আপনার পুজো-লুককে দেবে এক স্টাইল স্টেটমেন্ট। ১০০% কটনের এই লেগিন্সগুলির মূল্য ২৪৯ টাকা থেকে ১১৯৯ টাকা।

---

রিভিউ

## চিত্রকলা

শারদীয়ার আবহে, অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে হয়ে গেল তিনদিনব্যাপী আর্ট এগজ়িবিশন 'ওল্ড ক্লাসিক ইন্ডিয়া'। প্রথমদিনে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট অভিনেতা চিরঞ্জিত। বিশ শতকের বোহেমিয়ান ভারতীয় সংস্কৃতি, উৎসব-পার্বণ ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রা এই প্রদর্শনীর বিষয়বস্তু। চিত্রশিল্পী পিয়ালী সরকারের হাতে রঙের ব্যবহারে ফুটে উঠেছে সেই সময়ের জমিদারি প্রথা, বাবু কালচার ও সাধারণ মানুষের প্রতিদিনের কাজ, পোশাকের ধরন ও গয়নার ব্যবহার। বাঙালি বিবাহ থেকে শুরু করে দক্ষিণ ভারতীয় ট্র্যাডিশন সবকিছুই দেখা গিয়েছে প্রদর্শনীতে। নিজে চিত্রশিল্পচর্চার পাশাপাশি অনলাইন মাধ্যমে শিক্ষাদান করেন। শিল্পীর প্রথম একক চিত্র প্রদর্শনী হিসাবে তাঁর এই উদ্যোগ বিভিন্ন মহলে যথেষ্ট প্রশংসিত হয়েছে।





# সেপারেশন অ্যাংজ়াইটি

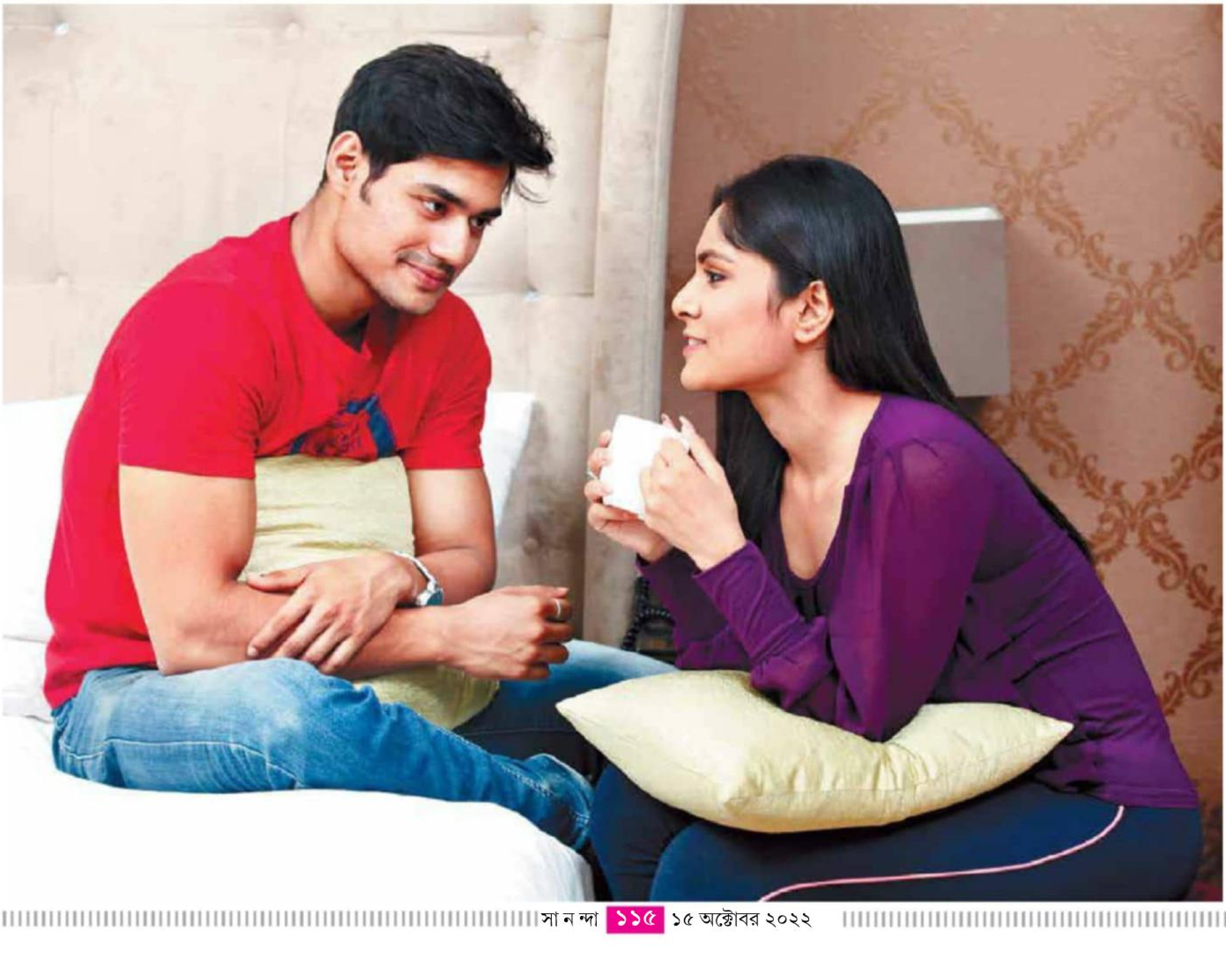
বাবা-মাকে ছেড়ে থাকার ভয়, ডিভোর্সের পরে সন্তানকে কাছে না পাওয়ার উৎকণ্ঠা, দাম্পত্যে লং ডিসট্যান্স সম্পর্কে টেনশন...প্রিয়জনদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আতঙ্ক দূর করা জরুরি। লিখছেন মধুরিমা সিংহ রায়।

সন্তানকে একা স্কুলে পাঠানোর সময় বুকে একরাশ ভয়? কাছের মানুষ শহর ছেড়ে অন্য শহরে চলে যাওয়ার আগে চিন্তিত হয়ে পড়েন? বয়স্ক বাবা-মাকে একা রেখে এলে টেনশন হয়? বা ডিভোর্সের পরে সন্তানকে কাছে না পাওয়ার উৎকণ্ঠা? এরকম আরও অনেক ছোটবড় উদাহরণ আছে যেখানে প্রিয় মানুষের থেকে দূরত্ব বড্ড ভাবিয়ে তোলে আপনাকে! আরও বেঁধে বেঁধে থাকতে চান আপনি, যা হয়তো অনেকসময় বাস্তবে সম্ভব হয়ে ওঠে না। নিকটজনের থেকে দূরে থাকার ভয় বা দুশ্চিন্তার পোশাকি নাম সেপারেশন অ্যাংজ়াইটি। হয়তো সকলের ক্ষেত্রে বিষয়টি গভীর সমস্যার নয়, একটু আধটু দুশ্চিন্তাই তাঁদের মনের মধ্যে চলতে থাকে...তবে কারওর ক্ষেত্রে যদি এই উৎকণ্ঠা মাত্রাতিরিক্ত হয় তখনই সমস্যা।

## দূরত্ব যখন দুশ্চিন্তার

অনেকে ভাবেন, সেপারেশন অ্যাংজ়াইটি শুধুমাত্র ছোটদেরই হয়। না, তা ঠিক নয় কিন্তু! ছোটদের ক্ষেত্রে প্রথম প্রথম স্কুলে যাওয়া বা একা একা টিউশন ক্লাসে যাওয়ার আগে মনের মধ্যে উৎকণ্ঠা কাজ করে অনেকক্ষেত্রেই। এর সঙ্গত কারণও আছে বই কী! ছোটরা বাবা-মায়ের উপরে সবকিছুর জন্যই নির্ভরশীল। তাদের সামাজিক জগতের প্রথম সদস্য তাদের বাবা-মা-ই। যৌথ পরিবার হলে আত্মীয়স্বজনেরা। কিন্তু পরিবারের নিরাপদ আশ্রয়ের বাইরেও যে সামাজিক জগৎ আছে, সেই জগতে তাকে মানিয়ে-গুছিয়ে চলতে হবে, এমন বোধ ছোটদের ক্ষেত্রে তৈরি হয় ধীরে ধীরে। তাই প্রথমদিন স্কুলের গেট টপকে উল্টোদিকে যাওয়ার সময়ে তার মনে হতেই পারে, যে সে নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে অচেনা এক জগতে পা রাখতে চলেছে। আবার সন্তানকে বোর্ডিং স্কুলে পাঠানোর সময়েও তাদের মনের মধ্যে এরকম দুশ্চিন্তা

চলতে পারে। এতটা সময় সে তার বাবা-মা বা আত্মীয়-পরিজনদের ছেড়ে থাকেনি। নতুন জায়গায় মানিয়ে-গুছিয়ে নেওয়ার চ্যালেঞ্জ তার মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে পারে। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্কদের অনেকের ক্ষেত্রেও এই সেপারেশন অ্যাংজ়াইটি বড্ড ভোগায়! সেপারেশন অ্যাংজ়াইটিকে বুঝতে গেলে আগে 'অ্যাটাচমেন্ট' বা বেঁধে বেঁধে থাকার বিষয়টিকে বোঝা প্রয়োজন। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের বাইরে স্বাভাবিক নিয়মেই নানা পরিসর তৈরি হয় একজন ব্যক্তির। সেই বিভিন্ন পরিসরে ধীরে ধীরে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়াও খুব সহজাত। ফলে, কখনও কাজের সূত্রে বা পড়াশোনার সূত্রে বাইরে যেতে হতে পারে। কখনও বা অন্য শহরে বা দেশে কেউ সেটল করতে পারেন। কেউ হয়তো আবার খানিকটা বাধ্য হয়েই লং ডিসট্যান্স সম্পর্ক রাখেন। অর্থাৎ, কারণ যা-ই হোক না কেন, কাছের মানুষদের থেকে দূরে থাকতে হতে পারে। এই দূরত্বের কারণে যদি আপনি আপনার প্রিয়জনকে নিয়ে বা আপনার প্রিয়জনেরা আপনাকে নিয়ে টেনশন করতে শুরু করেন, তাহলে রোজকার স্বাভাবিক জীবনে ছন্দপতন ঘটবে। সেপারেশন অ্যাংজ়াইটির নানা স্তর আছে। যেমন ধরুন, আপনি ও আপনার পার্টনার লং ডিসট্যান্স সম্পর্কে রয়েছেন। দিনে বারবার আপনার পার্টনারকে ফোন করে তাঁর খোঁজখবর করতে শুরু করলেন! এক্ষেত্রে আপনি আপনার সঙ্গীকে মিস করছেন, নাকি তিনি কখন কী করছেন, সব কাজ ঠিকমতো করতে পারছেন কিনা, নিরাপদে আছেন কিনা ইত্যাদি নিয়ে উৎকণ্ঠায় ভুগছেন...তা ভেবে দেখা প্রয়োজন। অনেকে আবার সন্দেহপরায়ণও হয়ে ওঠেন। আরও একটি বিষয় হল কো-ডিপেন্ডেন্সি। আপনি ও আপনার সঙ্গী একে অপরের উপর ইমোশনালি ও প্র্যাকটিক্যালি খুব বেশি নির্ভরশীল হলে, দূরত্ব সম্পর্কে সমস্যা তৈরি করতে পারে। সেক্ষেত্রে আপনার সঙ্গী আপনাকে ছেড়ে একা একা সবকিছু সামলে নিতে পারছেন কিনা, তা ভেবে আপনি মানসিক অস্থিরতায় ভুগতে পারেন। একই কারণে, তিনিও আপনাকে নিয়ে চিন্তিত হতে পারেন। নির্ভরশীলতার প্রসঙ্গ সন্তানের দূরে থাকার ক্ষেত্রে বাবা-মায়েদের মনেও আসে। হস্টেলে থাকলে সে সময়মতো সবকিছু করছে কিনা, কোনও খারাপ অভ্যেস তৈরি করছে কিনা, এসব নিয়েও টেনশনে ভোগেন বাবা-মায়েরা। আবার উল্টোদিকটাও সত্যি। বয়স্ক বাবা-মায়ের জন্য সন্তানেরও টেনশন হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। হয়তো আপনার বাবা বা মা সারাদিন একা বাড়িতে থাকেন। আপনি সারাদিন নিজের কাজে ব্যস্ত, দিনে দু'-একবার রুটিন ফোন ছাড়া আর কিছুই করে উঠতে পারেন না। কিন্তু কাজের মধ্যে ভুলে থাকার চেষ্টা করলেও মাঝেমধ্যেই একটু আধটু টেনশন হয় তাঁদের নিয়ে। ঠিক সময়ে ওষুধ খেয়েছেন তো? কোনও বিপদ আপদ হয়নি তো? এক্ষেত্রে অনেকের গিল্ট ফিলিংও হয়। বাবা-মা ও সন্তানের পারস্পরিক অতি নির্ভরশীলতা সন্তানের বিয়ের পরেও সমস্যা তৈরি করতে পারে। বাবা-মা বা শ্বশুর-শাশুড়িকে বাড়িতে একা রেখে এলে বা দীর্ঘদিন তাঁদের একা রাখতে হলে সেপারেশন অ্যাংজ়াইটি তৈরি হতে পারে। অ্যাটাচমেন্টের সঙ্গেই যে বিষয়টি জড়িয়ে রয়েছে, তা হল প্রিয়জনকে হারিয়ে ফেলার ভয়। এই ভয় অনেকের মনের ভিতরেই গোপনে চলতে থাকে, কিন্তু তাঁরা বলে উঠতে পারেন না। বিশেষত, কেউ যদি সাম্প্রতিক কোনও ট্রমার মুখোমুখি হয়ে থাকেন, তাহলে অন্য কোনও প্রিয়জনকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চান। যেমন ধরুন, কারওর সদ্য পিতৃবিয়োগ হয়েছে। তিনি তাঁর বয়স্ক মাকে একা বাড়িতে রেখে এলে উৎকণ্ঠায় ভুগতেই







পারেন। কিন্তু এর মধ্যেও জীবন তো থেমে থাকবে না। তাই, দুশ্চিন্তা কমানোর উপায়ও আপনাকেই খুঁজে বের করতে হবে।
আরও একটি বিষয় হল, ডিভোর্সের পরে সন্তানকে কাছে না পাওয়ার ভয়। এই ভয় যেমন বাবা বা মায়ের মধ্যে যিনি কাস্টডি পাচ্ছেন না তাঁর, তেমনই সন্তানেরও। খুব ছোট বয়সে বাবা-মায়ের উপর নির্ভরশীলতা বেশি থাকে, ইমোশনাল অ্যাটাচমেন্টও তখন প্রবল থাকে। তাই, এই সময়ে বাবা-মায়ের ডিভোর্স হলে অনেক শিশুই ডিফিকাল্ট চাইল্ডহুড-এর মধ্যে দিয়ে যেতে পারে। একটু বড় হয়ে যখন তার পিয়ার গ্রুপ তৈরি হয়, যখন সে সোশ্যালাইজ় করতে শুরু করে, তখন 'বাবা-মায়ের ডিভোর্স হলে লোকে কী বলবে' এই ধারণাও তার মধ্যে এক ধরনের অ্যাংজ়াইটির জন্ম দিতে পারে। আবার যে অভিভাবক কাস্টডি পেলেন না, তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়তে পারেন। কারণ, ইতিমধ্যেই তিনি বিচ্ছেদের কারণে ইমোশনাল টারময়েলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন। আবার যিনি একক অভিভাবকত্ব পেলেন, তিনি সন্তানের ব্যাপারে ওভার পজ়েসিভ হয়ে উঠতে পারেন। সেক্ষেত্রে সন্তান দেরি করে বাড়ি ফিরলে, দু'বার ফোন না ধরলেও চিন্তিত হয়ে পড়তে পারেন। নিজেকে বোঝান, এভাবে কোনও সমস্যার সমাধান হবে না।

## কী করণীয়

দূরে থাকার সিদ্ধান্ত সচেতনভাবে নিন। যদি মনে হয়, আপনি বা আপনার প্রিয়জন এই দূরত্বের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারবেন না, তাহলে বিকল্প রাস্তা খোঁজার চেষ্টা করুন। যেমন ধরুন, সন্তানকে আপনি এতদিন কাছছাড়া করেননি। এবার কাজের সূত্রে সে অন্য শহরে গিয়ে থাকলে বা দূরে কোথাও ট্র্যাভেল করলে দিনে দশবার তাঁকে ভিডিও কলে ব্যতিব্যস্ত করে তোলার কোনও মানে হয় না! তার চেয়ে আগেভাগেই কথা বলে মীমাংসা করে নেওয়া ভাল। আবার বয়স্ক বাবা-মাকে একা রেখে যাওয়ার আগেও ভেবে নিন, কোনও রকম ইমার্জেন্সির মোকাবিলা কীভাবে করবেন, বা দূরত্ব সেক্ষেত্রে কতটা সমস্যার হতে পারে। মোটের উপর, প্রিয়জনদের সঙ্গে বসে মিউচুয়ালি সিদ্ধান্ত নেওয়া জরুরি।
সেপারেশন অ্যাংজ়াইটি তখনই বেশি হবে

যখন অ্যাটাচমেন্ট বেশি থাকে। প্রিয়জনদের ক্ষেত্রে মানসিক অ্যাটাচমেন্ট থাকবেই। কিন্তু প্রত্যেককে ব্যক্তিগত পরিসরে স্বাধীনভাবে নিজেকে গুছিয়ে নেওয়ার সুযোগ দিন।
সন্তানকে এমনভাবে বড় করুন, যাতে সে আত্মনির্ভর হয়। তাতে অন্তত সে দূরে থাকলে কীভাবে নিজেকে সামলাবে, সেই চিন্তা আপনাকে করতে হবে না। প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রেও, নিজেদের মধ্যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং ঠিক রাখা জরুরি। দম্পতি বা প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনেকেই সঙ্গী দূরে থাকলে সন্দেহপ্রবণ হয়ে পড়েন! তিনি কী করছেন, কার সঙ্গে থাকছেন, কোথায় যাচ্ছেন... এসবও অ্যাংজাইটির কারণ হতে পারে। তাই নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া ঠিক রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন।
নিজেকে সময় দিন। প্রিয়জনেরা অবশ্যই আপনার জগতের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কিন্তু শুধুই স্বামী, সন্তান, প্রেমিক, বাবা-মা নন, তার বাইরে নিজের মতো করে সময় কাটানোর জন্য নিজস্ব জগৎ গড়ে তুলুন। নিজেকে ব্যস্ত রাখলে উৎকণ্ঠা মনের মধ্যে এলেও বেশিক্ষণ স্থায়ী হবে না। একইসঙ্গে সাপোর্ট সিস্টেম গড়ে তোলা জরুরি। যিনি বাইরে আছেন, ও যাঁর থেকে বাইরে আছেন, দু'জনেরই।
বাবা-মা বা বয়স্ক সদস্যদের থেকে দূরে থাকার আগে পরিকল্পনা করে নিন। তাঁরা যদি অসুস্থ হন, বা কর্মক্ষমতা না থাকে, তাহলে অবশ্যই কেয়ারগিভারের দায়িত্বে তাঁদের রাখতে হবে। স্থানীয় কোনও বন্ধু বা প্রতিবেশির সঙ্গেও এ ব্যাপারে কথা বলুন। যাতে, কোনওরকম প্রয়োজনে প্রাথমিক দায়িত্ব তাঁরা সামলাতে পারেন। নিয়মিত ফোন করে বা ভিডিও কলে খোঁজ নিন। আজকাল বিভিন্ন জেরিয়াট্রিক কেয়ার সংস্থাও রয়েছে। অর্থের বিনিময়ে তাঁরা বয়স্ক মানুষদের যত্ন নেন।
ডিভোর্সের ক্ষেত্রে, যিনি সন্তানের অভিভাবক তাঁর পেরেন্টিং স্কিলের উপরে অনেকটাই নির্ভর করবে সন্তানের সুস্থ সুন্দরভাবে বড় হওয়া। এক্ষেত্রে অ্যাটাচমেন্ট আর ডিপেন্ডেন্স দু'টোরই নিয়ন্ত্রণ সচেতনভাবে করা প্রয়োজন। মনে রাখবেন, আপনি কীভাবে সন্তানকে বড় করছেন তার উপরে অনেকটাই নির্ভর করবে অন্য অভিভাবকের থেকে তার দূরে থাকার কষ্ট নিরাময়। অনেকেই ডিভোর্সের পরেও সন্তানের কথা ভেবে বন্ধুত্ব বজায় রাখেন। এক্ষেত্রে অন্তত একটা সময় অবধি সন্তান বাবা ও মা দু'জনের সান্নিধ্যই পায়, দু'তরফেই স্থায়ী দূরত্বের উৎকণ্ঠা অনেকটা দূর হয়। তবে সবসময় তা সম্ভব হয় না। তখন পেরেন্টিং স্কিলের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
দুশ্চিন্তা কমানোর জন্য মেডিটেশন, প্রাণায়াম করুন। কাছের মানুষরা যখন কাছে থাকবেন, তাঁদের সঙ্গে কোয়ালিটি টাইম কাটানোর চেষ্টা করুন। তাহলে পরে 'আমি তো সময় দিতে পারলাম না' বলে গিল্ট ফিলিং হবে না। আগে থেকে অযথা ভবিষ্যতে কী হতে পারে ভেবে দুশ্চিন্তা করবেন না। জীবনে যখন যেরকম পরিস্থিতি আসে, তার সঙ্গে মোকাবিলা করার শক্তি ও স্ট্র্যাটেজি তখনই ভাবতে হয়। তাই, আগে থেকে প্রি-কনসিভড অ্যাসাম্পশনকে বেশি গুরুত্ব না দেওয়াই ভাল। মন এতে শান্ত থাকবে।

